Banglapdf.net Presents-

লরা ইঙ্গল্‌স্ ওয়াইল্ডার-এর

ফার্মার বয়

লিটল্ হাউজ অন দ্য প্রেয়ারি

রূপান্তরঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

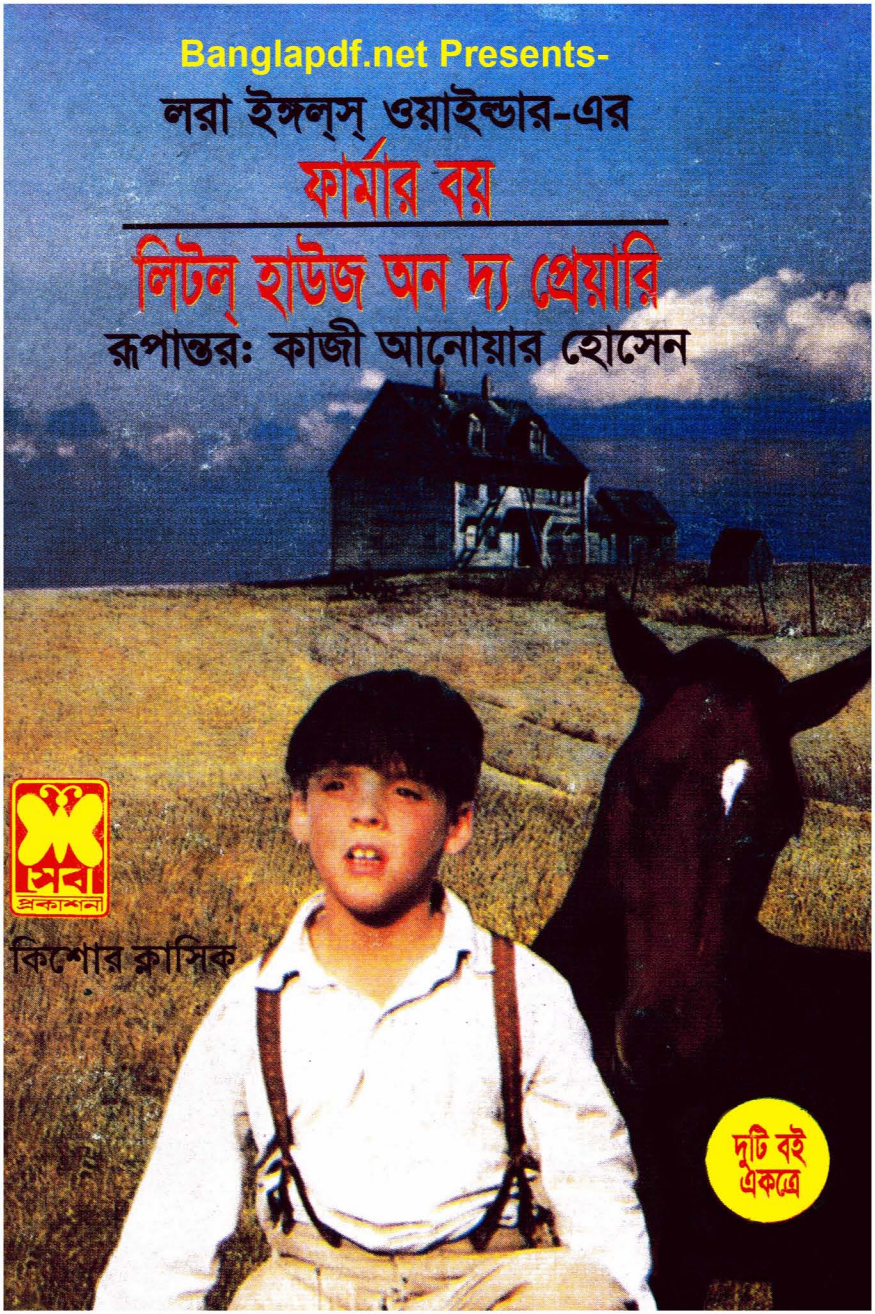

সবা প্রকাশনা

কিশোর ক্লাসিক

দুটি বই একত্রে

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

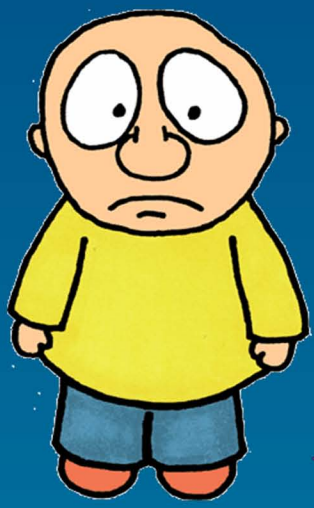

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

কিশোর ক্লাসিক

লরা ইঙ্গল্‌স্‌ ওয়াইল্ডার-এর

ফার্মার বয়

লিট্‌ল্‌ হাউস অন দ্য প্রেয়ারি

ভাষান্তরঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-1525-8
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৪
প্রচ্ছদ: হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

FARMER BOY

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE
By: Laura Ingalls Wilder
Trans. By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

তেত্রিশ টাকা

ফার্মার বয়: ৫–৯৯
লিট্‌ল্ হাউস ইন দ্য বিগ উড্‌স্: ১০০–১২৩
লিট্‌ল্ হাউস অন দ্য প্রেয়ারি: ১২৪–১৬৮

সেবা প্রকাশনীর
ক'টি কিশোর ক্লাসিক

লিউ ওয়ালেস/কাজী মায়মুর হোসেন
বেন-হার
চার্লস নর্ডহফ ও জেমস্ নরম্যান হল/নিয়াজ মোরশেদ
বাউন্টিতে বিদ্রোহ
সারভান্তেস/নিয়াজ মোরশেদ
ডন কুইক্সোট
কানাইলাল রায়
কিশোর রামায়ণ
দশ কুমার চরিত
শেক্সপীয়ার/কাজী শাহনূর হোসেন
নাটক থেকে গল্প
ভিক্টর হুগো
লা মিজারেবল/ইফতেখার আমিন
দ্য ম্যান হু লাফস/শেখ আবদুল হাকিম
চার্লস ডিকেন্স/নিয়াজ মোরশেদ
অলিভার টুইস্ট
আ টেল অভ টু সিটিজ
মার্ক টোয়েন/শেখ আবদুল হাকিম
পুডন্‌হেড উইলসন
এমিলি ব্রনটি/নিয়াজ মোরশেদ
ওয়াদারিং হাইটস
হ্যারিয়েট বীচার স্টো/অনীশ দাস অপু
আঙ্কল টমস কেবিন
হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
চাইল্ড অভ স্টর্ম/**কাজী মায়মুর হোসেন**
মর্নিং স্টার/**নিয়াজ মোরশেদ**
লর্ড লিটন/নিয়াজ মোরশেদ
দ্য লাস্ট ডেজ অভ পম্পেই

লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডার/কাজী আনোয়ার হোসেন
ফার্মার বয়+
লিটল হাউস অন দ্য প্রেয়ারি
অন দ্য ব্যাঙ্কস অভ প্লাম ক্রীক
+লিটল টাউন অন দ্য প্রেয়ারি
রাফায়েল সাবাতিনি/কাজী আনোয়ার হোসেন
দ্য ব্ল্যাক সোয়ান
লাভ অ্যাট আর্মস
টমাস হার্ডি/কাজী শাহনূর হোসেন
টেস অভ দ্য ডার্বারভিল
ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড
জুড দ্য অবসকিওর
দ্য মেয়র অভ ক্যাস্টারব্রিজ
চার্লস কিংসলে/শেখ আবদুল হাকিম
হাইপেশিয়া
এইচ. দ্য ভের স্ট্যাকপোল/মামনুন শফিক
ব্লু লেগুন
হেনরি হল কেইন/কাজী মায়মুর হোসেন
দ্য বন্ডম্যান
স্ট্যানলি ওয়েইম্যান/কাজী আনোয়ার হোসেন
আ জেন্টলম্যান অভ ফ্রান্স
আলেকজান্ডার বেলায়েভ/কাজী মায়মুর হোসেন
দি অ্যামফিবিয়ান ম্যান
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
দ্য ফিফথ্ কলাম/**শেখ আগালা হাকিম**
আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস/নিয়াজ মোরশেদ
আলেকজান্দার দ্যুমা
মার্গারেট ডি-ভ্যালয়/**শেখ আগালা হাকিম**
জেরাল্ড ডুরেল
মানবজন্তু/**অনীশ দাস অপু**
রবার্ট লুই স্টিভেনসন/নিয়াজ মোরশেদ
কিডন্যাপড

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

ফার্মার বয়

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

এক

নিউ ইয়র্ক স্টেটের উত্তরাঞ্চলে অসম্ভব শীত পড়েছে এবার। পুরু তুষারে ছেয়ে গেছে মাঠ-ঘাট। ওক, মেপ্‌ল্ আর বীচ গাছের ন্যাড়া ডালে জমেছে তুষার; সিডার আর স্প্রুসের সবুজ ডালগুলোকে নুইয়ে ফেলেছে নীচের তুষারের উপর; সীমানা ঘেরা পাথরের দেয়ালগুলো দেখাই যায় না।

জানুয়ারি মাস। জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে পথ, সেই পথ ধরে বড় ভাই রয়াল আর দুই বোন ইলাইযা জেন ও অ্যালিসের সঙ্গে স্কুলে চলেছে ছোট্ট আলমান্‌যো। রয়ালের বয়স তেরো, ইলাইযা জেনের বারো আর অ্যালিসের দশ সবার ছোট আলমান্‌যো আজই প্রথম চলেছে স্কুলে, বয়স নয় ছুঁই-ছুঁই করছে।

বড়দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে খুব জোরে পা চালাতে হচ্ছে আলমান্‌যোকে, তবু পেরে উঠছে না, কারণ সবার দুপুরের টিফিন বয়ে নিতে হচ্ছে ওকেই।

'এটা রয়ালের নেয়া উচিত,' বলল সে, 'ও আমার চেয়ে বড়।'

রয়াল বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে, জবাব দিল ইলাইযা জেন।

'না, মানযো, সবার ছোটজনকে বইতে হয় ওটা। তুমিই এখন ছোট।'

ছোটদের উপর খবরদারি খুব পছন্দ করে ইলাইযা জেন, আর ও বড় বলে ওর কথা শুনতেই হয় অ্যালিস আর আলমানযোকে।

ঢাল বেয়ে নামছে ওরা এখন, সামনেই ছোট্ট একটা ব্রিজ পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মাইলখানেক গেলেই স্কুল হাউস।

শরীর ঢাকা রয়েছে গরম জামাকাপড়ে। কিন্তু গাল-নাক-চোখ খোলা পেয়ে সেখানে কামড় বসাচ্ছে ঠাণ্ডা; ওগুলো জমে যাবে বলে মনে হচ্ছে আলমানযোর। বাবার পোষা ভেড়ার লোম দিয়ে নিজ হাতে চমৎকার পোশাক তৈরি করেছে মা, ঠাণ্ডা বাতাস তো দূরের কথা, প্রচণ্ড বৃষ্টি হলেও একফোঁটা পানি ঢুকবে না ভিতরে। কোট, প্যান্ট, টুপি, মোজা, দস্তানা–সব মায়ের তৈরি, শুধু পায়ের ইন্ডিয়ান মোকাসিনটা বানিয়ে দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ মুচি।

মেয়েরা শীতে মুখের সামনে নেটের ঘোমটা লাগায় বলে ঠাণ্ডার কামড় থেকে বেঁচে যায় কিছুটা, কিন্তু ছেলেদের মুখ থাকে খোলা; কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস লেগে তাই আপেলের মত লাল দেখাচ্ছে আলমানযোর গাল দুটো, আর নাকটা মনে হচ্ছে যেন টুকটুকে লাল চেরি ফল। মাইল দেড়েক হাঁটবার পর স্কুল-দালানটা দেখতে পেয়ে হাঁপ ছাড়ল সে।

হার্ডস্ক্র্যাবল্ পাহাড়ের পায়ের কাছে স্কুলটা। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সামনের কিছুটা জায়গা থেকে তুষার সরিয়ে রেখেছেন টীচার। পথের ধারে গভীর

তুষারের মধ্যে কোস্তাকুস্তি খেলছে পাঁচটা বড়-বড় ছেলে।

ভয় পেল আলমানযো। এদের সম্পর্কে আগেই শুনেছে ও। আড়চোখে তাকিয়ে বুঝল রয়ালও ভয় পেয়েছে, কিন্তু ভাব দেখাচ্ছে যেন পায়নি। এই বড় ছেলেরা হার্ডস্ক্র্যাব্‌ল্ সেট্‌ল্‌মেন্ট থেকে আসে, সবাই ভয় পায় ওদের। তাতে খুব গর্ব বোধ করে ওরা।

নিছক মজা করবার জন্য ছোট ছেলেদের স্লেড ভেঙে চুরমার করে ওরা। কখনও বাচ্চা ছেলেদের একটা পা ধরে শূন্যে তুলে চারপাশে চরকি ঘুরিয়ে ছেড়ে দেয়, উড়ে গিয়ে গভীর তুষারে মাথা নিচু পা উঁচু অবস্থায় সেঁধিয়ে যায় ওরা; আর তাই দেখে হেসে খুন হয়ে যায়। কখনও বা দুটো ছোট্ট ছেলেকে নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে বাধ্য করে, শত অনুনয় করলেও শোনে না।

ষোলো-সতেরো হবে এদের বয়েস, কিন্তু গায়ে-গতরে অনেক বড় হয়ে গেছে এখনই। শীতের মরশুমে খেত-খামারে কাজ থাকে না বলে পড়তে আসে স্কুলে। আসলে পড়াশোনা কিছুই না, ওরা আসে টীচারের সঙ্গে কোনও ছুতোয় একটা গোলমাল বাধিয়ে তাঁকে পিট্টি দিতে, আর স্কুল হাউসটা ভাঙচুর করতে। গর্ব করে বলে বেড়ায়, শীতকালীন পুরো সময়টা চাকরি করতে পারেনি আজ পর্যন্ত কোনও টীচার। গতবছরের টীচারকে ওরা এমনই মার মেরেছিল যে অনেকদিন ভুগে শেষ পর্যন্ত মারাই গিয়েছিলেন বেচারা।

এ-বছর একজন হালকা-পাতলা গড়নের ফ্যাকাসে চেহারার যুবক এসেছেন টীচার হয়ে। মিস্টার কর্স তাঁর নাম। খুবই নরম-সরম, ভদ্র, ধৈর্যশীল মানুষ। ছোট ছেলেমেয়েরা সঠিক বানান বলতে না পারলেও বেত মারা তো দূরের কথা, জোরে ধমক পর্যন্ত দেন না। ওই বড় ছেলেরা মিস্টার কর্সকে মারবে ভাবতেই গা-টা গুলিয়ে এল আলমানযোর। ও জানে, ওদেরকে ঠেকাবার শক্তি নেই মিস্টার কর্সের।

স্কুল হাউসের ভিতর কেউ টুঁ-শব্দ করছে না, তাই বাইরে বড় ছেলেদের চিৎকার-চেঁচামেচি বেশি করে লাগছে কানে। দরজা খুলে ক্লাসরুমে ঢুকল ওরা—তিন ভাইবোনের পিছনে আলমানযো। কামরার ঠিক মাঝখানে বড়সড় একটা স্টোভ গরম করে রেখেছে ঘরটাকে। নিজের ডেস্কে বসে আছেন টীচার, একটা বই পড়ছেন। ওরা ঢুকতেই বই থেকে মুখ তুললেন তিনি, হাসিমুখে বললেন, 'গুড মর্নিং।'

রয়াল, ইলাইযা জেন আর অ্যালিস সবিনয়ে উত্তর দিল, কিন্তু আলমানযো হাঁ করে চেয়ে রইল টীচারের দিকে। মিস্টার কর্স ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'আজ আমিও তোমাদের সঙ্গে বাড়ি যাচ্ছি, তুমি জানো?' বড় ছেলেদের ভয় এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি আলমানযো, চুপ করে থাকল। 'হ্যাঁ,' আবার বললেন মিস্টার কর্স, 'এবার তোমার বাবার পালা।'

নিয়ম আছে, প্রতিটা পরিবার চোদ্দ দিন করে টীচারের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করবে। এ-ফার্ম থেকে ও-ফার্ম, এমনি ঘুরে ঘুরে দু-সপ্তাহ করে থাকলেই শীত শেষ হয়ে যাবে, স্কুল বন্ধ করে তিনি ফিরে যাবেন শহরে।

ডেস্কের উপর রুলার দিয়ে বাড়ি দিলেন মিস্টার কর্স—অর্থাৎ, ক্লাস শুরু হবে

এখন। ছেলেমেয়েরা যে-যার সীটে গিয়ে বসল। মেয়েরা বামদিকের সারিতে, ছেলেরা ডানদিকের। বড়রা বসবে পেছনের সীটে, মাঝারি ছেলেমেয়েরা মাঝের সীটে, আর একেবারে ছোটরা বসবে সামনের সীটে। প্রতিটা সীট একই সমান–বড়দের ডেস্কের নীচে হাঁটু ঢোকাতে কষ্ট হয়, আর ছোটদের পা মেঝে পর্যন্ত পৌঁছায় না, ঝুলে থাকে।

প্রাইমারী ক্লাসে ওরা মাত্র দুজনঃ আলমানযো আর মাইলস লিউইস; তাই একেবারে সামনে ওদের বেঞ্চ, বেঞ্চের সামনে কোন ডেস্ক নেই। বই খুলে দুইহাতে ধরে রাখতে হবে ওদের।

এবার উঠে গিয়ে জানালায় রুলার দিয়ে কয়েকটা টোকা দিলেন টীচার। বড় ছেলেরা স্কুল হাউসের ভিতর ঢুকল গেট দিয়ে। ঠাট্টা-মস্করা করছে, হাসাহাসি করছে নিজেদের মধ্যে। দড়াম করে সশব্দে দরজা খুলে হুড়মুড় করে ঢুকল ওরা ক্লাসরুমে। বিগ বিল রিচি ওদের লীডার। আলমানযোর বাবার সমান হবে রিচি লম্বায় ও চওড়ায়; বিশাল হাতের মুঠি। বেপরোয়া ভঙ্গিতে মেঝেতে পা ঠুকে তুষার ঝরাল রিচি, তারপর এগোল নিজের সীটের দিকে। বাকি চারজনও সাধ্যমত আওয়াজ করল।

একটি কথাও বললেন না মিস্টার কর্স।

নিয়ম হলো, ক্লাসে কথা বলা বারণ, চুপচাপ যে-যার পড়া তৈরি করবে, কিছু বুঝতে না পারলে বা কারও কোনও প্রশ্ন থাকলে অনুমতি নিয়ে কথা বলবে। অথচ, সবাই শুনতে পাচ্ছে, পিছনের সীটে বসে বড় ছেলেরা চাপা গলায় কথা বলছে, উশখুশ করছে, সশব্দে বই রাখছে ডেস্কে, আবার তুলছে।

কঠোর গলায় বললেন মিস্টার কর্স, 'গোলমাল বন্ধ করবে তোমরা, প্লীজ?'

একমিনিটের জন্য চুপ করে থাকল ওরা, তারপর শুরু করল আবার। ওরা চাইছে, একবার ওদের শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করে দেখুক মিস্টার কর্স, একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে সবকজন তাঁর উপর।

বিরতির সময় প্রথমে মেয়েদেরকে ছুটি দেওয়া হলো। পনেরো মিনিট পর জানালায় রুলার দিয়ে টোকা দিতেই ফিরে এল ওরা। এবার পনেরো মিনিটের জন্য ছেলেদের ছুটি।

ছুটি পাওয়ামাত্র হৈ-হুল্লোড় করে বেরিয়ে গেল সবাই। যে প্রথম বেরোতে পারল, সে তুষারের বল বানিয়ে ছুঁড়তে থাকল অন্যদের দিকে। যাদের স্লেড আছে, আছড়ে-পাছড়ে তারা উঠে পড়ছে হার্ডস্ক্র্যাব্‌ল্ হিলে, তারপর সেখান থেকে স্লেডের উপর উবু হয়ে শুয়ে ঝড়ের বেগে নেমে আসছে নীচে। যাদের স্লেড নেই তারা কেউ তুষারের মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছে, কেউ কুস্তি করছে–সেইসঙ্গে চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে। যতক্ষণ না টোকা পড়ে জানালায় ততক্ষণের জন্য ওরা স্বাধীন।

দুপুরে টিফিন। টিফিন-বাটি খুলল ইলাইযা জেন। ওতে মাখন-রুটি, সসেজ, ডোনাট, আপেল আর চারটে অ্যাপ্‌ল্-টার্নওভার রয়েছে। খাওয়া শেষ হলে গায়ে কোট, হাতে গ্লাভস আর মাথায় টুপি চড়িয়ে বাইরে খেলতে গেল আলমানযো।

বাইরে বেরোলে দেখা যায় জঙ্গল থেকে গাছ কেটে বব-স্লেডে সাজিয়ে নিয়ে হার্ডস্ক্র্যাব্‌ল্ পাহাড় থেকে নেমে আসছে মানুষ, চাবুক দিয়ে পটকা ফোটানোর আওয়াজ করছে ঘোড়ার কানের কাছে, চেঁচিয়ে হুকুম দিচ্ছে এগোবার জন্য; আর গলায় বাঁধা ঘন্টার টুং-টাং আওয়াজ তুলে চলে যাচ্ছে ঘোড়াগুলো স্কুলের পাশ দিয়ে।

বব-স্লেড আসতে দেখেই নিজ-নিজ স্লেড নিয়ে ছুটল ছেলেরা ওটার রানারের সঙ্গে বাঁধবে বলে। মাইলস লিউইসের স্লেডে ওর সঙ্গে জুটে গেল আলমানযো। যাদের স্লেড নেই তারা উঠে পড়ছে বোঝাই কাঠের উপর। হৈ-হল্লা করতে করতে চলে গেল ওরা স্কুল ছাড়িয়ে। এদিকে উপরে এতক্ষণে যুদ্ধ বেধে গেছে–কে কাকে ঠেলে নীচের তুষারে ফেলতে পারে। যে নীচে পড়ে যায় সে নীচ থেকে তুষারের হাত-বোমা মারতে থাকে উপরে।

মনে হলো মুহূর্তে শেষ হয়ে গেল টিফিনের বিরতি। স্কুলে ফেরার জন্য প্রথমে ওরা হাঁটল, তারপর দৌড়াতে শুরু করল–দেরি হয়ে গেলে পিট্টি খেতে হবে। হাঁপাতে হাঁপাতে যখন পৌঁছল ওরা ক্লাসরুমের দরজায়, তখন চারদিক চুপচাপ। ভয়ে ভয়ে পা টিপে ঢুকল ওরা ভিতরে। দেখা গেল নিজের ডেস্কে বসে আছেন মিস্টার কর্স, মেয়েরা নিজ নিজ সীটে বসে ভান করছে যেন পড়ায় কত ব্যস্ত। ছেলেদের দিকটা একেবারে ফাঁকা, কেউ নেই সীটে।

সবার সঙ্গে ক্লাসরুমে ঢুকে নিজের সীটে বসল আলমানযো। বইটা চোখের সামনে তুলে ধরে নিঃশব্দে শ্বাস ফেলবার চেষ্টা করছে। সবার দিকে তাকালেন, কিন্তু কাউকে কিছু বললেন না মিস্টার কর্স।

সবশেষে ফিরল বিল রিচি তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে। ড্যাম-কেয়ার ভঙ্গিতে নানারকম শব্দ করল ওরা সীটে পৌঁছতে। সবাই না বসা পর্যন্ত চুপ করে থাকলেন মিস্টার কর্স, তারপর বললেন, 'এবারের মত তোমাদের এই দেরিতে আমি দোষ ধরলাম না। কিন্তু খেয়াল রেখো, যেন এরকম আর না হয়।'

সবাই টের পেল, বড় ছেলেরা আবার দেরি করবে। মিস্টার কর্স ওদেরকে দিয়ে আদেশ পালন করাতে পারবেন না, শাস্তিও দিতে পারবেন না, কারণ শাস্তি দিতে গেলেই উল্টে ওরা সবাই মিলে তাঁকে ধরে পিটাবে। ইচ্ছে করেই ওরা উত্যক্ত করছে টীচারকে।

দুই

বরফের মতই স্তব্ধ হয়ে গেছে বাতাস, তীব্র ঠাণ্ডায় গাছের ছোট ডালগুলো ফাটছে। ধূসর আলো আসছে তুষার থেকে। ছায়া জমতে শুরু করেছে জঙ্গলে। শেষ বিকেলে ক্লান্ত পায়ে খাড়াই বেয়ে উঠে এল ওরা।

রয়ালের পিছনে হাঁটছে আলমানযো, রয়াল হাঁটছে মিস্টার কর্সের পিছনে।

ইলাইযা জেনের পিছনে হাঁটছে অ্যালিস স্লেড ট্র্যাকের অপর পাশ দিয়ে।

লাল রং করা উঁচু বাড়িটার ছাদ তুষার জমে সাদা হয়ে আছে। ছাদের প্রান্ত থেকে ঝুলছে জমাট বরফ। সামনের দিকটা অন্ধকার, তবে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দেখা যায় মোমের আলো।

বাড়ির ভিতর না ঢুকে অ্যালিসের হাতে টিফিন-বাটি ধরিয়ে দিয়ে গোলাবাড়ির দিকে এগোল আলমানযো রয়ালের পিছন পিছন।

চৌকোনা প্রাঙ্গণের তিনদিকে তিনটে বিশাল গোলাঘর। প্রথমেই চোখে পড়ে ঘোড়ার গোলাঘর। ঘরটা বাড়ির দিকে মুখ করা, লম্বায় একশো ফুটের কম নয়। ঠিক মাঝখানে রয়েছে ঘোড়াদের বক্স স্টলগুলো, একধারে বাচ্চা-ঘোড়ার শেড, তার ওপাশে মুরগি-খামার; আর অন্যধারে গাড়িগুলো রাখবার জায়গা। এতই বড় যে দুটো বাগি আর একটা স্লেড ঢুকিয়ে রাখবার পরও ঘোড়া খুলবার জন্য প্রচুর জায়গা পাওয়া যায়, ঘোড়াগুলো ওখান থেকেই বাইরের ঠাণ্ডায় না বেরিয়ে সোজা নিজেদের স্টলে চলে যেতে পারে।

ঘোড়ার গোলাঘরের পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে বড় গোলাঘর। খড় বোঝাই ওয়্যাগন যেন সহজেই মাঠ থেকে সোজা এই গোলায় ঢুকতে পারে, সেজন্য বিশাল দরজা রয়েছে এই ঘরে। একধারে ছাত পর্যন্ত উঁচু খড়ের গাদা–লম্বায় পঞ্চাশ ফুট, চওড়ায় বিশ ফুট। এর পাশে গরু আর বলদের জন্য চোদ্দটা স্টল, তার ওপাশে মেশিন আর টুলস শেড।

এরপরই দক্ষিণের গোলাঘর। এটার প্রথমেই ফীডরুম, তারপর শুয়োরের খোঁয়াড়, তারপর বাছুরদের। তার পাশে শস্য মাড়াইয়ের জায়গা আর ফ্যানিং-মিল। সবশেষে ভেড়ার ঘর।

বারোফুট উঁচু তক্তার বেড়া দেওয়া আছে গোলা-প্রাঙ্গণের গোটা পুবদিক জুড়ে। তিনটে বিশাল গোলাঘর আর এই পুবের বেড়া ঘিরে রেখেছে প্রাঙ্গণটাকে। যতই তুষার পড়ুক আর যত জোরেই বাতাস উঠুক, ভিতরে আসবার পথ নেই। সেজন্য চরম শীতেও দুইফুটের বেশি তুষার জমে না কখনও গোলা-প্রাঙ্গণে।

গোলাঘরে ঢুকতে হলে সবসময় আলমানযো ঢোকে ঘোড়ার আস্তাবলের ছোট্ট দরজা দিয়ে। ঘোড়া ও ভালবাসে। ঘোড়াগুলোও সম্ভবত বোঝে সেটা। ও ঢুকলেই এগিয়ে আসে, বেড়ার ফাঁক দিয়ে নাক বাড়িয়ে গুঁতো দেয় ওকে, জানতে চায় খাবার কিছু সঙ্গে আছে কিনা, একটা-দুটো গাজর বা আর কিছু? ওর খুব ইচ্ছে করে ওগুলোর গায়ে হাত বুলায়, কেশরের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে চুলকে দেয়–কিন্তু বাবার ভয়ে পারে না। বিশেষ করে তিন-বছরী কোল্টদুটোর কাছে যাওয়া একেবারেই নিষেধ। ওগুলোকে এখনও পুরোপুরি পোষ মানানো হয়নি, একটু এদিক-ওদিক হলেই বিগড়ে যাবে। এমন কী আস্তাবল পরিষ্কারের ছুতোতেও ভিতরে যেতে পারে না আলমানযো, আট বছরের বাচ্চা ছেলেকে বিশ্বাস করতে পারে না বাবা। যদি কোনও কারণে ভয় পেয়ে যায়, কামড়াবে, লাথি মারবে, ঘৃণা করবে মানুষকে–কোনদিন ভাল ঘোড়া হতে পারবে না।

ও ভাবে, এত অপূর্ব সুন্দর ঘোড়া–ও কেন ব্যথা দেবে, বা ভয় দেখাবে

ওদের? ও জানে কী করে শান্ত নরম ব্যবহার দিয়ে জয় করতে হয় কোল্টের মন। কিন্তু বাবা কিছুতেই ভরসা রাখতে পারে না ওর উপর।

কাজেই শুধু একনজর চোখের দেখা দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় ওকে। ও কাছে এলে ওরাও এগিয়ে আসে, এদিক-ওদিক চেয়ে কেউ না থাকলে ওদের নাকে একটু হাত বুলিয়ে দেয় আলমানযো, কিংবা একটা গাজর খাইয়েই চট করে সরে যায় সামনে থেকে।

আজ বাবা আগেই পানির গামলা ভরেছে, এখন ওদের দানা খাওয়াচ্ছে, তাই স্কুলের জামার উপর একটা বার্ন-ফ্রক চাপিয়ে নিয়ে নিত্যদিনের কাজে লেগে গেল আলমানযো আর রয়াল। দুটো পিচফর্ক তুলে নিয়ে স্টল পরিষ্কারের কাজে লেগে গেল ওরা। ময়লা খড় সরিয়ে সে জায়গায় তাজা খড় বিছিয়ে দিচ্ছে, যাতে গরু-বাছুর, ষাঁড় আর ভেড়াগুলো পরিষ্কার বিছানায় আরামে ঘুমাতে পারে।

শুয়োরদের জন্য কখনও এসব দরকার হয় না, কারণ, ওরা নিজেরাই বিছানা পাতে এবং সে-সব পরিষ্কার রাখে।

দক্ষিণ গোলাঘরের একটা স্টলে রয়েছে আলমানযোর নিজের একজোড়া বাছুর। ওকে দেখেই এগিয়ে এল ওরা বেড়ার কাছে, এ ওকে ঠেলে সরিয়ে বারের ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে আদর নেবে। দুটোই লাল, একটার কপালে সাদা ফোঁটা। আলমানযো ওটার নাম দিয়েছে স্টার, অন্যটার নাম ব্রাইট।

বাছুরদুটোর বয়স এখনও এক বছর পুরো হয়নি, ছোট্ট দুটো শিং সবে শক্ত হতে শুরু করেছে। শিঙের চারপাশে চুলকে দিল আলমানযো, খরখরে জিভ দিয়ে ওর হাত চেটে দিল ওরা। ফীডবক্স থেকে দুটো গাজর নিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে খাওয়াল ও বাছুর দুটোকে।

এবার পিচফর্ক নিয়ে কুচি করা খড়ের গাদায় চড়ল দুজন। উপরে অন্ধকার। কিন্তু আগুন লাগবার ভয়ে বাতি নিয়ে ওদের উপরে ওঠা বারণ। একটু পরেই অবশ্য অন্ধকার সয়ে গেল চোখে। দ্রুত হাত চালাল ওরা। নীচের গামলাগুলোয় খড় ফেলছে ফর্ক দিয়ে টেনে টেনে।

খাচ্ছে সবাই। কচর-মচর আওয়াজ আসছে কানে। খড়ের ধুলোটে মিষ্টি গন্ধ আসছে নাকে, পশুগুলোর গায়ের গন্ধও মিশে আছে বাতাসে। খানিক বাদেই সদ্য-দোয়া দুধের গন্ধ পাওয়া গেল, বাবার বালতি থেকে আসছে।

নেমে এসে নিজের ছোট্ট টুল আর দুধ দোয়ানোর বালতি নিয়ে ঢুকল আলমানযো গরুর স্টলে। শক্ত বাঁট থেকে দুধ দোয়ানোর শক্তি আসেনি এখনও ওর ছোট্ট হাতে, কিন্তু ব্লসোম আর ষসি-র দুধ ও দোয়াতে পারে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দুধ দেয় ওরা, লাথি মেরে দুধের বালতি উল্টায় না, বা লেজের ঝাপটা মারে না চোখে।

দু'পায়ের ফাঁকে বালতি রেখে দুধ দোয়াতে শুরু করল ও। ডান, বাম–চোঁ, চোঁ! বাঁকা হয়ে নামছে দুধের ধারা, ফেনা উঠছে বালতির দুধে; মনের আনন্দে গাজর আর দানা চিবাচ্ছে গরুটা।

পিঠ বাঁকা করে আড়মোড়া ভেঙে মোটা লেজ দুলিয়ে কাছেই পায়চারি করছে গোলার বেড়ালগুলো, দুধের গন্ধে অস্থির হয়ে 'ম্যাঁও' করে উঠছে মাঝে মাঝে।

গোলাবাড়ির ইঁদুর খেয়ে খেয়ে বেজায় মোটা হয়ে উঠেছে ওরা। শস্য আর পশুদের দানা পাহারা দেয় বলে ওদের ভারি কদর, দোয়ানো হলেই একবাটি করে দুধ দেওয়া হয় ওদের। বেড়ালের বাটিতে দুধ ঢেলে দিয়ে বসি-র স্টলে চলে গেল আলমানযো।

আলমানযোর দোয়ানো হয়ে যেতে নিজের টুল আর বালতি নিয়ে বাবা এল ব্লসোমের স্টলে বাঁট থেকে বাকি দুধটুকু টেনে বের করতে। কিন্তু আগেই সব বের করে নিয়েছে আলমানযো। ওখান থেকে উঠে বসির স্টলে ঢুকল বাবা। কিন্তু পরমুহূর্তে বেরিয়ে এসে বলল, 'তুমি তো দেখছি ভাল দোয়াও, বাপ!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে মেঝেয় পড়ে থাকা এক গোছা খড়ে লাথি মারল আলমানযো। প্রশংসায় খুশি হয়েছে, কিন্তু সে-ভাব প্রকাশ করতে চায় না। বোঝা গেল এখন থেকে ওর দোয়ানোর পরে বাবাকে আর বাকিটুকু দোয়াতে হবে না, শীঘ্রি শক্ত বাঁটের গরুর দুধও দোয়াতে পারবে ও।

আলমানযোর বাবার চোখ দুটো নীল, মাঝে মাঝে ঝিক করে উঠে কৌতুক ঝিলিক দেয়। বিশালদেহী মানুষ, লম্বা দাড়ি আর চুল তামাটে রঙের। উঁচু বুট আর গরম কোট পরা অবস্থায় আরও বিশাল লাগে।

এ অঞ্চলে একজন গণ্যমান্য, গুরুত্বপূর্ণ লোক বাবা। চমৎকার একটা খামারের মালিক। কথার দাম আছে। প্রতি বছর অনেক টাকা জমাচ্ছে ব্যাংকে। ম্যালোনে যখন যায়, সবাই সম্মানের সঙ্গে কথা বলে।

লণ্ঠন আর দুধের বালতি হাতে রয়াল এসে দাঁড়াল। নিচু গলায় বলল, 'বাবা, বিগ বিল রিচি এসেছে আজ স্কুলে।'

আলো-আঁধারি সৃষ্টি করেছে চারপাশে ফুটো করা টিন দিয়ে ঘেরা লণ্ঠন। আলমানযো লক্ষ করল, বাবাকে গম্ভীর দেখাচ্ছে। দাড়িতে হাত বুলিয়ে মাথা নাড়ল বার কয়েক। কী বলে শুনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে আলমানযো, কিন্তু কিছুই না বলে লণ্ঠনটা হাতে তুলে নিয়ে গোলাবাড়ির সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না ঘুরে দেখতে চলে গেল বাবা। কাজ শেষ, এইবার বাড়িতে গিয়ে ঢুকল দু'ভাই।

ভয়ানক ঠাণ্ডা। আঁধার রাত একেবারে নিস্তব্ধ। জ্বল-জ্বল জ্বলছে আকাশের তারাগুলো। প্রশস্ত, আলোকিত, গরম রান্নাঘরে ঢুকতে পেরে আলমানযোর মনে হলো—বাঁচলাম! খিদেও লেগেছে প্রচণ্ড। পানি গরম করে রাখা হয়েছে, দরজার পাশে বসানো বেসিনে প্রথমে বাবা, তারপর রয়াল এবং সবশেষে আলমানযো হাত-মুখ ধুয়ে নিল। ভাল করে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে ছোট্ট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে নিল।

রান্নাঘরে স্কার্টের ছড়াছড়ি। কোনওটা এদিক যাচ্ছে, কোনওটা ওদিক, কোনওটা আবার চরকির মত পাক খেয়ে বৃত্ত তৈরি করছে। ব্যস্ত হাতে ডিশে সাপার তুলছে ইলাইযা জেন আর অ্যালিস, এখুনি পরিবেশন করবে। ভাজা মাংসে বাদামী রঙ ধরেছে—গন্ধে পাকস্থলীটা কেমন যেন নড়েচড়ে উঠল আলমানযোর। মনে হলো কেউ যেন খামচি দিচ্ছে পেটের ভিতর।

পাশের স্টোররুমে আধ মিনিটের জন্য একটু থামল আলমানযো। ঘরের

ওপাশে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে দুধ জ্বাল দিচ্ছে মা। দুপাশের শেল্‌ফ্‌-এ সাজানো রয়েছে মজার মজার সব খাবার। মস্ত হলুদ পনিরের চাকার পাশে তামাটে রঙের মেপ্‌ল্‌ সুগারের চাকা, সদ্য তৈরি করা পাউরুটি মন-ভোলানো গন্ধ ছাড়ছে, তার পাশেই রাখা চারটে বড়সড় কেক। একটা গোটা শেল্‌ফ্‌ জুড়ে রাখা আছে মজার মজার পিঠে। একটা পিঠের কিছুটা অংশ কাটা হয়েছে, ছোট একটা টুকরো পড়ে আছে বাসনের উপর লোভনীয় ভঙ্গিতে—ওটুকু থাকলেই কী, আর না থাকলেই কী, ভেবে হাতটা যেই বাড়াতে যাবে অমনি পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল ইলাইযা জেন, 'অ্যাই, কী হচ্ছে? দেখো, মা, কী করে!' কথাটা বলেই ডিশ হাতে ছুটল খাবার টেবিলে রাখতে।

পিছনে না ফিরেই মা বলল, 'ওটা থাক, আলমানযো। খিদে নষ্ট হবে।'

এর কোনও অর্থ হয়?—রেগে গেল আলমানযো। ছোট্ট একটা টুকরো খেলেই খিদে নষ্ট হয়ে যাবে? মহা জ্বালাতন! খিদেয় পেট চিন-চিন করছে, অথচ টেবিল সাজানোর আগে এক কামড়ও খাওয়া যাবে না! কোনও মানে হয় না এসবের। কিন্তু কথাটা তো মাকে বলা যায় না, মা যা বলবে সেটাই আইন, মেনে চলতে হবে।

বিকট ভেংচি কেটে জিভ দেখাল সে ইলাইযা জেনকে। দুই হাতে দুটো ডিশ ধরা বলে কিছুই করতে পারল না ও। পাছে ফেরবার পথে কিল-টিল দেয়, এই ভেবে চট্‌ করে ডাইনিংরুমে ঢুকে পড়ল আলমানযো।

খাবার ঘরে প্রচুর আলো। চারকোনা হীটিং-স্টোভের পাশে বসে রাজনীতির কথা আলাপ করছে বাবা আর মিস্টার কর্স। খাবার টেবিলের দিকে মুখ করে বসেছে বাবা, কাজেই কিছুতে হাত দেওয়ার সাহস হলো না আলমানযোর।

পুরু করে কাটা পনিরের টুকরো রয়েছে বড় একটা প্লেটের উপর, আরেক প্লেটে রয়েছে থকথকে কম্পমান হেডচীজ; কাঁচের ডিশে রয়েছে জ্যাম, জেলি; বড় এক জগ ভর্তি দুধ, একটা পাত্রে ধোঁয়া উঠছে শিমের সেদ্ধ করা বীচি দিয়ে কোরমার মত করে রান্না করা মাংস থেকে—উপরে ছড়ানো রয়েছে বিস্কিটের গুঁড়ো।

সব এখনও আসেনি টেবিলে, যা এসেছে তাই দেখেই পেটের ভিতর ডিগবাজি দিচ্ছে নাড়ীভুঁড়ি। ঢোক গিলে ধীর পায়ে সরে গেল আলমানযো ওখান থেকে। এতিমের মতন ঘোরাঘুরি করছে ও বিশাল খাবার ঘরে, এমন সময় চোখ পড়ল মা'র উপর—মস্ত এক কাঠের ট্রেতে করে ভাজা মাংস নিয়ে ঢুকছে।

কিছুটা খাটো আর মোটাসোটা হলেও মা দেখতে ভাল। নীল চোখ, বাদামী চুল আর মানানসই জামা-কাপড়ে চমৎকার লাগে। ট্রে-টা টেবিলে নামিয়ে রেখে সব ঠিকঠাক আছে কি না একনজর দেখে নিল মা, তারপর কোমরে জড়ানো অ্যাপ্রনটা খুলে রেখে অপেক্ষায় থাকল কখন বাবার কথা শেষ হয়।

ভাজা মাংসের গন্ধটা নাকে যেতেই চন্‌মন্‌ করে উঠল আলমানযোর মন-প্রাণ। ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে একটা টুকরো তুলে কামড় বসায়।

'জেমস, এসো, খাবার দেয়া হয়েছে,' সামান্য একটু বিরতি পেয়ে বলে ফেলল মা।

'হ্যাঁ, এই যে, আসছি,' বলে উঠে দাঁড়াল বাবা।

সবাই নিজ-নিজ জায়গায় বসল। বাবা এক মাথায়, মা আরেক মাথায়। সবাই মাথা নিচু করে থাকল, বাবা সবার হয়ে ধন্যবাদ দিল ঈশ্বরকে; অনুরোধ করল, যেন খাবারগুলোর উপর তিনি তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। এরপর কয়েক সেকেন্ডের বিরতি। বাবা একটা ন্যাপকিন খুলে গলার কাছে গুঁজে নিয়ে প্লেটে খাবার তুলতে শুরু করল। প্রথমে মিস্টার কর্সের প্লেট, তারপর মায়ের। তারপর রয়াল, ইলাইযা জেন ও অ্যালিসের প্লেট ভর্তি করে আলমানযোর প্লেটের দিকে হাত বাড়াল।

'থ্যাঙ্ক ইউ,' বলল আলমানযো ভরা প্লেট পেয়ে। ছোটদের এর বেশি কথা বলবার নিয়ম নেই। বাবা, মা আর মিস্টার কর্স কথা বলবে, ছেলেমেয়েরা শুধু শুনবে, বড়রা কেউ প্রশ্ন করলে সংক্ষেপে জবাব দেবে।

প্রথমে সেদ্ধ শিমের বীচি আর মাংস খেল আলমানযো। লবণ দেওয়া মাংস মাখনের মত গলে যাচ্ছে মুখের ভিতর। তারপর সেদ্ধ আলু বাদামী গ্রেভিতে চুবিয়ে খেল। তারপর খেল ভাজা মাংস, সঙ্গে পুরু মাখন দেওয়া পাউরুটি। তারপর প্রথমে একটা শালগম ভর্তা, পরে একটা হালকা সেদ্ধ করা মিষ্টি কুমড়োর পাহাড় ধ্বংস করল। এবার বড় করে একটা শ্বাস ছেড়ে ন্যাপকিনটা আর একটু ভাল করে গুঁজে নিল নেক-ব্যান্ডের ভিতর। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল স্ট্রবেরি জ্যাম আর আঙুরের জেলির উপর। এরপর তরমুজের খোসা দিয়ে তৈরি মশলাদার আচার চেটে নিল কিছুক্ষণ। পেটের ভিতরটা বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। সবশেষে ধীরে-সুস্থে বড় একটুকরো কুমড়োর মোরব্বার দিকে মন দিল।

'রয়াল বলল, হার্ডস্ক্র্যাবলের ছেলেরা নাকি আজ স্কুলে এসেছে,' মিস্টার কর্সের দিকে ফিরে বলল বাবা।

'হ্যাঁ,' খুব সংক্ষেপে জবাব দিলেন মিস্টার কর্স, কারণ আলমানযোর মত তিনিও ব্যস্ত এখন।

'শুনলাম ওরা বলে বেড়াচ্ছে আপনাকেই শিক্ষা দেবে।'

'মনে হচ্ছে চেষ্টার ত্রুটি করবে না।'

তস্তরিতে ঢেলে চায়ে চুমুক দিচ্ছে বাবা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'দু'জন টীচারকে খেদিয়েছে ওরা। গত বছর জোহান লেনকে এমনই জখম করেছিল, বেচারা শেষকালে মারাই গেল।'

'জানি আমি,' বললেন মিস্টার কর্স। 'জোহান লেন আর আমি একই সঙ্গে লেখাপড়া করেছি–সেই স্কুল থেকে। ও আমার বন্ধু ছিল।'

আর কিছু বলল না বাবা।

তিন

সাপার শেষ করে মোকাসিনে চর্বি মাখাতে বসল আলমানযো চুলোর ধারে। এটা ওর রোজকার কাজ। চুলোর উপর ধরে গরম করে নিয়ে শক্ত চর্বির দলা ঘষলে গলা চর্বি লেগে যায় চামড়ার উপর, তারপর হাতের তালু দিয়ে ঘষে মিশিয়ে দেওয়া। এর ফলে নরম থাকবে চামড়া, শুকনো থাকবে পা।

রয়ালও বসে গেছে ওর বুট নিয়ে, চর্বি মাখাচ্ছে ঘষে ঘষে। আলমানযো ছোট বলে বুট পায়নি, মোকাসিন পরতে হয় ওকে।

মেয়েদের নিয়ে ডিশগুলো ধুয়ে-মেজে রান্নাঘর ও ভাঁড়ার-ঘর ঝাড়ু দিচ্ছে মা, বাবা তলকুঠুরিতে গিয়ে আলু আর গাজর কেটে তৈরি রাখছে গরুগুলোর আগামীকালকের খাবার।

কাজ শেষ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল বাবা, জগে করে মিষ্টি সাইডার (আপেলের রস) আর ঝুড়িতে করে আপেল এনেছে সবার জন্য। রয়াল একবাটি পপ-কর্ন নিয়ে এল কর্ন-পপারে সেঁকবে বলে। রান্নাঘরের চুলো নিভিয়ে দিয়েছে মা ছাই দিয়ে, সবাই বেরিয়ে যেতে নিভিয়ে দিল মোমবাতিগুলোও।

খাবার ঘরের দেয়ালে বসানো বড় স্টোভের ধারে গিয়ে বসল এবার সবাই। স্টোভের ওধারটা রয়েছে বৈঠকখানায়। ওখানে মেহমানদের বসানো হয়, ছেলেমেয়েদের বিনা কারণে ঢোকা নিষেধ। একটা স্টোভ দিয়েই খাবারঘর আর বৈঠকখানা গরম হয়, চিমনির মাধ্যমে উপরতলার বেডরুমগুলোও গরম থাকে। স্টোভের উপরদিকটা চুলোরও কাজ দেয়।

লোহার ঢাকনি সরিয়ে এখানেই পপ-কর্ন সেঁকছে রয়াল। তারের পপারের উপর শুয়ে আছে সাদা দানাগুলো, হঠাৎ একটা দানা ফুটল, তারপর আর একটা, তারপর তিন-চারটে একসঙ্গে, তারপরই একসঙ্গে শত শত দানা বিস্ফোরিত হলো।

বিরাট ডিশ-প্যানটা যখন ভর্তি হয়ে গেল পপ-কর্নে, অ্যালিস ওর মধ্যে গলানো মাখন ছাড়ল, তারপর খানিকটা লবণ দিয়ে নাড়ল আচ্ছামত। দারুণ গন্ধ ছাড়ছে এখন পপ-কর্ন, যার যত খুশি খাও।

রকিং চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে, আর উল বুনছে মা। বাবা ভাঙা কাঁচের টুকরো দিয়ে যত্নের সঙ্গে চেঁছে মসৃণ করছে একটা নতুন কুঠারের হাতল। পাইনের ডাল কুঁদে একটা শেকল বানাচ্ছে রয়াল, অ্যালিস এমব্রয়ডারি করছে। খানিক পরপরই সবার হাত যাচ্ছে ডিশ-প্যানের দিকে; একমুঠ পপ-কর্ন মুখে ফেলে বার কয়েক চিবানোর পর আপেলে একটা কামড়, তারপর আবার পপ-কর্ন, সঙ্গে একঢোক সাইডার–সমানে চলেছে হাত-মুখ। ইলাইযা জেন শুধু জোরে জোরে খবর পড়ছে নিউ ইয়র্ক সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে।

স্টোভের ধারে ফুট-স্টূলে বসে খাচ্ছে আর ভাবছে আলমানযো: দুধ দিয়ে কানায় কানায় ভরা একটা গ্লাসের মধ্যে একই সমান আর এক গ্লাস-ভর্তি পপ-কর্ন যদি একটা একটা করে ছাড়া যায়, সমস্ত পপ-কর্ন ঢুকে যাবে দুধের গ্লাসে, কিন্তু একফোঁটা দুধও উপচে পড়বে না বাইরে। আর কিছু দিয়েই এটা সম্ভব নয়, রুটি দিয়ে তো একেবারেই না–কিন্তু কী করে হয় এটা?

ভাবতে ভাবতে দুধে পপ-কর্ন দিয়ে খাওয়ার ইচ্ছে জাগল মনে। কিন্তু পেট ভরা, ওদিক থেকে তেমন কোনও তাগিদ এল না। তা ছাড়া এখন দুধের বাটি নাড়াচাড়াটা পছন্দ করবে না মা। সবে সর পড়তে শুরু করেছে, এখন দুধ নাড়লে পুরু হবে না সর। কাজেই এককামড় সরস আপেল, একমুঠ পপ-কর্ন, তারপর একঢোক সাইডার–এভাবেই চালিয়ে গেল ও রাত ন'টা পর্যন্ত।

ঘড়িতে ন'টা বাজতেই শুতে যাবে বলে উঠে পড়ল ওরা। চেইন সরিয়ে রাখল রয়াল, অ্যালিস রেখে দিল এমব্রয়ডারির সুচ-সুতো, উলের বলে কাঁটা দুটো গেঁথে রাখল মা। বাবা চাবি দিল ঘড়িতে, তারপর স্টোভে আর একটা কাঠ চাপিয়ে বন্ধ করে দিল ড্যাম্পার।

'খুব শীত পড়েছে,' বললেন মিস্টার কর্স।

'শূন্যের নীচে চল্লিশ ডিগ্রী,' জবাবে বলল বাবা, 'আরও শীত পড়বে ভোরে।'

একটা মোম জ্বেলে নিল রয়াল, ঘুম-ঘুম চোখে তাকে অনুসরণ করে সিঁড়িঘরের দরজার দিকে চলল আলমানযো। কিন্তু সিঁড়িতে পা দিতেই তীব্র ঠাণ্ডায় পুরো খুলে গেল চোখ। দৌড়ে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। অসম্ভব ঠাণ্ডা হয়ে আছে বেডরুম। কোনও মতে বোতাম খুলে কাপড় ছেড়ে উলের নাইট শার্ট আর ক্যাপ পরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়। ঘুমের আগে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করা নিয়ম, কিন্তু শীতের জ্বালায় ওসবের ধার দিয়েও গেল না ও। নাকের ডগায় ব্যথা, দুপাটি দাঁত মারপিট শুরু করে দিয়েছে নিজেদের মধ্যে–আওয়াজ হচ্ছে খটাখট। রাজহাঁসের পালক দিয়ে তৈরি বিছানায় দুই কম্বলের মাঝে ঢুকে নাক পর্যন্ত ঢেকে ফেলল ও ঝটপট।

ঘুম যখন ভাঙল, নীচের বড় ঘড়িটায় তখন রাত বারোটার ঘণ্টা পড়ছে। চারদিকে নিবিড় অন্ধকার। আওয়াজ পেল, সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে কেউ। রান্নাঘরের দরজাটা খুলল, তারপর বন্ধ হলো। ও জানে, বাবা যাচ্ছে গোলাবাড়িতে। এত বিরাট গোলাঘরেও সব পশুর জায়গা হয়নি, গোটা পঁচিশেক গরুকে শুতে হয় গোলা-প্রাঙ্গণের একটা খোলা শেডে। সারা রাত একভাবে শুয়ে থাকলে ঘুমের মধ্যেই জমে যাবে। তাই এই চরম ঠাণ্ডাতেও গরম বিছানা ছেড়ে মাঝরাতে উঠে হেই-হ্যাট করে ওদের জাগায় বাবা, চাবুকের আওয়াজ তুলে প্রাঙ্গণের ভিতর এদিক থেকে ওদিক দৌড় করায়।

আবার যখন চোখ মেলল, আলমানযো দেখল মোমের কাঁপা আলোয় কাপড় পরছে রয়াল। ওর নিঃশ্বাস নাক থেকে বেরিয়েই বাষ্প হয়ে যাচ্ছে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই অদৃশ্য হয়ে গেল রয়াল, মোমবাতিটাও গায়েব। নীচে সিঁড়ির গোড়া থেকে হাঁক ছাড়ছে মা, 'কী হলো, আলমানযো, উঠছ না কেন? পাঁচটা বাজে!'

কাঁপতে কাঁপতে জামা পরে নিল আলমানযো, দৌড়ে নেমে গিয়ে দাঁড়াল রান্নাঘরের স্টোভের পাশে, ব্যস্ত হাতে বোতাম লাগাচ্ছে এখনও। বাবা আর রয়াল গোলাবাড়িতে চলে গেছে। দুধের বালতিগুলো নিয়ে ছুটল সে। এখনও গাঢ় অন্ধকার, উজ্জ্বল তারাগুলো তেমনি জ্বলছে আকাশে।

প্রাত্যহিক কাজগুলো সেরে বাবা আর রয়ালের সঙ্গে ও যখন রান্নাঘরে ফিরে এল, নাস্তা তখন প্রায় তৈরি। আহ্, কী অপূর্ব সুগন্ধ! প্যানকেক ভাজছে মা। চুলোর পাশে রাখা বড় একটা প্লেটে উঁচু হয়ে থাকা বাদামী সসেজ থেকে রস গড়াচ্ছে।

হাত-মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে নিল আলমানযো। দুধ জ্বাল দেওয়া সেরে মা আসতেই বসে পড়ল ওরা নাস্তার জন্য। ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে খাওয়া শুরু করল সবাই।

জই রান্না করা হয়েছে, প্রচুর দুধের সর আর চিনি মিশিয়ে খাও যার যত খুশি। এরপর রয়েছে ভাজা আলু, সোনালী বাকহুইটের পিঠে, সসেজ, মাখন, মেপল্ সিরাপ, জ্যাম, জেলি, ডোনাট। আলমানযোর সবচেয়ে বেশি পছন্দ পুরু, রসাল, মুড়মুড়ে, মশলাদার আপেল-পাই; তাই দুইবারে অনেকটা করে নিয়ে খেল। তারপর কানের উপর এয়ার মাফ্ এঁটে, মাফলার দিয়ে নাক ঢেকে, দস্তানা পরা হাতে টিফিনবাটি নিয়ে রওনা হলো লম্বা রাস্তা ধরে স্কুলের পথে। আজ স্কুলে যাওয়ার বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করছে না আলমানযো, কারণ, বড় ছেলেরা যখন মিস্টার কর্সকে ধরে মারবে, সে-দৃশ্য ও দেখতে চায় না। কিন্তু স্কুলে না গিয়েও তো উপায় নেই, বয়স হয়ে গেছে অনেক···ন-য় ব-ছ-র!

চার

প্রত্যেকদিন ঠিক দুপুর বেলা হার্ডস্ক্র্যাব্‌ল্ হিল থেকে নেমে আসে কাঠ-বোঝাই বব-স্লেড, ছেলেরা ছুটে গিয়ে নিজেদের স্লেড বাঁধে ওগুলোর রানারের সঙ্গে, তারপর ঘোড়ার টানে হড়-হড় করে চলে যায় স্কুলের পাশ দিয়ে। বেশিরভাগ ছেলে কিছুদূর গিয়েই ফিরে এল আজ জানালায় টোকা পড়বার আগেই। শুধু বিগ বিল রিচি আর তার দোস্তরা মিস্টার কর্সের সতর্কবাণীর পরোয়া করল না, আজও ফিরল দেরি করে। শুধু তাই নয়, ঠোঁটে টিটকারির হাসি নিয়ে আড়চোখে তাকাল তাঁর দিকে, তারপর দুই সারির ডেস্কগুলোর গায়ে কোমরের ধাক্কা দিয়ে সবার মনোযোগে বিঘ্ন ঘটিয়ে নিজেদের সীটে গিয়ে বসল। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে, কথা বলছে নিচু গলায়।

ওরা সীটে গিয়ে না বসা পর্যন্ত চুপ করে তাকিয়ে থাকলেন মিস্টার কর্স, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আর একবার এরকম হলে শাস্তি দেব।'

আগামীকাল কী হবে বুঝতে বাকি থাকল না কারও আর।

সেদিন বাড়ি ফিরে রয়াল আর আলমানযো সব বলল বাবাকে। আলমানযো বলল, 'এটা একেবারেই অসম লড়াই, বাবা। ওদের একজনের সঙ্গেও তো পারবেন না উনি; প্রত্যেকেই ওরা ওঁর চেয়ে লম্বা-চওড়া, জোরও বেশি। সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়লে বেচারা মিস্টার কর্সের কী অবস্থা হবে? ইশ্‌শ্‌, আমি যদি বড় হতাম···অন্তত যদি ওদের সমান হতাম, তা হলে ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতাম মিস্টার কর্সের পাশে।'

আলমানযোর আক্ষেপ শুনে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বাবা ওর দিকে, তারপর বলল, 'শোনো, বাপ, স্কুলে পড়ানোর জন্যে ভাড়া করা হয়েছে মিস্টার কর্সকে। স্কুলের ট্রাস্টিরা সব কথা খুলে বলেছেন ওঁকে, জেনে-বুঝেই কাজটা নিয়েছেন উনি। পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেবেন সেটা সম্পূর্ণই তাঁর নিজস্ব ব্যাপার, তোমাদের নয়।'

'কিন্তু···হয়তো মেরেই ফেলবে ওরা ওঁকে!' প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল আলমানযো।

'সেটা তাঁর ব্যাপার,' বলল বাবা। 'যখন মানুষ কোনও কাজ হাতে নেয়, সেটা ঠিকভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্ব তার নিজের। কর্সকে যতটুকু চিনেছি, তাঁর কাজে আর কেউ বাগড়া দিলে খুশি হবেন বলে মনে হয় না। তাঁর কাজ তাঁকেই করতে দাও।'

বাবার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারল না আলমানযো, বলল, 'মারা যাবেন বেচারা! এটা বড় অন্যায় হচ্ছে—পাঁচজনের সঙ্গে একা উনি পারবেন কী করে?'

'অত ঘাবড়িয়ো না,' বলল বাবা। 'কী হবে তা কে জানে? হয়তো আশ্চর্য কিছুও ঘটতে পারে,' বলেই তাড়া লাগাল, 'এবার এসো, হাত লাগাও; এই কাজগুলো তো আর সারারাত ফেলে রাখা যায় না।'

আর কথা চলে না, চুপচাপ কাজে লেগে পড়ল আলমানযো।

পরদিন সকালে ক্লাসে বই হাতে ধরে বসে থাকল ও, কিন্তু একফোঁটা মন দিতে পারল না পড়ায়। কী ঘটতে চলেছে ভেবে ছোট্ট বুকটা কাঁপছে ওর। ওর পড়া যখন ধরা হলো, কিচ্ছু উত্তর দিতে পারল না আলমানযো। কাজেই শাস্তি হিসেবে বিরতির সময়টা মেয়েদের সঙ্গে বসে পড়া তৈরি করতে হলো ওকে। কিন্তু মনটা বই থেকে সরে যাচ্ছে বারবার, মনে হচ্ছে, আহা, যদি বিল রিচির সমান বড় হয়ে যেতে পারত কোনও জাদুমন্ত্রের বলে!

দুপুরে খেলতে বেরিয়ে বিলের বাবা মিস্টার রিচিকে দেখতে পেল ও, পাহাড় থেকে কাঠ-বোঝাই বব-স্লেড নিয়ে নেমে আসছেন। ছেলেরা সবাই দাঁড়িয়ে গেল যে যেখানে আছে, দেখছে মিস্টার রিচিকে। বিশাল দৈত্যের মত চেহারা, তেমনি কর্কশ, উঁচু কণ্ঠস্বর, উচ্চকণ্ঠ হাসি। বিলকে নিয়ে তাঁর গর্বের সীমা নেই, তাঁর ধারণা, স্কুল টীচারদের মারধর করে, স্কুল ভাংচুর করে বিরাট বীরত্বেরই পরিচয় দিচ্ছে তাঁর ছেলে।

মিস্টার রিচির বব-স্লেডে নিজের স্লেড বাঁধবার জন্য কেউ ছুটে গেল না, তবে বিল রিচি আর তার স্যাঙাৎরা উঠে বসল কাঠের বোঝার উপর, উঁচু গলায় কথা বলতে বলতে বাঁক ঘুরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। আর সব ছেলেরা ভুলে গেছে খেলার কথা, নিচু কণ্ঠে আলোচনা করছে আজ কী ঘটবে তাই নিয়ে।

জানালায় টোকা পড়তেই ধীর পায়ে শান্তশিষ্ট হয়ে ঢুকল সবাই ক্লাসরুমে। কিন্তু পড়া পারল না কেউ। ছোট থেকে বড় সবাইকে পড়া ধরলেন মিস্টার কর্স, প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়ে জুতোর আগা দিয়ে মেঝে খুঁড়ল, কিন্তু জবাব দিতে পারল না কেউ। কাউকেই কোন শাস্তি দিলেন না মিস্টার কর্স, মৃদু হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, বাড়ি থেকে তৈরি হয়ে এসো, এই পড়াই ধরব আগামীকাল।'

সবাই জানে, আগামীকাল পড়া ধরতে পারবেন না মিস্টার কর্স। এই শান্ত, নরম ভদ্রলোকটিকে ভাল লেগে গিয়েছিল সবার। প্রথমে একটা বাচ্চা মেয়ে কেঁদে উঠল, তারপরেই কয়েকটা মাথা নেমে গেল ডেস্কের উপর—কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। সিধে হয়ে বসে একদৃষ্টে বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল আলমানযো।

বেশ অনেকক্ষণ পর ওকে ডেস্কের ধারে ডাকলেন মিস্টার কর্স, পড়া ধরলেন। সব জানা আছে আলমানযোর, কিন্তু গলার কাছে কী যেন আটকে আছে বলে মনে হলো, একটা শব্দও বের হলো না মুখ দিয়ে। বোকার মত বইয়ের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও। হাসিমুখে চুপচাপ অপেক্ষা করছেন মিস্টার কর্স, এমনি সময়ে শোনা গেল, উঁচুগলায়, বেপরোয়া ভঙ্গিতে কথা বলতে বলতে আসছে বড় ছেলেরা।

উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার কর্স, আলতো ভাবে হাত রাখলেন আলমানযোর কাঁধে। ওকে ঘুরিয়ে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'নিজের সীটে গিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত চুপ করে বসো, আলমানযো।'

স্থির হয়ে গেছে ঘরের সবাই। প্রত্যেকে অপেক্ষা করছে। দড়াম করে বাইরের দরজা খুলে হৈ-হৈ করে ঢুকল ওরা, নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-মস্করা করতে করতে এগিয়ে আসছে। ধাক্কা দিয়ে ক্লাসরুমের দরজা খুলল বিগ বিল রিচি, বাকি চারজন রয়েছে ওর পেছনে।

ওদের দিকে চাইলেন মিস্টার কর্স, কিন্তু কিছু বললেন না। ওঁর মুখের উপর হেসে উঠল বিল রিচি, তাও কোন কথা বললেন না। পেছনের ছেলেরা ঠেলাঠেলি করছে রিচিকে। বিদ্রূপের হাসি ঠোঁটে নিয়ে চেয়ে রয়েছে ও মিস্টার কর্সের চোখের দিকে, আশা করছে, এখন কিছু বলুক টীচার, অমনি মার শুরু করবে—কিন্তু কিছু বললেন না দেখে বাকি চারজনকে নিয়ে সদর্পে নিজেদের সীটে গিয়ে বসল।

এতক্ষণে ডেস্কের ঢাকনিটা সামান্য উঁচু করে কথা বললেন মিস্টার কর্স, 'রিচি, উঠে এসো এদিকে।'

এক লাফে উঠে দাঁড়াল বিগ বিল। টান দিয়ে কোটটা খুলেই হাঁক ছাড়ল, 'চলে আয় সবাই!' লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে ও দুই সারি ডেস্কের মাঝ দিয়ে।

ভয়ে কলজেটা শুকিয়ে গেল আলমানযোর। যা ঘটবে তা ও দেখতে চায় না, কিন্তু চোখও ফেরাতে পারছে না।

ডেস্ক থেকে এক-পা সরে গেলেন মিস্টার কর্স। ডেস্কের ঢাকনির নীচ থেকে সাঁৎ করে বেরিয়ে এল ওঁর ডান হাত। কালো একটা রেখার মত লম্বা, সরু কী যেন বেরিয়ে এসে তীক্ষ্ণ শিসের মত আওয়াজ তুলল বাতাসে।

ওটা পনেরো ফুট লম্বা একটা ব্ল্যাকস্নেক চাবুক। লোহা দিয়ে মোড়া ছোট্ট

হ্যান্ডেলটা মিস্টার কর্সের ডানহাতে। লম্বা চাবুক উড়ে গিয়ে পেঁচিয়ে ধরল বিলের পা, হ্যাঁচকা টান দিলেন মিস্টার কর্স, হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও কোনমতে সামলে নিল বিল। বিদ্যুচ্চমকের মত আবার পেঁচিয়ে ধরল ওকে চাবুক, আবার টান দিলেন মিস্টার কর্স।

'এদিকে এসো বিল রিচি,' নরম গলায় কথাটা বলেই আবার চাবুক চালালেন তিনি। ওকে নিজের দিকে টেনে আনছেন, আর সেই সঙ্গে এক পা করে পিছিয়ে যাচ্ছেন।

এই অবস্থায় মিস্টার কর্সকে ধরা বিগ বিলের পক্ষে সম্ভব নয়। সাঁই-সাঁই চাবুকের আঘাত দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে, তীব্র টানে এগিয়ে আসছে বিল, পিছিয়ে যাচ্ছেন মিস্টার কর্স, তারপর ওর চারপাশে ঘুরে ঘুরে চালাতে থাকলেন চাবুক।

বিলের প্যান্ট-শার্ট ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে, হাত-পা থেকে চাবুকের তীক্ষ্ণ কামড় লেগে রক্ত ঝরছে। সাঁই করে আসছে চাবুক, ছোবল দিয়েই সরে যাচ্ছে বিদ্যুদ্বেগে–চোখে দেখা যায় না। এগোবার চেষ্টা করল বিল, ঠিক সেই মুহূর্তে পা-পেঁচিয়ে ধরা চাবুকে জোর টান দিলেন মিস্টার কর্স, দড়াম করে চিৎ হয়ে পড়ে গেল বিগ বিল, কেঁপে উঠল গোটা ক্লাসরুমের মেঝে। উঠে দাঁড়িয়ে গালাগালি শুরু করল বিল অকথ্য ভাষায়, তুলে ছুঁড়ে মারবে বলে টীচারের চেয়ার তুলতে গেল; ছুটে এল চাবুক, একটানে ঘুরিয়ে দিল ওকে। এতক্ষণে নিজের অসহায় অবস্থা টের পেল বিগ বিল রিচি। চাবুকের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না সে, বন্ধুরাও কেউ সাহায্য করবে না। হঠাৎ বাছুরের মত লম্বা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল রিচি। সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে ওর। ফোঁপাচ্ছে আর কাতর কণ্ঠে মাফ চাইছে।

কিন্তু চাবুকের ছোবল থামছে না। একটু একটু করে ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে ওকে দরজার কাছে নিয়ে এলেন মিস্টার কর্স, হুমড়ি খেয়ে বিল দরজার বাইরে গিয়ে পড়তেই দরজার বল্টু লাগিয়ে দিয়ে ফিরলেন বাকি চারজনের দিকে।

'এবার তুমি এসো, জন।'

বিস্ফারিত চোখে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইল জন চাবুকটার দিকে, তারপর ঘুরে পালাবার চেষ্টা করতে গেল। দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে এলেন মিস্টার কর্স, পরমুহূর্তে ছুটে এসে জনকে জড়িয়ে ধরল চাবুকটা। এক ঝাঁকিতে কয়েক পা এগিয়ে এল জন।

'প্লীজ, প্লীজ, প্লীজ, টীচার!' করুণ আকুতি জনের কণ্ঠে।

কোনও জবাব দিলেন না মিস্টার কর্স। সাঁই-সাঁই বাতাস কেটে ছুটে আসতে থাকল ব্ল্যাকস্নেক চাবুক, জনের আর্তনাদে ভরে গেল গোটা ক্লাসরুম। হাঁপাচ্ছেন, ঘাম ঝরছে গাল বেয়ে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও থামছেন না মিস্টার কর্স। টানতে টানতে দরজার কাছে এনে চাবুকের শেষ আঘাতে ওকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে লাগিয়ে দিলেন দরজা। তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন আবার।

বাকি তিনজন ততক্ষণে খুলে ফেলেছে পিছনের জানালাটা, ধুপ-ধাপ লাফিয়ে পড়ে তুষারের মধ্য দিয়ে পালাল ওরা যে যেদিকে পারে।

যত্নের সঙ্গে চাবুকটা ডেস্কের ভিতর রেখে দিলেন মিস্টার কর্স, রুমাল বের করে মুখ মুছলেন, কলারটা ঠিকঠাক করে বললেন, 'রয়াল, তুমি জানালাটা বন্ধ করে দেবে, প্লীজ?'

রয়াল বন্ধ করে দিল ওটা। এবার, যেন কিছুই হয়নি এমনি ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে অঙ্ক ধরলেন মিস্টার কর্স। কেউ পারল না একটা অঙ্কও।

ছুটি হতেই বাইরে বেরিয়ে সবাই খুশিতে হৈ-হুল্লোড় শুরু করল। এক বাক্যে সবাই বলল, উচিত শাস্তি হয়েছে! বড় বেড়ে গিয়েছিল রিচি আর তার দলবল। আচ্ছামত শায়েস্তা হয়েছে আজ মিস্টার কর্সের হাতে।

রাতে খেতে বসে শুনল আলমানযো বাবা আর মিস্টার কর্সের আলাপ।

মিটিমিটি হেসে বাবা বলল, 'রয়ালের কাছে শুনলাম, ওই ছেলেরা নাকি আপনাকে শিক্ষা দিতে পারেনি?'

'না। আমিই বরং কিছুটা শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি ওদের,' হাসলেন মিস্টার কর্স। 'আপনার ব্ল্যাকস্নেক চাবুকটা সত্যিই জাদু দেখিয়েছে, ধন্যবাদ।'

খাওয়া থামিয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল আলমানযো বাবার মুখের দিকে। বাবা তা হলে সবই জানত! আগে থেকেই! বিগ বিল রিচি তা হলে শায়েস্তা হয়েছে বাবার ওই চাবুক দিয়েই? ওর কাছে বাবা সবসময়ই দুনিয়ার সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোক, আজ বুঝতে পারল, সবচেয়ে ক্ষমতাশালীও।

বাবার কথা থেকে আরও জানা গেল, বিল রিচি তার বাবাকে দুপুরে বলেছে, আজই ওরা টীচারকে পিট্টি লাগাবে। সেই কথা বিশ্বাস করে তিনি শহরের সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন ছেলেদের হাতে এই নতুন টীচারটাও বেদম মার খেয়েছে আজ। ব্যাপারটা একটা কৌতুক হিসেবে নিয়েছিলেন তিনি। বাড়ি ফেরবার পথে এখানে থেমেও মজার খবরটা দিয়ে গেছেন বাবাকে—ওরা নাকি টীচারকেই শুধু পিটায়নি, ভেঙে তচ্‌নচ্ করে দিয়েছে স্কুলটা।

বাড়ি ফিরে বিলের করুণ অবস্থা দেখে মিস্টার রিচি কেমন অবাক হবেন ভাবতে গিয়ে হেসেই ফেলল আলমানযো।

পাঁচ

কদিন পর এক সকালে দুধের সর আর মেপল্-চিনি মিশিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে জই খাচ্ছে আলমানযো, এমনি সময় বাবা জানাল, আজ ওর জন্মদিন। আলমানযো ভুলেই গিয়েছিল জন্মদিনের কথা। আজ থেকে ঠিক নয় বছর আগে এমনি এক শীতের সকালে হয়েছিল ও।

'কাঠের শেডে তোমার জন্যে একটা জিনিস রাখা আছে,' বলল বাবা।

কথাটা শুনেই উঠতে যাচ্ছিল আলমানযো, মা বলল, সব নাস্তা না খেয়ে উঠে পড়লে বুঝতে হবে যে ও ভয়ানক অসুস্থ বোধ করছে—কাজেই সারাদিন বিছানায়

শুয়ে থাকতে হবে, আর তেতো ওষুধ খেতে হবে।

চট্ করে বসে পড়ল ও আবার—ওষুধের চেয়ে নাস্তা খাওয়াই ভাল।

নাস্তাটা কোনমতে শেষ করেই ছুটল আলমানযো কাঠের শেডের দিকে। ছোট্ট একটা জোয়াল রয়েছে ওখানে! লাল সিডার কাঠ দিয়ে তৈরি করেছে বাবা ওটা; যেমন শক্ত, তেমনি হালকা। অবাক হয়ে গেল আলমানযো—এত কষ্ট করেছে বাবা ওর জন্য!

'এটা আমার, বাবা? নিজের? একেবারে নিজের?'

'হ্যাঁ, বাপ। বাছুরগুলোকে ট্রেনিং দেয়ার বয়স হয়ে গেছে তোমার।'

আজ আর স্কুলে যেতে হলো না ওকে। কাজ থাকলে ওরা স্কুলে যায় না কখনও। আজ বড়ই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব চেপেছে কাঁধে, ট্রেনিং দিতে হবে এঁড়ে বাছুর দুটোকে। জোয়ালটা নিয়ে গোলাবাড়িতে গিয়ে হাজির হলো ও, বাবাও এল সঙ্গে। আলমানযো ভাবছে, বাছুর দুটোকে যদি ভাল ভাবে পোষ মানাতে পারি, তা হলে বাবা হয়তো আগামী বছর কোল্ট ট্রেনিংয়ের দায়িত্ব দেবে আমাকে।

দক্ষিণ গোলাঘরে নিজেদের স্টলে রয়েছে স্টার আর ব্রাইট। ওকে দেখেই একসঙ্গে ভিড় করে এগিয়ে এল ওরা, অমসৃণ জিভ দিয়ে চেটে দিল ওর হাত। ওরা ভেবেছে ও গাজর এনেছে বুঝি, জানে না, ওদেরকে ভদ্র বলদের আচরণ শিখতে হবে আজ থেকে।

জোয়ালটা কীভাবে ওদের নরম কাঁধে তুলতে হবে দেখিয়ে দিল বাবা। বলল, সময় পেলেই ওকে জোয়ালের ভিতর দিকের বাঁকগুলো মখমলের মত মসৃণ করতে হবে কাঁচের টুকরো ঘষে, যেন ঠিক খাপে খাপে বসে যায় বাছুরগুলোর কাঁধ, একটুও ব্যথা না লাগে। স্টলের হুঁড়কোগুলো সরাতেই ওর পিছু পিছু তুষারমোড়া, ঠাণ্ডা গোলা-প্রাঙ্গণে চলে এল ওরা।

জোয়ালের একটা দিক উঁচু করে ধরে রাখল বাবা, অন্যদিকটা ব্রাইটের ঘাড়ে বসাল আলমানযো। তারপর ব্রাইটের গলার নীচ দিয়ে একটা বো পরাল। বো-র দুই প্রান্ত জোয়ালের গায়ে তৈরি করা দুটো গর্তের ভিতর দিয়ে উঠে এল উপরে, তারপর বো-র দু-প্রান্তের ছিদ্র দিয়ে ঢুকিয়ে দিল কাঠের দুটো বো-পিন। ব্যস, আটকে গেল বো-টা জোয়ালের সঙ্গে।

নড়েচড়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে কাঁধে চাপানো অদ্ভুত জিনিসটা দেখবার চেষ্টা করছে ব্রাইট অস্বস্তি ভরে, কিন্তু নিচু কণ্ঠে তাকে আশ্বাস দিচ্ছে আলমানযো, তাই দাঁড়িয়ে থাকল স্থির হয়ে। খুশি হয়ে ওকে একটা গাজর দিল আলমানযো।

স্টারকে আর ডাকবার প্রয়োজন হলো না, ব্রাইটের কচর-মচর গাজর চিবানোর শব্দ পেয়েই এগিয়ে এল সে নিজের ভাগ নিতে। বাবা ওকে ঠেলে এগিয়ে দিল ব্রাইটের পাশে, জোয়ালের অপর প্রান্তের নীচে। বো-টা ওর গলার নীচ দিয়ে উপরে তুলে জোয়ালের সঙ্গে আটকে দিল আলমানযো বো-পিন দিয়ে।

এবার স্টারের ছোট্ট শিংদুটো একটুকরো দড়ির ফাঁস দিয়ে বেঁধে দড়িটা ধরিয়ে দিল বাবা আলমানযোর হাতে। বাছুর দুটোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল আলমানযো, চেঁচিয়ে হুকুম দিল, 'গিডাপ!'

স্টারের গলাটা লম্বা হচ্ছে ক্রমে, আলমানযোর দড়ির টানে শেষ পর্যন্ত পা বাড়াল সামনে। ওদিকে ঘোঁৎ আওয়াজ তুলে পেছনে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল ব্রাইট। জোয়াল চাপানো থাকায় মাথাটা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে স্টারের, কাজেই তাকে থামতে হলো। থেমে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা কী বুঝবার চেষ্টা করছে ওরা চোখ বড়বড় করে।

ওদেরকে ঠেলে-ধাক্কিয়ে পাশাপাশি দাঁড় করাতে সাহায্য করল বাবা আলমানযোকে, তারপর বলল, 'এবার আমি চললাম, বাপ। কীভাবে কী শেখাবে ওদের তুমিই ভেবে বের করো।' কথাটা বলেই গোলাঘরের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল বাবা।

বাবা ওর কাজ তদারকি করতে থাকছে না, আলমানযোর মনে হলো, এতেই প্রমাণ হয় যে এদিকটা সামলানোর মত বয়স ওর হয়েছে। ওর কাঁধেই এখন পুরোটা দায়িত্ব।

তুষারের উপর দাঁড়িয়ে বাছুরগুলোর দিকে চেয়ে রইল ও, ওরাও গো-বেচারা ভঙ্গিতে দেখছে ওকে। আলমানযো ভাবছে, 'গিডাপ' বললে কী করতে হবে সেটা এদের কীভাবে শেখানো যায়? আমি নিজে বুঝলে তো আর হবে না, ওদেরকে বোঝাতে হবে। কিন্তু কীভাবে? কী করলে ওরা বুঝবে, আমি যখন গিডাপ বলব, ওদের তখন সোজা সামনে এগোতে হবে?

কিছুক্ষণ ভাবল আলমানযো, তারপর বাছুর দুটোকে ওখানেই রেখে ফীড-বক্স থেকে দুই পকেট ভর্তি গাজর নিয়ে ফিরে এল। রশিটা লম্বা করে ধরে যতটা সম্ভব দূরে দাঁড়াল ও, ডান হাত পকেটে। এবার গিডাপ বলে চেঁচিয়ে উঠেই পকেট থেকে গাজর বের করে দেখাল।

সোৎসাহে এগিয়ে এল ওরা।

'ওয়াও!' কাছে আসতেই চেঁচিয়ে বলল আলমানযো। গাজর নেবে বলে থামল ওরা। দুই ছাত্রকেই একটা করে গাজর দিল ও। ওদের খাওয়া শেষ হতেই আবার পিছিয়ে গিয়ে পকেটে হাত দিয়ে চেঁচাল, 'গিডাপ!'

গিডাপ মানে যে সামনে এগোও আর ওয়াও মানে থামো—এটা বাছুরদুটো এতই দ্রুত শিখে নিল যে রীতিমত অবাক হয়ে গেল আলমানযো। ঠিক পূর্ণবয়স্ক ষাঁড়ের আচরণ করছে ওরা এখন।

বাবা এসে দাঁড়াল গোলাঘরের দরজায়। অল্প কিছুক্ষণ ওর ট্রেনিং দেওয়া দেখল, তারপর বলল, 'হয়েছে, বাপ, একদিনের জন্যে যথেষ্ট হয়েছে।'

আলমানযোর মনে হলো না যে যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু বাবার কথার উপর তো আর কথা চলে না। ওর মন বুঝে আবার বলল বাবা, 'প্রথমেই যদি বেশি খাটাও, ওরা শেখার আগ্রহ হারাবে। তা ছাড়া খাওয়ার সময় হয়ে গেছে।'

অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকাল আলমানযো। আরে, তাই তো! এক মিনিটেই পার হয়ে গেছে আধবেলা!

বো-পিন খুলে বো দুটো নামিয়ে জোয়ালটা বাছুর দুটোর ঘাড় থেকে তুলে নিল আলমানযো, ওদের তাড়িয়ে গরম স্টলে ভরে আটকে দিল দরজা। কীভাবে পরিষ্কার খড় দিয়ে ঘষে বো আর জোয়াল পেরেকে ঝুলিয়ে রাখতে হয় দেখিয়ে

দিল বাবা। ওগুলো সব সময় পরিষ্কার আর শুকনো না রাখলে ঘা হবে বাছুরের ঘাড়ে।

ঘোড়ার গোলাঘরের সামনে এক মিনিট থামল আলমানযো, দুচোখ ভরে দেখে নিল কোল্ট দুটোকে। স্টার আর ব্রাইটকে পছন্দ করে ও, কিন্তু ঘোড়ার বাচ্চার সঙ্গে ওদের কোনও তুলনাই হয় না। ঘোড়ার চেহারা, চালচলন, স্বভাব-চরিত্র, বুদ্ধি, সৌন্দর্য, চাহনি–সবকিছুই রাজকীয়; গরুর মত সাদামাঠা নয়।

'একটা কোল্টকে ট্রেনিং দিতে পারলে খুব ভাল লাগত,' মনের কথাটা বলেই ফেলল ও।

'ওটা বড়দের কাজ, বাপ,' বলল বাবা। 'ছোট্ট একটা ভুল হলেই নষ্ট হয়ে যাবে চমৎকার একটা কোল্ট।'

আর কোনও কথা না বলে বাবার পিছুপিছু ঘরে চলে এল আলমানযো।

অনেকদিন পর বাবা-মার সঙ্গে একা খেতে বসে কেমন যেন লাগল ওর। বাইরের কেউ নেই বলে রান্নাঘরেই একটা টেবিলে বসে খেয়ে নিল ওরা। খুব খিদে পেয়েছিল টের পেল আলমানযো খেতে বসে। বাবা-মার গল্প করবার ফাঁকে এক মনে খেয়ে চলল ও গপাগপ্। খাওয়া শেষ হলে থালা-বাসন ডিশ-প্যানে রেখে মা বলল, 'লাকড়ির বাক্সটা ভরে ফেলো তো, আলমানযো–তারপর আরও কয়েকটা কাজ আছে।'

স্টোভের ধারে গিয়ে উড-শেডের দরজাটা খুলল আলমানযো। খুলেই দেখে ঝকঝকে নতুন একটা হ্যান্ড-স্লেড! ওটা যে ওর হতে পারে বিশ্বাসই করতে পারছে না। ও ভেবেছিল, জোয়ালটাই ওর জন্মদিনের একমাত্র উপহার। গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কার জন্যে এই স্লেড, বাবা? এটা কি···নিশ্চয়ই আমার জন্যে না?'

হেসে উঠল মা। বাবার চোখদুটো ঝিকমিক করে উঠল। বলল, 'তবে কার? এ-বাড়িতে নয় বছরের আর কে আছে, বলো?'

হিকরি কাঠ দিয়ে নিজ হাতে সুন্দর করে বানিয়েছে বাবা। গায়ে হাত বুলিয়ে কোথাও কোনও উঁচু হয়ে থাকা গোঁজ বা জোড়া দেওয়ার ফাঁক টের পেল না আলমানযো।

'যাও, যাও, বেরিয়ে পড়ো!' হাসতে হাসতে বলল মা, 'বাইরে নিয়ে যাও স্লেডটা, দেখো একচক্কোর ঘুরে, কেমন লাগে!'

আকাশে জ্বলজ্বল করছে সূর্যটা, কিন্তু তুষারের উপর ঠাণ্ডা এখন হিমাঙ্কের চল্লিশ ডিগ্রী নীচে। সন্ধ্যা পর্যন্ত স্লেড নিয়ে আপন মনে খেলল আলমানযো। নরম তুষারে নড়তে চায় না স্লেড, কিন্তু রাস্তায় বব-স্লেডের রানার দিয়ে তৈরি হয়েছে দুটো চমৎকার শক্ত ট্র্যাক। পাহাড়ের উপর উঠে স্লেডে চড়ে সাঁ করে পিছলে নেমে আসছে ও নীচে। কিন্তু রাস্তাটা আঁকাবাঁকা আর সরু। বেশ অনেকদূর চলছে বটে, কিন্তু একসময় রাস্তা ছেড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হচ্ছে তুষারের উপর। আছড়ে পাছড়ে উঠে আবার স্লেড হাতে নিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠছে সে উপরে।

এরমধ্যে বার কয়েক আপেল, ডোনাট বা বিস্কিটের জন্য যেতে হয়েছে বাড়িতে। নীচতলাটা গরম হয়ে আছে স্টোভের আগুনে। কেউ নেই। উপরে মা'র চরকা চলছে খট্‌খটাখট্ শব্দে। উড-শেডের দরজা খুলে কান পেতে শুনল 'সিপ্

সিপ্' আওয়াজে চলছে বাবার রেঁদা, কাঠের গা থেকে সরু চিলতে উঠে আসবার খশখশে শব্দও পেল।

সিঁড়ি বেয়ে বাবার কাজের ঘরে চলে এল আলমানযো। এক হাতে একটা ডোনাট, অপর হাতে দুটো বিস্কিট। একবার এটায় একবার ওটায় কামড় দিচ্ছে থেকে থেকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, মেঝে থেকে একটা ওক কাঠের তক্তা তুলে নিয়ে রেঁদার পাঁচ-ছয় টানেই মসৃণ করে ফেলল বাবা। তক্তাটা একপাশে রেখে আরেকটা তুলে নিল মেঝে থেকে। তারই ফাঁকে চোখ তুলে ওকে দেখে ভুরু নাচাল। 'কী বাপ, কেমন লাগছে স্লেডে উঠতে?'

'খুব ভাল। বাবা, আমি পারব কাঠ চাঁছতে?'

একটু পিছিয়ে বসল বাবা, ডোনাটের শেষটুকু মুখে পুরে উঠে পড়ল আলমানযো বাবার কোলে। প্রথমে একবার ও নিজেই চেষ্টা করল, বেধে বেধে যাচ্ছে বলে ওর হাতের উপর দিয়ে বাবাও ধরল রেঁদাটা, তারপর কয়েক ঠেলা দিতেই মসৃণ হয়ে গেল তক্তাটা। তক্তা উল্টে বসাল আলমানযো, আবার কয়েক ঠেলায় মসৃণ হয়ে গেল এপিঠও। খুশি মনে বাবার কোল থেকে নেমে চলল আলমানযো মায়ের কাছে।

হাত দুটো যেন উড়ে বেড়াচ্ছে মা'র, ডানপায়ে চাপ দিচ্ছে চরকার পা-দানিতে। ঘরটা চিমনির আঁচে গরম।

দেয়াল জুড়ে ঝোলানো রয়েছে রঙ বেরঙের সুতো, গত বছর ওগুলো রঙ করেছে মা। চরকায় তৈরি হচ্ছে সাদা আর কালো উলের কাপড়।

'এটা কার জন্যে তৈরি করছ, মা?' জিজ্ঞেস করল আলমানযো।

'আঙুল দিয়ে দেখায় না, আলমানযো,' বলল মা চরকার শব্দ ছাপিয়ে উঁচু গলায়। 'এটা ভদ্রতা নয়।'

এবার আঙুল না তুলে বলল ও, 'কার জন্যে?'

'রয়াল। ওর অ্যাকাডেমি সুট হবে এটা দিয়ে,' বলল মা।

আগামী শীতে রয়াল যাচ্ছে ম্যালোনে অ্যাকাডেমিতে পড়বে বলে। মা এখন থেকেই ওর সুটের জন্য কাপড় বুনতে লেগে গেছে।

বাড়িতে সব ঠিক-ঠাক আছে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আরও দুটো ডোনাট নিয়ে খেলতে চলে গেল ও বাইরে। সন্ধ্যা হয়ে আসতে স্লেড রেখে দৈনন্দিন কাজে লেগে গেল আলমানযো। কাজের কোন অভাব নেই, মজার মজার সব কাজ—পশুদের পানি খাওয়াও, খাবার দাও, ময়লা খড় পরিষ্কার করে শুকনো খড় বিছাও স্টলগুলোয়, দুধ দোয়াও, মুরগিদের খাবার দাও; আর সুযোগ পেলেই সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্টলটার সামনে দাঁড়িয়ে দুচোখ ভরে দেখো কোল্ট দুটোকে।

গোলাঘর থেকে বেশ কিছুটা দূরে পাম্প-হাউস, ওখানেই শুরু হয় প্রথম কাজ। ঠাণ্ডা পাম্পঘরে ঢুকে প্রাণপণে পাম্প-হ্যান্ডেল ধরে চাপ দেয় আলমানযো, পানি উঠে এসে প্রথমে পড়ে টিনের একটা টুয়া মত জিনিসে, ওখান থেকে দেয়ালের একটা ফোকরের মধ্য দিয়ে গিয়ে পড়ে বাইরে রাখা বড় একটা গামলায়। গামলার গায়ে বরফের প্রলেপ পড়েছে ঠাণ্ডায়।

ওদিকে দফায় দফায় ঘোড়াগুলোকে এনে পানি খাওয়ায় বাবা। প্রথমে লাঙল-টানা আর ওয়্যাগনটানা বড় ঘোড়াগুলোকে বাচ্চাসহ আনা হয়, ওদের পানি খাওয়া হয়ে গেলে এক এক করে আনা হয় আলমানযোর প্রিয় কোল্টগুলোকে। ওগুলোকে এখনও ভালমত পোষ মানানো হয়নি, ওরা লাফায় ঝাঁপায়, পা ছোঁড়ে, ছুটে পালাবার চেষ্টা করে, বিরক্ত বোধ করে ঠাণ্ডায়। কিন্তু শক্ত করে রশি ধরে রাখে বাবা, ছুটতে দেয় না।

এদিকে প্রাণপণে পাম্প করে চলে আলমানযো, ঘোড়াগুলো কম্পমান নাক ডোবায় পানিতে, এক টানে কমিয়ে দেয় অনেকখানি। ঘোড়াগুলোর পানি খাওয়া হয়ে গেলে বাবা এসে ঢোকে পাম্প-হাউসে, বাইরে রাখা পানির গামলা ভর্তি হয়ে যায় খুব দ্রুত, তারপর গিয়ে ছেড়ে দেয় গরুগুলোকে।

গরু-বাছুরকে আর পথ দেখাতে হয় না। ছাড়া পেয়েই ছুটে আসে গামলার ধারে, ওদিকে একমনে পাম্প করে চলেছে আলমানযো। পানি খেয়ে আর দাঁড়ায় না ওরা, ছুটে চলে যায় গোলাঘরে নিজ নিজ গরম স্টলে।

পিচফর্ক নিয়ে আলমানযো স্টল পরিষ্কার করতে করতেই, জই আর মটরশুঁটি মাপ মত মেশানো হয়ে গেছে বাবার। ইতোমধ্যে রয়াল ফিরে এসেছে স্কুল থেকে। সবাই মিলে প্রাত্যহিক কাজগুলো শেষ করতে আর খুব বেশি সময় লাগে না।

ফুরিয়ে গেল জন্মদিন। কাল থেকে আবার স্কুল। কিন্তু রাতে সাপার খেতে খেতে বাবা বলল, বরফ কাটতে যাবে কাল, রয়াল আর আলমানযো ইচ্ছে করলে যেতে পারে সঙ্গে।

ছয়

এত ঠাণ্ডা পড়েছে যে, পায়ের নীচের তুষার খরখরে লাগছে বালির মত। উপরদিকে একটু পানি ছিটালে বরফের বল পড়ছে নীচে। এমন দিনেই বরফ কাটতে হয়, পুকুর থেকে চাঁই কেটে তুললেও একফোঁটা পানি পড়বে না, মুহূর্তে জমে যাবে।

বব-স্লেডে চড়ে চলেছে ওরা ট্রাউট রিভারের একটা পুকুরের দিকে। টুং-টাং বেল বাজিয়ে ছুটছে ঘোড়াগুলো, নাক দিয়ে ধোঁয়ার মত শ্বাস ছাড়ছে। বাবা আর রয়ালের মাঝখানে জায়গা করে নিয়েছে আলমানযো। সূর্য উঠছে, ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে সব কিছু, আলোর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে তুষার-কণায়।

মাইলখানেকের রাস্তা, কিন্তু এরই মধ্যে থামতে হলো একবার; ঘোড়াগুলোর নাকে বরফ জমে গিয়ে শ্বাস টানায় অসুবিধে ঘটাচ্ছে। বাবা দু'হাতে ওদের নাক ধরতেই বরফ গলে গিয়ে ওদের শ্বাসকষ্ট দূর হলো।

বব-স্লেড পুকুরে পৌঁছলে আলমানযো দেখল, ওদের আগেই এসে পড়েছে

ফ্রেঞ্চ জো আর লেযি জন। জঙ্গলেই কাঠের তৈরি কুটিরে থাকে ওরা। ওদের কোনও খামার নেই, শিকার করে, ফাঁদ পেতে জানোয়ার ধরে আর মাছ মারে। সারাক্ষণ থাকে ওরা নাচ-গান-হাসি-তামাশায়, সাইডারের বদলে রেড ওয়াইন খায়। বাবার কাজের লোক দরকার হলে ওদের ডাকে, পারিশ্রমিক হিসেবে তলকুঠরির ব্যারেল থেকে লবণ দেওয়া মাংস পায় ওরা।

উঁচু বুট পরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা পুকুরের ধারে, গায়ে দিয়েছে পুরু কম্বলের জ্যাকেট, মাথায় কান-ঢাকা ফারের টুপি। লম্বা গোঁফে জমে আছে তুষার-কণা। দুজনের কাঁধেই একটা করে কুঠার, একটা ক্রস-কাট করাতও এনেছে ওরা বরফ কাটবে বলে। ক্রস-কাট করাতের লম্বা সরু ব্লেডের দু'মাথায় দুটো কাঠের হ্যান্ডেল থাকে, দুজন দুদিকের হ্যান্ডেল ধরে সামনে পিছনে টেনে কাটতে হয়। কিন্তু আলমানযো বুঝতে পারল না এই করাত দিয়ে ওরা বরফ কাটবে কী করে। মেঝের মত বিছিয়ে আছে বরফ, কিনারা কোথায় যে করাত চালাবে?

ওদের দেখেই হাসল বাবা, বলল, 'পেনি টস্ করা হয়ে গেছে তোমাদের?'

আলমানযো ছাড়া হেসে উঠল সবাই। কৌতুকটা জানা নেই ওর বুঝতে পেরে ফ্রেঞ্চ জো বলল, 'তুমি জানো না ব্যাপারটা? একটা ক্রস্-কাট করাত দিয়ে বরফ কাটতে পাঠানো হয়েছে দুই আইরিশম্যানকে। প্রচুর কাঠ, গাছের গুঁড়ি কেটেছে ওরা, কিন্তু বরফ কাটেনি কোনদিন। বরফের দিকে চাইল ওরা, করাতের দিকে চাইল, তারপর একজন পকেট থেকে একটা পেনি বের করে বলল, 'এসো টস্ করে দেখি কে নীচে যাবে।'

এবার আলমানযোও হাসল। এই ঠাণ্ডা পানি ছোঁয়াই যায় না, নীচে গিয়ে করাত চালাবে কী করে?

পুকুরের ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। জোর বাতাস বইছে, তুষার সরিয়ে যেন ওদের জন্যই তৈরি রেখেছে বেশ কিছুটা জায়গা। জো আর জন বেশ বড়সড় একটা তিনকোনা গর্ত খুঁড়ল ওখানে। ভাঙা টুকরোগুলো সরিয়ে ফেলতেই টলটলে পানি দেখা গেল নীচে।

'বিশ ইঞ্চি মত পুরু,' বলল লেযি জন।

'তা হলে বিশ ইঞ্চি করেই কাটো,' বলল বাবা।

ফাঁক দিয়ে নীচে নামিয়ে দিল ওরা ক্রস-কাট করাতের একমাথা, তারপর কাটতে শুরু করল—ওমাথায় কারও ধরবার প্রয়োজন পড়ল না, কারণ কাঠের মত শক্ত নয় বরফ, একাই কাটা যায়। বিশ ইঞ্চি দূরে দুটো সরল রেখায় সমান্তরাল করে বিশ ফুট কাটল ওরা, তারপর কুঠার দিয়ে টোকা দিতেই বিশ ইঞ্চি চওড়া, বিশ ইঞ্চি উঁচু আর বিশ ফুট লম্বা বরফের চাঁইটা আলগা হয়ে ভাসতে থাকল পানিতে। তিনকোনা ফাঁকের দিকে ঠেলে দিল ওটাকে জন লাঠি দিয়ে। জো এবার ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ কাটতে শুরু করল বিশ ইঞ্চি পর পর, আর বাবা বড় একটা সাঁড়াশী দিয়ে ওগুলো তুলে সাজিয়ে রাখতে থাকল বব-স্লেডের উপর।

দৌড়ে গর্তের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল আলমানযো করাতের কাজ দেখবে বলে। হঠাৎ পিছলে গেল পা।

চারদিকে হাতড়ে ধরবার কিছু পেল না ও, পড়ে যাচ্ছে পানিতে। জানে, পড়েই

তলিয়ে যাবে, স্রোতের টানে চলে যাবে বরফের নীচে, কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।

হঠাৎ করাত ছেড়ে ছোবল দিল ফ্রেঞ্চ জোর একটা হাত। একটা চিৎকার কানে গেল ওর, পরমুহূর্তে অনুভব করল একটা কর্কশ হাত চেপে ধরেছে ওর পা। হেঁচকা টানে ওকে সরিয়ে আনল হাতটা। দড়াম করে উপুড় হয়ে পড়ল আলমানযো শক্ত বরফের উপর। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল গোটা শরীর। কিন্তু তারপরও চট্ করে উঠে দাঁড়াল ও। দেখল, দৌড়ে আসছে বাবা।

সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে বাবা, বিশাল, ভয়ঙ্কর।

'আচ্ছা মত চাবকানো দরকার তোমাকে!' বলল বাবা। 'বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, বাবা,' মিন মিন করে বলল আলমানযো। ও জানে, দোষ হয়ে গেছে, নয় বছরের একটা ছেলের উচিত হয়নি বোকার মত গর্তের অত কাছে যাওয়া। ভয় যেমন পেয়েছে, তেমনি লজ্জাও পেয়েছে আলমানযো। জামাকাপড়ের ভিতর কুঁকুড়ে ছোট হয়ে গেল ওর শরীরটা, পা কাঁপছে চাবুকের ভয়ে। বাবার চাবুকে খুব ব্যথা লাগে। তবে এও জানে, ওকে চাবুক মারাই উচিত। বব-স্লেডে রাখা চাবুকটা দেখল একবার।

'এবারের মত ছেড়ে দিচ্ছি,' বলল বাবা ধরা গলায়। আলমানযো জানে না, ওর চেয়েও কত বেশি ভয় পেয়েছে বাবা দুর্ঘটনার পরিণতির কথা ভেবে। 'কিনার থেকে দূরে থাকবে।'

'হ্যাঁ, বাবা,' বলল আলমানযো নিচু গলায়, সরে গেল গর্তের কিনার থেকে।

বব-স্লেড বরফে ভর্তি হয়ে গেলে গোলাঘরের পাশে বরফ-ঘরে নিয়ে আসা হলো সব। তিন ইঞ্চি পুরু করে কাঠের গুঁড়ো ছড়াল বাবা মেঝেতে, তার উপর তিন ইঞ্চি ফাঁক-ফাঁক করে বসাল বরফের চাঁই। ওগুলো বসিয়ে দিয়েই ছুটল আবার পুকুরে।

বরফ-ঘর তৈরির কাজে লেগে গেল রয়াল আর আলমানযো। প্রতিটা বরফখণ্ডের ফাঁকে কাঠের গুঁড়ো ভরে কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে আঁট করে বসাল, তারপর বেলচা দিয়ে ঘরের কোণে রাখা সমস্ত কাঠের গুঁড়ো তুলে বরফের উপর ফেলল। কোণটা খালি হতে সেখানে মেঝের উপর বাবার মত করে তিন ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে দিয়ে বরফখণ্ড বসাল তিন ইঞ্চি পুরু কাঠের গুঁড়োর উপর, তারপর সেগুলোর ফাঁকে আঁট করে কাঠের গুঁড়ো ঠেসে দিয়ে সমস্ত বরফ ঢেকে দিল তিন ইঞ্চি পুরু কাঠের গুঁড়ো দিয়ে।

যতটা সম্ভব দ্রুত কাজ করছে ওরা, কিন্তু ওদের কাজ শেষ হওয়ার আগেই আরও বরফখণ্ড নিয়ে ফিরে আসছে বাবা। প্রথম আনা বরফগুলোর উপর আবার তিন ইঞ্চি ফাঁক করে চাঁই বসিয়ে দিয়েই ছুটছে আরও আনতে। দুই ভাই কাঠি দিয়ে গুঁতিয়ে প্রতিটি ফাঁকে কাঠের গুঁড়ো ঠাসছে, তারপর কাঠের গুঁড়োর গাদা বেলচা দিয়ে তুলছে উপরের তাকে, ছড়িয়ে দিচ্ছে তিন ইঞ্চি পুরু করে। কিন্তু ওদের কাজ শেষ হওয়ার আগেই বব-স্লেড ভর্তি বরফের চাঁই নিয়ে ফিরে আসছে বাবা। আবার সাজিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে আরও আনতে।

সিকি ভাগ কাজ হতে দুপুর গড়িয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর আবার চলল

কাজ সন্ধ্যায় দৈনন্দিন কাজ শুরু হওয়া পর্যন্ত। পর পর আরও দুই দিন চলল বরফ-ঘরের কাজ। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় ছাদ-সমান উঁচু বরফের উপর কাঠের গুঁড়ো দেওয়ার পর শেষ হলো কাজ। আগামী একটা বছর থাকবে এই বরফ।

গ্রীষ্মকালেও, যতই গরম পড়ুক না কেন, কাঠের গুঁড়োর নীচে এই বরফের চাঁই গলবে না একটুও। যে-কোন সময় আইসক্রীম বা লেমোনেড বানাতে বরফের প্রয়োজন হলেই এখান থেকে খুঁড়ে নেওয়া যাবে।

সাত

শনিবারটা পছন্দ করে না আলমানযো। কারণ শনিবারই হচ্ছে গোসলের দিন।

সাপারের পর জামা-কাপড়-টুপি-দস্তানা পরে গোসলের পানি আনবার জন্য বেরোতে হয় রয়াল আর আলমানযোকে। বড় একটা বালতি নিয়ে রেইন-ওয়াটার ব্যারেলের পাশে রাখতে হয়, তারপর জমাট বরফ ভেঙে ঢেলে নিতে হয় পানি।

এক শনিবার আলমানযোর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। বাড়ির ছাতে জমাট বেঁধে রয়েছে বরফ, ওগুলো নামানো গেলে ব্যারেল থেকে একটু একটু করে পানি বের করবার দরকার হত না। রান্নাঘরের ছাদের কিনার থেকে ঝুলে আছে বরফ, হাত বাড়িয়ে ধরে টান দিল আলমানযো। কিন্তু শুধু আগাটা ভেঙে আসে। কুড়াল তুলে নিয়ে দুই হাতে ধরে মারল আলমানযো বরফের গায়ে। হুড়মুড় করে হিমবাহের মত নেমে এল একরাশ বরফ। এতই প্রচণ্ড আওয়াজ হলো যে ছুটে এল রয়াল।

'আমাকে দাও, আমাকে দাও!'

কে শোনে কার কথা! আবার কুঠার চালাল আলমানযো। আগের চেয়েও জোরে আওয়াজ হলো, আরও বেশিক্ষণ ধরে নামল বরফের ধস। আবার চাইল রয়াল কুঠারটা, ও-ও নামাবে ধস।

'তুমি তো আমার চেয়ে বড়, তুমি হাত দিয়ে করো না!'

দুই হাতে বরফে ঘুসি মারল রয়াল, আলমানযো চালাল কুঠার। এবার মনে হলো যেন নরক ভেঙে পড়ছে। আনন্দে চিৎকার করছে; আর পাগলের মত ছাদ থেকে নামাচ্ছে বরফের ধস। ছোট-বড় নানান আকৃতির বরফ পড়ে টাল হচ্ছে উঠানে। ছাদের দিকে তাকালে মনে হচ্ছে কয়েকটা দাঁত খসে পড়েছে ওটার। প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে উল্লসিত দুই ভাই, আর বিকট শব্দে নামাচ্ছে বরফের ঢল।

হঠাৎ খুলে গেল রান্নাঘরের দরজা।

'আয়-হায়!' চেঁচিয়ে উঠল মা। 'রয়াল, আলমানযো! জখম হয়েছ কেউ?'

'না, মা,' মিন-মিন করে বলল আলমানযো।

'ব্যাপারটা কী? কী করছ তোমরা?'

'গোসলের পানির জন্যে বরফ পাড়ছি, মা,' বোঝাতে চায়, খেলা নয়, কাজই

করছে ওরা।

'বাপরে! কী আওয়াজ! বরফ পাড়ছ, ভাল কথা; তাই বলে কোমাঞ্চিদের মত চেঁচাতে হবে?'

'না, মা,' বলল আলমানযো।

ঠাণ্ডায় খটাখট্ আওয়াজ করল মায়ের দু'পাটি দাঁত, বন্ধ করে দিল দরজা। চুপচাপ বরফ কুড়িয়ে বালতি ভর্তি করল ওরা। এতই ভারী হলো যে দুজনে মিলে অনেক কষ্টে টেনে হিঁচড়ে দরজার কাছে নিল, চুলোর উপর বসাতে সাহায্য লাগল বাবার।

পানি গরম হতেই রান্নাঘরের কাজ শেষ করে বেরিয়ে গেল মা। এবার গোসল।

গরম রান্নাঘরে একের পর এক গোসল সারে ওরা, শুরু হয় আলমানযোকে দিয়ে—কারণ গোসলে ওরই সবচেয়ে বেশি আপত্তি। গোসলের পর বাইরে বেরুলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে, তাই অ্যালিস এসে আলমানযোর বাথটাব খালি করে, ধুয়ে, নিজের জন্য পানি ভরবে। তারপর ইলাইযা জেন, রয়াল এবং মা। একে একে সবার গোসল হয়ে গেলে মার বাথ-টাবের পানি বাইরে ফেলে নতুন পানিতে গোসল সারবে বাবা, এবং সেই পানি বাইরে ফেলা হবে পরদিন সকালে।

আলমানযোর গোসল ঠিক মত হয়েছে কী না, সেটা পরীক্ষা করাতে হয় মাকে দিয়ে। কান, ঘাড়ের পিছন, চিবুকের নীচে ময়লা পাওয়া না গেলে জড়িয়ে ধরে আদর করবে মা, বলবে, 'এবার যাও লক্ষ্মী ছেলের মত বিছানায় গিয়ে ওঠো।'

একটা মোম ধরিয়ে ঠাণ্ডা সিঁড়ি বেয়ে প্রায় দৌড়ে উপরে নিজের বিছানায় চলে যায় আলমানযো। মোমটা নিভিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে নরম বিছানায়, প্রার্থনা শুরু করে, কিন্তু শেষ করবার আগেই ঢলে পড়ে গভীর নিদ্রায়।

পরদিন দুই বালতি ভরা ফেণায়িত দুধ নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে আলমানযো দেখল প্যানকেক বানাচ্ছে মা। আজ রোববার। চুলোর ধারে নীল রঙের বড় থালাটায় মোটাসোটা সসেজ কেক রয়েছে, আপেল পাই কাটছে ইলাইযা জেন, আর অ্যালিস ওট্‌মিল্ ঢালছে ডিশে। চুলোর পেছনে একটা থালায় দশটা প্যানকেকের পাহাড় ক্রমেই উঁচু হচ্ছে। স্মোকিং গ্রিড্‌লে একেকবার প্যানকেক তৈরি হচ্ছে আর একটা করে সাজিয়ে দিচ্ছে মা দশটা পাহাড়ের মাথায়, তারপর প্রচুর পরিমাণে মাখন আর মেপ্‌ল্-সুগার ঢালছে ওগুলোর উপর। মাখন আর চিনি গলে গিয়ে ঢুকে পড়ছে ফুলে ওঠা প্যানকেকের ভিতর, কুড়মুড়ে কিনারা উপচে নেমে আসছে নীচে।

যতক্ষণ না মালাই আর চিনি দিয়ে সবার জই খাওয়া শেষ হচ্ছে ততক্ষণ মা প্যানকেক তৈরি করতে থাকবে। প্লেটটা টেবিলে আসা মাত্র সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর উপর, আলমানযো তো খায় একেবারে নেশাগ্রস্তের মত। যতক্ষণ না চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে পড়ে মা, 'আয়-হায়! আটটা! জল্‌দি, জল্‌দি করো সবাই!'

বাদামী ঘোড়া দুটোকে ঝেড়ে-মুছে ভদ্রস্থ করে তোলে বাবা, আলমানযো স্লের ধুলো ঝাড়ে, রয়াল রুপো বাঁধানো লাগাম মুছে ঝকঝকে করে। ঘোড়াগুলো স্লে-তে জুতে ওরা যে-যার রোববারের পোশাক পরে নেয়।

রয়াল আর আলমানযোর পোশাক সাদামাঠা, কিন্তু বাবা, মা আর বোনেদের পোশাক খুবই চমৎকার, মেশিনে বোনা, দামী কাপড়ের তৈরি।

সবাই উঠে বসলে মহিষের চামড়া দিয়ে ঢাকা হয় ওদের হাঁটু, পায়ের কাছে থাকে গরম ইঁট। স্লে চলতে শুরু করলে আলমানযোর আনন্দ আর ধরে না। বাতাসের বেগে ছোটে ওরা, রোদ লেগে চকচক করে ঘোড়া দুটোর গা, ঘাড় বাঁকিয়ে দৃপ্তভঙ্গিতে ছোটে ওরা তুষার মাড়িয়ে।

লাগাম হাতে সোজা হয়ে বসে থাকে বাবা, গর্বিত ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক চায়, ঘোড়াগুলোকে ছুটতে দেয় যত জোরে ওদের খুশি। বুকের ভিতর খুশির পুলক অস্থির করে তোলে আলমানযোকে। পাঁচ মাইল দূরে ম্যালোন শহর, ওরা পৌঁছে যায় আধঘণ্টার মধ্যেই। ঘোড়াগুলোকে গির্জার আস্তাবলে রেখে, ওদের পিঠে কম্বল চাপিয়ে যখন ওরা গির্জার প্রথম ধাপে পা রাখে, ঠিক তখনই বাজতে শুরু করে গির্জার ঘণ্টা।

আলমানযো যখন ভাবে অনেক···অনেক বড় হলে তবেই বাবার মত এরকম লাগাম ধরে স্লে চালাতে পারবে, তখন কেমন যেন ছটফট করে ওঠে ওর মনটা।

দুটো ঘণ্টা বসে থাকতে হয় গির্জায় প্রিচারের সৌম্য চেহারার দিকে চেয়ে। চোখ সরালে পরে ফেরার পথে বকে বাবা। আলমানযো বোঝে না, বাবা নিজে চোখ না সরিয়ে কী করে বোঝে যে ও অন্যদিকে তাকিয়েছিল। কী করে যেন ঠিকই টের পায় বাবা।

প্রার্থনা শেষ হলে বাইরে রোদে বেরিয়ে আসে ছেলেরা। দৌড়-ঝাঁপ, হাসা-হাসি বা জোরে কথা বলা নিষেধ, কিন্তু নিচুগলায় কথা বলায় কোন বারণ নেই। চাচাত ভাই ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে দেখা হয় আলমানযোর প্রত্যেক রোববার।

ফ্র্যাঙ্কের বাবা, ওয়েসলি আঙ্কেলের পটেটো-স্টার্চ মিল আছে, শহরেই থাকে। ফ্র্যাঙ্কও সেজন্য শহুরে ছেলেদের মত হয়ে গেছে, ওদের মতই চালচলন। এই রোববার দোকান থেকে কেনা সুন্দর একটা টুপি পরে এসেছে ও। মেশিনে তৈরি নিখুঁত টুপিটার কান-ঢাকবার ফ্ল্যাপ দুটো চিবুকের নীচে যেমন বোতাম দিয়ে আটকানো যায়, তেমনি ইচ্ছে করলে উপর দিকে তুলে মাথার উপরও আঁটা যায় বোতাম। খাস নিউ ইয়র্ক সিটির তৈরি জিনিস, মিস্টার কেসের দোকান থেকে কিনে দিয়েছে ওর বাবা।

এত সুন্দর টুপি জীবনে দেখেনি আলমানযো। ওর মনে হলো, ওরকম একটা টুপি পেলে হত।

কিন্তু রয়াল বলল ওটা একেবারে বাজে টুপি। ফ্র্যাঙ্ককে বলল, 'ইয়ার ফ্ল্যাপগুলো মাথার উপর বোতাম দিয়ে আটকানোর কী মানে? মাথার উপর কারও কান আছে নাকি?' আলমানযো বুঝে ফেলল, ওই রকম একটা টুপি রয়ালেরও খুব দরকার।

'দাম কত এটার?' জিজ্ঞেস করল আলমানযো।

গর্বের সঙ্গে জবাব দিল ফ্র্যাঙ্ক, 'পঞ্চাশ সেন্ট!'

আলমানযো বুঝল, ওটা ওর আয়ত্তের বাইরে। মায়ের বানানো টুপি যেমন গরম, তেমনি পরতে আরাম; ফ্যান্সি টুপির পিছনে এত পয়সা নষ্ট করা নির্বুদ্ধিতা।

পঞ্চাশ সেন্ট মানে তো অনেক টাকা! 'আমাদের ঘোড়াগুলো দেখেছ?' বলল সে।

'হ্যাহ্! ওগুলো তোমাদের নাকি?' নাক সিটকাল ফ্র্যাঙ্ক। 'ওগুলো তোমাদের বাবার ঘোড়া। ঘোড়া তো দূরের কথা একটা কোল্টও তো নেই তোমার।'

'একটা কোল্ট পাব আমি,' বলল আলমানযো।

'কবে? কখন?' বিদ্রূপের হাসি হেসে জানতে চাইল ফ্র্যাঙ্ক।

ইলাইযা জেন পিছন ফিরে ডাকল। 'চলে এসো, আলমানযো! বাবা ঘোড়া জুতছে!'

বোনের পিছু পিছু ছুটল আলমানযো, কিন্তু পিছন থেকে চাপা কণ্ঠে বলল ফ্র্যাঙ্ক, 'পাবে না, পাবে না। কোল্টও জুটবে না তোমার কপালে!'

স্লেতে উঠে বসল আলমানযো। ভাবল, কবে বড় হবে ও? কবে যা খুশি তাই পাবে? যখন আরও ছোট ছিল, মাঝে মাঝে ওকে লাগামের প্রান্ত ধরতে দিয়েছে বাবা, কিন্তু এখন তো ও আর ছোট নেই। ও নিজে চালাতে চায়, একা। বুড়ো ঘোড়াগুলোকে দলাইমলাই বা ব্রাশ করতে দেয় ওকে বাবা আজকাল, এমন কী জমিতে মই দেওয়ার সময় চালাতেও দেয়। কিন্তু এই ঘোড়াগুলো, কিংবা কোল্টগুলোর স্টলে ঢুকবারও হুকুম নেই। বড়জোর কাছে পিঠে কেউ না থাকলে ওদের নাকে হাত বুলিয়ে বা কপাল চুলকে দেওয়ার সাহস পেয়েছে ও। বাবার কড়া হুকুম: তোমরা কোল্টগুলোর কাছ থেকে দূরে থাকবে। পাঁচ মিনিটেই ওরা এমনই বিগড়ে যেতে পারে যে মাসের পর মাস খেটেও সে দোষ সারানো যাবে না।

রোববার বাড়ি ফিরে সপ্তাহের সেরা ডিনার খায় ওরা। তারপর ইলাইযা জেন আর অ্যালিস থালাবাসন ধোয়, কিন্তু বাবা, মা, রয়াল বা আলমানযো কিচ্ছু করে না। আজ যে রোববার–কাজ করা নিষেধ। বিকেল পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকতে হয় ওদের গরম ডাইনিং-রুমে। মা বাইবেল পড়ে, ইলাইযা জেন কোনও বই পড়ে, বাবা বসে বসে ঝিমায়–হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে চমকে সোজা হয়ে বসে, আবার ঝিমায়। রয়াল বসে বসে কাঠের চেইনটা নাড়াচাড়া করে। অ্যালিস জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। আর আলমানযো চুপচাপ বসে দেখে সবাইকে। কিছু করবার উপায় নেই। রোববার কাজও করতে পারবে না, খেলতেও পারবে না। গির্জায় যাবে, আর বাসায় ফিরে চুপচাপ বসে থাকবে।

সন্ধ্যায় গোলাবাড়িতে নিত্যদিনের কাজের সময় হলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে আলমানযো।

আট

বরফ-ঘর তৈরিতে এতই ব্যস্ত ছিল যে বাছুর দুটোকে আর কোন ট্রেনিং দেওয়ার সময় পায়নি আলমানযো। তাই সোমবার সকালে বাবাকে বলল, 'আজ আর স্কুলে

যাব না, বাবা। বাছুর দুটোকে সময় না দিলে যা শিখিয়েছি সব পড়া ভুলে যাবে।'

কয়েক সেকেন্ড দাড়ি ধরে টানল বাবা, চোখ মিটমিট করল। তারপর বলল, 'মনে হচ্ছে, স্কুলে না গেলে ছোট ছেলেরাও পড়া ভুলে যেতে পারে।'

এ-কথা ভাবেনি আলমানযো, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তবে ওই বাছুরদের চেয়ে অনেক বেশি দিন ট্রেনিং পেয়েছি আমি, তা ছাড়া আমার চেয়ে তো ওরা বয়সে ছোট।'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল বাবা, দাড়ির ফাঁকে হাসির আভাস।

মা বলল, 'থাক না আজ বাড়িতে। একদিন স্কুলে না গেলে আর কত ক্ষতি হবে? তা ছাড়া ও ঠিকই তো বলেছে, বাছুর দুটোকে পোষ মানানো দরকার।'

অনুমতি পেয়েই ছুটে গেল আলমানযো গোলাঘরে। বাছুর দুটোকে বাইরে বের করে এনে নিজে নিজেই জোয়াল চাপাল ওদের কাঁধে, বো-পিন এঁটে দিয়ে স্টারের ছোট্ট শিঙে দড়ি বাঁধল। তারপর সারাটা সকাল গোলা-প্রাঙ্গণে একটু একটু করে পিছাল, 'গিডাপ' আর 'ওয়াও' বলে চেঁচাল। 'গিডাপ' বললেই আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে আসে ওরা, আর 'ওয়াও' বললেই থেমে দাঁড়িয়ে ওর দস্তানা পরা হাত থেকে গাজর নিয়ে চিবায়।

মাঝে-মধ্যে এক-আধটা কাঁচা গাজর নিজেও মুখে পুরছে ও। দুপুর হলে বাবা বলল আজকের মত যথেষ্ট হয়েছে, বিকেলে ওকে শিখিয়ে দেবে কী করে চাবুক বানাতে হয়।

ডিনারের পর ওকে নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে মূজউড গাছের কয়েকটা ডাল কাটল বাবা। উডশেডের উপরে বাবার কাজের ঘরে এনে রাখল আলমানযো ওগুলো। ডালগুলোর গা থেকে সরু ফিতের মত ছাল কীভাবে ছাড়াতে হয় দেখিয়ে দিল বাবা। তারপর শেখাল কী করে বিনুনি করতে হয়। পাঁচটা লম্বা ফিতের গোড়া প্রথমে কষে বাঁধতে হবে, তারপর আঁটো করে বুনতে হবে ওগুলো, যেন গোল হয় চাবুকটা।

সারাটা বিকেল বাবার পাশে বসে যত্নের সঙ্গে বুনল ও মূজউডের ছালগুলো। নাড়াচাড়ায় বাইরের চামড়াটা খসে পড়ে ধবধবে সাদা দেখাচ্ছে এখন চাবুকটা।

চাবুক তৈরি হওয়ার আগেই সন্ধ্যা হয়ে গেল—এখন দৈনন্দিন কাজগুলো সারতে হবে। পরদিন থেকে আবার স্কুল। কিন্তু রোজ সকালেই হিটারের পাশে বসে একটু একটু করে বুনে পাঁচ ফুট লম্বা করে ফেলল ও চাবুকটা। এবার বাবার জ্যাক-নাইফটা দিয়ে চেঁছে সুন্দর একটা হ্যান্ডেল বানিয়ে ফেলল চাবুকের জন্য, তারপর ওই ছালেরই সরু একটা ফিতে দিয়ে শক্ত করে বাঁধল চাবুকের গোড়াটা হ্যান্ডেলের মাথায়। ব্যস, চাবুক তৈরি।

আগামী গ্রীষ্মে মুচমুচে হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত চমৎকার কাজ চলবে এই চাবুকে। দু-দিন প্র্যাকটিস করেই বাবার ব্ল্যাকস্নেক চাবুকের সমানই জোরে আওয়াজ তুলতে পারে ও নিজের চাবুকটাতে। এইবার ও বাছুর দুটোকে শেখাতে পারবে 'হ' বললে যেতে হয় বামে, আর 'গী' বললে ডাইনে।

এরপর থেকে প্রতি শনিবার সকালে স্টার ও ব্রাইটের ক্লাস নেওয়া শুরু করল ও গোলা-প্রাঙ্গণে। তবে ভুলেও কখনও মারে না ও ওদের, শুধু 'ফটাস' করে

পটকা ফোটানোর আওয়াজ করে ওদের কানের পাশে। ও জানে, ওর দ্বারা যে ওদের কোনও ক্ষতি হবে না, এই বিশ্বাসটা জন্মানো দরকার বাছুরদুটোর মনে। যতই ভুল করুক, ধমকও দেয় না ও কখনও। ধৈর্যের সঙ্গে শান্ত, নরম ভঙ্গিতে শেখায় ও, কারণ ওকে একবার ভয় পেতে শুরু করলে জীবনে কখনও আর খুশি মনে আগ্রহ নিয়ে কাজ করতে পারবে না ওরা।

এখন আর সামনে দাঁড়িয়ে গাজরের লোভ দেখাতে হয় না, 'গিডাপ' আর 'ওয়াও' ভাল মতই শিখে নিয়েছে বাছুর দুটো। যখন 'গী' বলছে, ঠিক সেই মুহূর্তে স্টারের কানের পাশে পটকা ফাটানো আওয়াজ তোলে চাবুক দিয়ে। ডানদিকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে স্টার, ফলে ডাইনে ঘুরে যায় দুজনেই। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দেয় ও 'গিডাপ'—কিছুদূর সোজা চলবার পর ব্রাইটের কানের পাশে চাবুক ফুটিয়ে চেঁচিয়ে বলে 'হ'। আওয়াজ থেকে বাঁচবার জন্য ব্রাইট ঘুরে যায় বাঁদিকে, ফলে স্টারকেও ঘুরতে হয়।

কখনও-সখনও, কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দৌড় শুরু করে বাছুরদুটো—সম্ভবত খেলবার আনন্দে; আলমানযো যতই 'ওয়াও' বলে চেঁচাক, থামে না ওরা। তখন আবার প্রথম থেকে ট্রেনিং শুরু করে ও, দীর্ঘক্ষণ 'গিডাপ' আর 'ওয়াও' প্র্যাকটিস করায়।

একদিন সকালে, খুবই খোশমেজাজে ছিল, কানের পাশে 'ফটাস্' আওয়াজ হতেই দৌড় শুরু করল স্টার আর ব্রাইট, ব্যা-ব্যা ডাক ছেড়ে প্রাঙ্গণময় ছুটে বেড়াচ্ছে। আলমানযো সামনে দাঁড়িয়ে ওয়াও-ওয়াও বলে থামাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কোনও লাভ হলো না; ওকে ধাক্কা দিয়ে তুষারে ফেলে দিয়ে দৌড়াতেই থাকল। সেদিন যেন ওরা ওর কোন কথাই শুনবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাগে কাঁপছে ও, দুঃখে পানি বেরিয়ে এসেছে চোখ দিয়ে। ইচ্ছে হলো লাথি মারে ওগুলোকে, গালি দেয়, চাবুকের হাতলটা ঠুকে দেয় ওদের মাথায়। কিন্তু এসবের কিছুই করল না আলমানযো। চাবুক রেখে স্টারের শিঙে রশি বাঁধল, আবার শুরু করল প্রথম থেকে—গিডাপ, ওয়াও।

ঘটনাটা বাবাকে এক সময় খুলে বলল আলমানযো। ভেবেছিল, ওর ধৈর্য দেখে বাবা হয়তো কোল্টগুলোকে দলাই-মলাই না হোক, অন্তত চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে দেওয়ার অনুমতি দেবে ওকে। কিন্তু বাবা ওদিক দিয়েই গেল না, বলল, 'হ্যাঁ, বাপ। খুব ধৈর্য দরকার। এইভাবেই চালিয়ে যাও, দেখবে দারুণ একজোড়া ষাঁড় হয়েছে ও দুটো।

ঠিক পরের শনিবার ওর প্রতিটা নির্দেশ মেনে চলল স্টার ও ব্রাইট, এতই বাধ্য যে চাবুক ফোটানোর কোন দরকারই পড়ছে না—যা বলে, তাই করে। তবু ফটাফট্ আওয়াজ করল ও, ভাল লাগে বলে।

সেদিনই ফরাসী দুই ছেলে পিয়েখ আর লুই এল আলমানযোর সঙ্গে দেখা করতে। পিয়েখের বাবা হচ্ছে লেযি জন, লুইর বাবা ফ্রেঞ্চ জো। অনেক ভাইবোনের সঙ্গে ওরা বনের মধ্যে ছোট ছোট ঘর বানিয়ে থাকে, আর সারাক্ষণ শিকার, মাছ ধরা আর জাম কুড়ানো নিয়ে মত্ত থাকে। স্কুলে যেতে হয় না ওদের। তবে প্রায়ই আসে ওরা আলমানযোর কাছে, কখনও কাজে, কখনও খেলতে।

আলমানযোর বাছুর-ট্রেনিং দেওয়া দেখল ওরা কিছুক্ষণ। আজ ওর প্রতিটা নির্দেশ মেনে চলছে স্টার আর ব্রাইট। তাই হঠাৎ আলমানযোর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল। জন্মদিনে পাওয়া সুন্দর হ্যান্ডস্লেডটা বের করে এনে বাছুরদের জোয়ালের সঙ্গে কায়দা করে জুতে নিল। এখন স্টার আর ব্রাইট চললে হ্যান্ডস্লেডটাও চলবে পিছন পিছন।

'লুই, তুমি উঠে পড়ো স্লেডের উপর,' বলল আলমানযো।

'না, আমি সবার বড়,' বলে লুইকে ঠেলে সরিয়ে দিল পিয়েখ, 'আমি চড়ব আগে।'

'তোমার এখন না ওঠাই উচিত হবে,' বলল আলমানযো। 'বেশি ভারী ঠেকলে ঘাবড়ে গিয়ে ছুট দিতে পারে বাছুরগুলো। লুই হালকা তো, ওকেই আগে উঠতে দাও।'

'আমি উঠব না,' বলল লুই।

'আরে উঠে পড়ো, উঠে পড়ো,' তাগাদা দিল আলমানযো।

'না!' লুইয়ের সাফ জবাব।

'ভয় পাচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ, ভয় পাচ্ছে ও,' বলল পিয়েখ।

'ভয় না,' বলল লুই, 'আমার ওঠার ইচ্ছে নেই।'

'আসলে ও ভয় পেয়েছে,' টিটকারির ভঙ্গিতে হাসল পিয়েখ।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। ভয়েই এমন করছে,' বলল আলমানযো।

লুই ঘোষণা করল: একটুও ভয় পায়নি সে।

আলমানযো আর পিয়েখ মানবে না সে-কথা। ওরা ওকে ভীতু-বিলাই বলল, খোকন সোনা বলল, আম্মুর আদরের দুলাল বলল। কাজেই শেষ পর্যন্ত লুইকে উঠতেই হলো স্লেডে, অতি সাবধানে।

চড়াৎ করে চাবুক ফোটাল আলমানযো, বলল, 'গিডাপ!'

স্টার আর ব্রাইট রওনা হয়েই থেমে গেল। ঘাড় বাঁকিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে পিছনে ভারী-ভারী লাগে কেন। কিন্তু আলমানযো কড়া আদেশ দিল, 'গিডাপ!' এবার চলতেই থাকল ওরা, থামল না। পাশে পাশে হাঁটছে আলমানযো, চাবুক ফুটিয়ে চেঁচিয়ে উঠছে, 'গী!' গোলা-প্রাঙ্গণ পুরো চক্কর দেওয়ার আগেই, পিছন থেকে দৌড়ে গিয়ে স্লেডে উঠে পড়ল পিয়েখ, তারপরও শান্ত ভঙ্গিতে স্লেড টেনে চলল বাছুর দুটো, আলমানযোর আদেশ মেনে ডাইনে যায়, বাঁয়ে যায়। গোলাবাড়ির গেট খুলে দিল এবার আলমানযো।

চট্ করে স্লেড থেকে নেমে পড়ল পিয়েখ আর লুই। পিয়েখ বলল, 'এই দিল দৌড়! পালাবে ওরা!'

'আমি জানি কী করে এদের বশে রাখতে হয়,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল আলমানযো। 'দেখো তোমরা।'

স্টারের পাশে গিয়ে চাবুক ফুটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'গিডাপ!' চলতে শুরু করল স্টার ও ব্রাইট। ঘেরা প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এল বাইরের জগতে।

'হ!' চেঁচিয়ে বলল ও, একটু পরে বলল, 'গী!' দিব্যি বাড়ির পাশ দিয়ে ওদের

পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে এল রাস্তায়। 'ওয়াও!' বলতেই থেমে দাঁড়াল–ঠিক যেন বয়স্ক ষাঁড়।

আলমানযোর দক্ষতায় মুগ্ধ ও বিস্মিত পিয়েখ আর লুই এবার ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল স্লেডে। ওদের একটু পিছিয়ে বসতে বলে সবার সামনে উঠে বসল আলমানযো, ওকে ধরে থাকল পিয়েখ, আর পিয়েখকে লুই। পিছনের দুজন পা দুটো দু'পাশে উঁচু করে রেখেছে যাতে তুষারে বেধে না যায়। বাতাসে চাবুক ফুটিয়ে গম্ভীর চালে হুকুম দিল আলমানযো, 'গিডাপ!'

হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠল স্টারের লেজ, ঠিক যেন দেখাদেখি–খাড়া হয়ে গেল ব্রাইটের লেজও; পরমুহূর্তে লাফিয়ে উঠল ওদের পিছনের পাগুলো। ঝাঁকি খেয়ে ছুটল স্লেড ওদের পিছন পিছন।

'ব্যা···!' ডাক ছাড়ল স্টার। 'ব্যা···ব্যা···!' জবাব দিল ব্রাইট। আলমানযোর নাকের কাছে দুলছে ওদের লেজ, উড়ন্ত খুরগুলো একটুর জন্য নাগাল পাচ্ছে না ওর দাঁতের। 'ওয়াও!' প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে আলমানযো, 'ওয়াও! ওয়াও!'

আর কীসের ওয়াও! যেন ওকে টিটকারি দিচ্ছে, এমনি সুরে ডেকে উঠল ব্রাইট, 'ব্যা···অ্যা···!' জবাবে স্টার বলল, 'ব্যা···ব্যা···অ্যা···!'

পাহাড় থেকে স্লেডে করে নামবার চেয়ে অনেক বেশি গতিতে ছুটছে বাছুর দুটো। দু'পাশে গাছ আর তুষার ঝাপসা মত দেখা যাচ্ছে। মাঝেমাঝেই শূন্যে উঠে যাচ্ছে স্লেড, দড়াম করে নীচে পড়লে দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে ওদের।

স্টারের চেয়ে ব্রাইট একটু বেশি জোরে দৌড়াচ্ছে। ফলে রাস্তা ছেড়ে সরে যাচ্ছে ওরা, কাত হতে শুরু করেছে স্লেড। 'হ! হ!' বলতে বলতে ডাইভ দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা-নিচু পা-উঁচু অবস্থায় পড়ল আলমানযো পুরু তুষারের মধ্যে। আছড়ে-পাছড়ে উঠে থোঃ করে একগাল তুষার ফেলল।

সব চুপচাপ। রাস্তা ফাঁকা। স্লেড সহ উধাও হয়েছে বাছুরগুলো। পিয়েখ আর লুই বেরোল তুষারের নীচ থেকে। অনর্গল গাল বকে চলেছে লুই ফ্রেঞ্চ ভাষায়। নাক-চোখ থেকে তুষার মুছে পিয়েখ বলল, 'তুমি নাকি ওদের বশে রাখতে জানো? পালিয়েই তো গেল!'

অনেক দূরে একটা পাথরের দেয়ালের পাশে দেখা গেল গলা পর্যন্ত তুষারে ডুবে দাঁড়িয়ে আছে বাছুর দুটো।

'ওই দেখো,' বলল আলমানযো। 'ওই যে ওরা। পালিয়ে যায়নি।'

দৌড়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াল আলমানযো। শুধু মাথা আর কাঁধের কুঁজ দেখা যাচ্ছে ওদের। বাঁকা হয়ে গেছে জোয়াল। নাকে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, বড় বড় চোখ মেলে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে পরস্পরের দিকে, যেন জানতে চায়: 'ব্যাপারটা কী হলো?'

পিয়েখ আর লুইয়ের সাহায্যে তুষার সরিয়ে জোয়ালটা সিধে করল আলমানযো, তারপর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'গিডাপ!' কিছুটা আলমানযোর আদেশ শুনে, আর কিছুটা পিছন দিক থেকে পিয়েখ ও লুইয়ের ধাক্কা খেয়ে উঠে এল বাছুর দুটো রাস্তায়। গোলাবাড়ির দিকে রওনা হলো আলমানযো ওদের নিয়ে। বরফ থেকে উদ্ধার পেয়ে খুশি মনেই চলল ওরা, প্রতিটা হুকুম অক্ষরে

অক্ষরে পালন করছে, যেন কত বাধ্য। কিছুতেই আর স্লেডে উঠতে রাজি হলো না পিয়েখ বা লুই। হাঁটতেই নাকি ভাল লাগছে ওদের।

বাছুর দুটোকে স্টলে ঢুকিয়ে আলমানযো একমুঠ করে ভুট্টার দানা দিল খেতে, তারপর জোয়ালটা খড় দিয়ে ভালমত মুছে ঝুলিয়ে রাখল জায়গা মত, চাবুকটাও একটা পেরেকে ঝুলিয়ে রেখে বেরিয়ে এল বাইরে। পিয়েখ আর লুইকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত খেলল স্লেড নিয়ে।

রাতে বাবা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আজ বিকেলে কোন অসুবিধায় পড়েছিলে, বাপ?'

'না,' বলল আলমানযো। 'তবে বুঝতে পারলাম, স্টার আর ব্রাইটকে গাড়ি টানা শেখাতে হবে আগে, তারপর বেরনো যাবে ওদের নিয়ে।'

তারপর থেকে গাড়ি টানবার ট্রেনিং শুরু হলো ওদের গোলা-প্রাঙ্গণে।

নয়

দিন বড় হচ্ছে। এই সময়টাতেই পড়ে কনকনে শীত।

কিন্তু পরিষ্কার বোঝা গেল বছর ঘুরছে। দক্ষিণ ও পশ্চিমে ঢালের বরফ একটু যেন নরম হয়ে এল। দুপুরে বাড়ির ছাতের জমাট বরফ গলে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে। এই সময় মেপল্ গাছে রস আসে।

এক সকালে সূর্য ওঠবার আগেই মেপল্ বাগানের উদ্দেশে রওনা হলো বাবা আলমানযোকে নিয়ে। দুজন দুটো কাঠের বাঁক তুলে নিল কাঁধে—বাবারটা বড়, আলমানযোরটা ছোট। বাঁকের দু'মাথায় মূজউডের ছাল দিয়ে পাকানো রশি ঝুলছে, রশির প্রান্তে একটা করে লোহার হুক, প্রতিটি হুকে আটকানো রয়েছে একটা করে বড়সড় কাঠের পাত্র।

প্রতিটা মেপল্ গাছের গায়ে ছোট্ট একটা গর্ত খুঁড়ে কাঠি লাগিয়ে রেখেছে বাবা আগে থেকেই, কাঠির প্রান্তে রয়েছে একটা করে পাত্র। ওই কাঠি বেয়ে সারা রাত ধরে রস গিয়ে জমেছে পাত্রগুলোতে।

একের পর এক পাত্র থেকে নিজের বড় পাত্রে রস ঢেলে নিতে থাকল আলমানযো; বাঁকের দুটো পাত্রই ভর্তি হয়ে গেলে মস্ত এক কড়াইয়ের মধ্যে রস ঢেলে দিয়ে আবার ছুটছে একগাছ থেকে আরেক গাছে, সংগ্রহ করছে রস। বাবাও তাই করছে। বিশাল কড়াইটা ঝুলানো আছে পাশাপাশি দুটো গাছের মোটা ডালে বাঁধা একটা কাঠের আড়া থেকে, নীচে শুকনো কাঠ জ্বেলে গনগনে আগুন তৈরি করে ফেলেছে বাবা ইতোমধ্যেই। জ্বাল দেওয়া হচ্ছে রস।

সারাটা সকাল ছুটোছুটি করে ছোট পাত্র থেকে রস এনে ঢালল আলমানযো লোহার বড় কড়াইয়ে, পিপাসা লাগলে মেপলের মিষ্টি রস খেয়ে নেয় কিছুটা।

দুপুরে বাবার সঙ্গে আগুনের ধারে বসে লাঞ্চ খেয়ে নিল আলমানযো। ফুটন্ত

রস থেকে মিষ্টি গন্ধ আসছে। আগুনের আঁচে আরাম লাগছে, মনেই হচ্ছে না বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

খাওয়া শেষ হতে বাবা থাকল রসের তদারকিতে আর আলমানযো চলল উইন্টারগ্রীন জামের সন্ধানে।

দক্ষিণ ঢালে তুষারের নীচে এ-সময়ে এক রকমের উজ্জ্বল লাল জাম পাওয়া যায় পুরু সবুজ পাতার ফাঁকে। দস্তানা খুলে খালিহাতে তুষার সরায় আলমানযো কোথাও একটু লালের আভাস দেখতে পেলেই, গোছাগোছা জাম তুলে মুখে পোরে। ঠাণ্ডা জামগুলো কচ্‌মচ্‌ করে দাঁতের নীচে, সুগন্ধী রসে ভরে যায় মুখ।

জামা-কাপড়ে তুষার, আঙুলগুলো ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার দশা, কিন্তু শেষ বিকেল পর্যন্ত পাগলের মত তুষার খুঁড়ে চলল আলমানযো।

সূর্যটা হেলে পড়তে আগুন নিভিয়ে ফেলল বাবা তুষারের ঢেলা ছুঁড়ে দিয়ে। প্রথম কিছুক্ষণ ফোঁসফাঁস করল বটে, প্রচুর বাষ্প ছাড়ল, কিন্তু অল্পক্ষণেই ঝিমিয়ে এল আগুন। এবার ফুটন্ত সিরাপ ঢালল বাবা বাঁকের সঙ্গে আটকানো বড় পাত্রে। তারপর যে-যার বাঁক কাঁধে তুলে বাড়ি নিয়ে এল।

রান্নার চুলোর উপর বসানো মায়ের পিতলের মস্ত কেতলিতে ঢেলে দিল ওরা বন থেকে আনা সিরাপ। এবার আলমানযো লেগে পড়ল দৈনন্দিন কাজে, আর বাবা গেল বাকি সিরাপ আনতে।

রাতের খাওয়া শেষ হতে হতে চিনি জমানোর উপযুক্ত হয়ে গেল সিরাপ। মা এবার কয়েকটা সাড়ে চার সেরী দুধের বাটিতে ঢেলে রাখল ওগুলো। সকালে উঠে দেখা যাবে শক্ত হয়ে জমে বাদামী রঙের মস্ত কয়েক চাকা গুড় হয়ে গেছে ওগুলো। মা ওগুলো ভাঁড়ার ঘরের উঁচু তাকে তুলে রাখবে সাজিয়ে।

যতদিন রস ঝরল, ততদিনই রোজ সকালে বাবার সঙ্গে গেল আলমানযো, রস জাল দিয়ে সিরাপ নিয়ে ফিরল সন্ধ্যায়, আর প্রতিদিনই মস্ত কয়েক চাকা গুড় তৈরি করে তাকে সাজিয়ে রাখল মা। আগামী এক বছর চলবার মত গুড় তৈরি হয়ে গেলে শেষদিনের সমস্ত সিরাপ কয়েকটা জগে ঢেলে তলকুঠুরিতে রেখে দেওয়া হলো সারা বছর ব্যবহারের জন্য।

স্কুল থেকে ফিরে আলমানযোর মুখে গন্ধ পেয়ে হাউমাউ করে উঠল অ্যালিস, 'খুব উইন্টারগ্রীন জাম খাওয়া হচ্ছে! এটা ভয়ানক অন্যায়! ছেলেরা রস পাড়বে, মজা করে জাম খাবে, আর আমরা বুঝি খালি লেখাপড়াই করব?'

আলমানযোর কাছ থেকে কথা আদায় করল ও দক্ষিণ ঢালের ট্রাউট রিভারের দিকটায় ওকে না নিয়ে একা যাবে না।

পরের শনিবার দুজনে মিলে প্রায় চষে ফেলল দক্ষিণের ঢাল। তুষারের নীচে লাল চোখে পড়লেই চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওরা, মুঠো মুঠো পুরছে মুখে, একে অপরকে সাধছে, হাসছে প্রাণ খুলে। ফেরবার সময় একগাদা পুরু, সবুজ পাতা নিয়ে এল আলমানযো, অ্যালিস সেগুলো ভরল বড় একটা বোতলে, মা সেই বোতলটা হুইস্কি দিয়ে ভরে রেখে দিল ভাঁড়ার ঘরে–কেক, বিস্কিটের সুগন্ধী হিসেবে ব্যবহার করা যাবে ভবিষ্যতে।

বরফ গলতে শুরু করল। ওক, মেপ্‌ল্‌, বীচের ডাল গা থেকে ঝেড়ে ফেলল

তুষার; সিডার, স্প্রুসও মুক্ত করল নিজেদের; গোলাঘর আর বাড়ির ছাদ থেকে ফোঁটা ফোঁটা বরফ-গলা পানি পড়ে নীচের তুষারে গর্ত খুঁড়ছিল বেশ কদিন ধরে, এবার হুড়মুড় করে ধসে পড়ল সব একই সঙ্গে।

এদিক-ওদিকে জেগে উঠছে ভেজা মাটি। দ্রুত দূর হয়ে যাচ্ছে তুষার ও বরফের চিন্তা। কদিন পর শেষ হয়ে গেল শীতকালীন স্কুল—এসে গেছে বসন্ত।

এক সকালে বাজারের খোঁজ-খবর নিতে গেল বাবা ম্যালোন শহরে। দুপুরের আগেই ফিরে এসে গাড়ি থেকে চেঁচিয়ে খবর দিল, নিউ ইয়র্কের খরিদ্দাররা এসেছে শহরে আলু কিনতে।

রয়াল দৌড়াল দুই ঘোড়াকে ওয়্যাগনে জুততে। অ্যালিস আর আলমানযো ছুটল উডশেড থেকে বাস্কেট আনতে, ওগুলো তলকুঠরির সিঁড়ি দিয়ে নীচে গড়িয়ে দিয়েই ধুপুর-ধাপ্ করে নেমে এল নীচে। শুরু হলো বাস্কেটে আলু বোঝাই করবার প্রতিযোগিতা, কে কার আগে ভরতে পারে! রান্না ঘরের সামনে বাবা ওয়্যাগন নিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে দুই বাস্কেট ভরে ফেলল ওরা। বাবা আর রয়ালও যোগ দিল প্রতিযোগিতায়, ওরা দুজন বাস্কেট নিয়ে গিয়ে ভরছে ওয়্যাগনে, আলমানযো আর অ্যালিস হাত চালাচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব, ওরা ফিরে আসবার আগেই ভরে ফেলছে আরও দুটো বাস্কেট।

আলমানযো শত চেষ্টা করেও অ্যালিসের সঙ্গে পারছে না, মেশিনের মত চলছে অ্যালিসের দুই হাত, শরীরটা একবার পাক খেয়ে ঘুরছে আলুর গাদার দিকে, আবার ফিরছে বাস্কেটের দিকে; স্কার্টটা পুরো এক চক্কর ঘুরবার সুযোগ পাচ্ছে না, তার আগেই অন্যদিকে ফিরছে ও। লম্বা চুল সরাতে গিয়ে গালে দাগ লেগে গেছে। তাই দেখে হেসে উঠল আলমানযো, তারপর অ্যালিসকে হাসতে দেখে বুঝল ওরও একই অবস্থা হয়েছে।

অ্যালিস বলল, 'নিজের চেহারাটা আয়নায় একটু যদি দেখতে, তা হলে আর হাসতে না!'

একের পর এক বাস্কেট ভরে চলল ওরা, এক সেকেন্ডও অপেক্ষা করতে হলো না বাবা আর রয়ালকে। ওয়্যাগন ভরে যেতেই বাবা ছুটল শহরের দিকে।

বাবা ফিরে আসতে আসতে দুপুর গড়িয়ে গেল। বাবাকে চারটে খেয়ে নিতে বলে ওরা তিনজনই এবার ভরে ফেলল ওয়্যাগন, আবার চলে গেল ওয়্যাগন ম্যালোনে। গোলাবাড়ির দৈনন্দিন কাজে সেদিন অ্যালিস সাহায্য করল রয়াল আর আলমানযোকে। সাপার খেতে এল না বাবা, ফিরল রাত করে। জেগে বসেছিল রয়াল, ক্লান্ত ঘোড়াগুলোর দলাইমলাই আর আঁচড়ানোর কাজে সাহায্য করল বাবাকে।

পরদিন খুব ভোরে মোম জ্বেলে সেই আলোয় ওয়্যাগন ভরে ফেলল ওরা, সূর্য ওঠবার আগেই রওনা হয়ে গেল বাবা আলুর চালান নিয়ে। এভাবে চলল সারাটা দিন। তৃতীয় দিন নিউ ইয়র্ক শহরের দিকে রওনা হলো আলু-ভর্তি ট্রেন, বাবার সমস্ত আলু ট্রেনে উঠে গেছে ততক্ষণে।

'প্রতি বুশেল (প্রায় পৌনে এক মন) এক ডলার করে, আমাদের মোট হয়েছে পাঁচশো বুশেল,' রাতে খেতে বসে বলল বাবা মাকে। 'শীতের আগে তোমাকে

বলেছিলাম না, বসন্তকালে দাম বাড়বে অনেক?'

তারমানে পাঁ-চ-শো ডলার জমল আরও ব্যাঙ্কে! বাবার বিচক্ষণতায় গর্বে বুকটা ভরে গেল আলমানযোর। বাবা জানে কী করে ভাল আলু ফলাতে হয়, জানে কখন গুদামে রেখে দিতে হয়, কখন বিক্রি করতে হয়।

'বাহ্, চমৎকার!' খুশি হয়ে বলল মা। একটু পরেই বলল আবার, 'যাক, জায়গাটা খালি হয়েছে যখন, কাল সকাল থেকে লেগে পড়ব আমরা ঘর পরিষ্কারের কাজে।'

ঘর পরিষ্কারের কাজ ভাল লাগে না আলমানযোর। কার্পেটের চারপাশে গাঁথা পেরেকগুলো তুলতে হবে প্রথমে, তারপর বাইরে নিয়ে গিয়ে ঝুলাতে হবে কাপড় শুকানোর রশিতে, তারপর লম্বা লাঠি দিয়ে দমাদম পিটাতে হবে, যতক্ষণ না ধুলো বেরনো বন্ধ হয়।

গোটা বাড়ির সব কিছু নাড়া-চাড়া হবে এই সুযোগে, ঘষে-মেজে চকচকে করা হবে। সমস্ত পর্দা আর কম্বল ধোলাই হবে, পালকের লেপ-তোষক বাইরে বের করে রোদে দেওয়া হবে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দৌড়ের উপর থাকতে হবে আলমানযোকে—এই পানি তুলছে পাম্প করে, ওই ছুটছে কাঠ আনতে। কাঠের মেঝে ঘষা-মাজা হয়ে গেলে পরিষ্কার, শুকনো খড় এনে বিছাতে হবে প্রত্যেকটা ঘরে, তারপর কার্পেট বিছানো হয়ে গেলে টান-টান করে ধরে পেরেক মারতে হবে চারপাশে।

কয়েকদিন কেটে গেল তলকুঠুরিতেও। রয়ালের সঙ্গে তরকারির বাক্সগুলো খালি করল; পচা আপেল, গাজর আর শালগম আলাদা করে ভালগুলো সাজিয়ে রাখল নতুন বাক্সে। তারপর জগ, জার, বাস্কেট যা ছিল সব সরিয়ে রাখা হলো উডশেডে। এবার মেঝে-দেয়াল সব মেজে-ঘষে চুনকাম করা হলো গোটা তলকুঠুরি।

'আয়-হায়!' ওরা কাজ সেরে উঠে আসতেই চেঁচিয়ে উঠল মা, 'কী চেহারা হয়েছে একেকজনের! দেয়ালে এক-আধ ফোঁটা দিয়েছ, না কি সব নিজেদেরই গায়ে?'

শুকিয়ে যেতেই ধবধবে সাদা দেখাল তলকুঠুরি।

একে একে দুধের গামলা, মাখনের টব সব সাজিয়ে রাখা হলো, কোনওটা তাকের উপর, কোনওটা মেঝেতে।

বাইরে ততদিনে লাইল্যাক আর স্নোবলের ঝোপে ফুল এসেছে, সবুজ মাঠ ভায়োলেট আর বাটারকাপে ছেয়ে গেছে, পাখিরা বাসা তৈরি করছে। এবার চাষীরা মন দেবে মাঠের কাজে।

দশ

খুব ভোরেই এখন নাস্তা খেয়ে নেয় ওরা। শিশির ভেজা মাঠের ওপারে সূর্য যখন উঠি-উঠি করে, তার আগেই ঘোড়া দুটো নিয়ে পৌঁছে যায় আলমানযো খেতে। কোল্টগুলো থেকে ওকে দূরে থাকতে বলে দিয়েছে বাবা, কিন্তু শান্তশিষ্ট, বয়স্কা বেস আর বিউটির বেলায় কোনও বারণ নেই। বয়সে ওরা আলমানযোর চেয়ে বড়, সেটা একটা কারণ, তবে আসল কথা ওরা ট্রেনিংপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ। লাঙল টানা, মই দেওয়া সবই জানা আছে ওদের; কখন চলতে হবে, কখন বাঁক নিতে হবে সব মুখস্থ।

গত বছর শীতের আগে জমিতে লাঙল টেনে জৈব সার দিয়ে রাখা হয়েছিল, এখন মই দিতে হবে। গোটা শীতকাল দাঁড়িয়ে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল ওরা, আবার কাজে নামতে পেরে খুশি হয়েছে। পিছন থেকে শুধু রাশ ধরে রাখল আলমানযো, ওরা মইটা টেনে নিয়ে গেল মাঠের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। মইটা ঘুরিয়ে ঠিক জায়গামত বসিয়ে 'গিডাপ' বললেই আবার টেনে নিয়ে গেল অপর প্রান্তে। আশেপাশের মাঠে মই দিচ্ছে আরও অনেক ছেলে। উত্তর দিকে দূরে দেখা যাচ্ছে রূপালি ফিতের মত সেইন্ট লরেন্স নদী। জঙ্গলগুলোকে মনে হচ্ছে যেন সবুজ মেঘ। পাথুরে দেয়ালের উপর বসে লেজ নাচাচ্ছে পাখিরা, ছুটোছুটি করছে কাঠবিড়ালী।

ঘোড়ার পিছনে হাঁটছে আলমানযো, শিস দিচ্ছে। পুরো মাঠটা সোজাসুজি একবার মই দেওয়া হয়ে যেতে আড়াআড়ি ভাবে আবার একবার মই দিল। বড় মাটির চাকাগুলো ভেঙে ছোট হয়ে এসেছে। কাজ চালিয়ে গেল আলমানযো, জমিটাকে একেবারে মসৃণ করে তুলতে হবে। এক সময় শিস থেমে গেল ওর। খিদে লেগেছে। কিন্তু দুপুর আর হয়ই না। মনে হলো কয়েক যুগ পর সূর্যটা উঠে এল মাথার উপর, ছোট হয়ে গেল ওর ছায়াটা। এতক্ষণে কাছে-দূরে বেশ কয়েকটা শিঙা বেজে উঠল। মায়ের টিনের বড় ডিনার হর্নের মধুর আওয়াজও ভেসে এল।

বেস আর বিউটি দুজনই কান খাড়া করল, তারপর দ্রুতপায়ে খেতের উপর দিয়ে কোনাকুনি হেঁটে বাড়ির দিকের প্রান্তে গিয়ে থামল। মইটা খুলে মাঠেই ওটা রেখে দিয়ে ঘোড়াদুটোর গলায় রশি পরাল আলমানযো, তারপর উঠে বসল বিউটির চওড়া পিঠে।

প্রথমে ঘোড়াগুলো নিয়ে পাম্প-হাউসে চলে এল ও, ওদের পানি খাইয়ে স্টলে নিয়ে গিয়ে লাগাম খুলে দানা দিল খেতে। তারপরেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটল বাড়ির দিকে—রীতিমত জ্বলছে পেটের ভিতরটা।

আহ্, মায়ের হাতের রান্না দারুণ; খিদের সময় আরও অনেক বেশি ভাল

লাগে। বার বার উঁচু করে খাবার তুলে দিচ্ছে বাবা ওর প্লেটে, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে গায়েব হয়ে যাচ্ছে সব। তৃপ্তির সঙ্গে পেট পুরে খেল আলমানযো। মুচকি হেসে ওকে আরও দুটো পিঠে দিল মা।

খেয়ে-দেয়ে আবার কাজে ফিরে গেল ও ঘোড়া নিয়ে। সকালের চেয়ে দুপুরটাকে অনেক বেশি দীর্ঘ মনে হলো ওর। সন্ধ্যায় যখন নিত্যদিনের কাজ সারতে গোলাবাড়িতে ফিরল তখন ও একেবারে ক্লান্ত। কোনমতে সাপার খেয়ে টলতে টলতে উপরে উঠেই ধপাস্ করে পড়ল নিজের বিছানায়। আহ্, কী আরাম! চাদরটা বুক পর্যন্ত টেনে তুলবার আগেই তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

মনে হলো, এক মিনিটও হয়নি, মোমবাতি হাতে ডাকছে মা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। এসে গেছে আরেকটা দিন।

বসন্তকালে খেলবার সময় নেই, এমন কী একটু বিশ্রাম পাওয়াও কঠিন। বরফ সরে যেতেই হঠাৎ করেই জীবন্ত হয়ে ওঠে মাটি। আগাছা আর ঘাস, ঝোপ-ঝাড়-লতা যে যেভাবে পারে লেগে যায় মাঠ দখলের প্রতিযোগিতায়। এগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হয় চাষীকে লাঙল, মই আর কোদাল নিয়ে–মাটি প্রস্তুত করেই চট্ করে বুনে দিতে হয় বীজ।

বীরের মত যুদ্ধ করছে আলমানযো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। সারাদিন কাজ, সারারাত ঘুম, উঠেই আবার কাজ। আলু বুনবার জন্য মাঠ তৈরি হয়ে যেতেই তলকুঠুরিতে রাখা বীজ-আলু টুকরো করল ও রয়ালের সঙ্গে, প্রত্যেক টুকরোয় দু-তিনটে করে চোখ যেন থাকে সেদিকে লক্ষ রাখল।

ওদিকে বাবা মাঠে দাগ দেওয়ার কাজে ব্যস্ত। লম্বা একটা কাঠের গুঁড়ির গায়ে গর্ত খুঁড়ে সাড়ে তিনফুট দূরে দূরে ঢোকানো হয়েছে চোখা কাঠের গোঁজ। জমির এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা ঘোড়া কাঠের গুঁড়িটাকে, গোঁজ গাঁথা থাকায় কয়েকটা সরু খাল তৈরি হচ্ছে জমিতে। গোটা জমিতে লম্বালম্বি দাগ টানা হয়ে গেলে আবার টানা হলো আড়াআড়ি ভাবে–ফলে ছোটছোট অসংখ্য চৌকোনা ঘর তৈরি হলো জমিতে। এবার শুরু হলো আলু বোনা।

বাবা আর রয়াল কোদাল নিয়ে আসছে পিছু পিছু, অ্যালিস আর আলমানযো দুটো বালতিতে আলুর টুকরো নিয়ে চলেছে আগে আগে। যেখানেই একটা দাগের উপর দিয়ে আরেকটা দাগ গেছে, সেখানেই একটা করে আলুর টুকরো ফেলছে অ্যালিস আর আলমানযো, বাবা আর রয়াল ওর উপর ধুলো-মাটি ফেলে কোদাল দিয়ে চেপে বসিয়ে দিচ্ছে। কাজটা মজার, সবাই খোশমেজাজে গল্প করতে করতে এগোচ্ছে, মাটির টাটকা সুগন্ধ আসছে নাকে, বাতাসে উড়ছে উচ্ছল অ্যালিসের চুল। ছোট দুজন চেষ্টা করছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আলুর টুকরো ফেলে সারির শেষ মাথায় পৌঁছে যেতে; কারণ এক মিনিট সময় পেলেই এক ছুটে সীমানা প্রাচীরের গায়ে পাখির বাসা খোঁজা যাবে, কিংবা গিরগিটিকে তাড়া করা যাবে। কিন্তু তেমন একটা পেছনে ফেলতে পারছে ওরা বাবা কিংবা রয়ালকে। গমগমে কণ্ঠে হাঁক ছাড়ছে বাবা, 'চলো, চলো, চলো–আগে বাড়ো, বাপ! আগে বাড়ো!'

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনদিন কাজ করে শেষ করল ওরা আলু বোনা।

এরপর শুরু হলো শস্য বুনবার কাজ। সাদা রুটির জন্য গম, তারপর যব, জই, মটর বোনা হলো আলাদা আলাদা জমিতে। বাবা বীজ ছিটিয়ে যায়, আলমানযো বেস্ আর বিউটিকে নিয়ে পিছনে আসে মই দিতে দিতে–ফলে প্রতিটি দানা চলে যায় মাটির নীচে।

শস্য বোনা শেষ হলে আলমানযো আর অ্যালিস বোনে গাজর। লাল রঙের ছোট্ট গোল দানা ঝোলায় নিয়ে ওরা বাবার কেটে দেওয়া লম্বা দাগ ধরে বুনে যায় গাজরের বীজ। এবার আর আড়াআড়ি কোন দাগ নেই, সারা মাঠ জুড়ে আঠারো ইঞ্চি দূরে দূরে শুধু লম্বা দাগ। সেই দাগের দুপাশে দুই পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা দুজন গাজরের বীচি বুনতে বুনতে–একটা করে বীজ ফেলেই পা দিয়ে ধুলো-মাটি টেনে ঢেকে দেয় ওটা, তারপর একটা চাপ দিয়ে এগিয়ে যায় এক কদম।

এরপর এল ভুট্টা বুনবার সময়। খেত তৈরি হয়ে যেতে আলু খেতের মত করে দাগ টানল বাবা, তারপর সবাই মিলে বুনল ভুট্টার বীজ। প্রত্যেকের কোমরে বাঁধা বীজ ভর্তি থলে, হাতে কোদাল। যেখানেই দুটো রেখা এক হয়েছে, সেখানেই কোদাল দিয়ে খানিকটা মাটি সরিয়ে দুটো করে দানা ফেলছে গর্তে, তারপর মাটি দিয়ে গর্ত বুজিয়ে কোদালের দুটো চাপড় দিয়ে সমান করে দিচ্ছে উঁচু হয়ে থাকা মাটি।

আগে কোনদিন ভুট্টা বোনেনি আলমানযো, তাই বাবা আর রয়ালের চেয়ে পিছনে পড়ে যাচ্ছে। ওর সারির শেষ কয়েকটা দানা বুনে দিচ্ছে ওদের একজন, তারপর আবার শুরু করছে ওরা পরের তিন সারির কাজ।

এগারো

কদিন আগে টিনের জিনিসপত্র বিক্রি করতে এসেছিল নিক ব্রাউন তার এক্কাগাড়ি নিয়ে। শহরের অনেক খবর পাওয়া গেছে তার কাছে। তারমধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর হচ্ছে নিউ ইয়র্ক থেকে ঘোড়া কিনতে এসেছে লোকজন, কাছেপিঠেই আছে ওরা। ভাল দামে কিনছে ঘোড়া।

যে-কোনও সময় এসে পড়তে পারে ওরা, তাই চার বছর বয়সী কোল্ট দুটোর বিশেষ যত্ন নিতে আরম্ভ করল বাবা–নিয়মিত দলাইমলাই চলছে, গা আঁচড়ে দেওয়া হচ্ছে। আলমানযোর আগ্রহের আতিশয্য দেখে ওকে এসব কাজে সঙ্গে নিল বাবা, তবে বলা থাকল, স্টলে ওর একা ঢোকা চলবে না। মনের আনন্দে ওদেরকে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ডলে ঝকঝকে তকতকে করে তুলল আলমানযো, চিরুনি বুলিয়ে লেজ ও কেশর পরিপাটি করল, একটা ব্রাশ দিয়ে তেল মাখাল ওদের খুরে।

হঠাৎ নড়ে উঠলে ওরা ভয় পেতে পারে, তাই সবই করল আলমানযো

সাবধানে, ধীরেসুস্থে; ওদের যত্ন নেওয়ার সময় শান্ত, নিচু গলায় কথা বলল ওদের সঙ্গে। কোল্ট দুটো এখন ঠোঁট দিয়ে ওর আস্তিন চেপে ধরে মৃদু টান দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে, পকেটে গুঁতো দিয়ে জানতে চায় আপেল এনেছে কি না। ওকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে ওরা, সেটা বোঝা যায় আলমানযোর আদরে যখন ঝিকমিক করে ওঠে ওদের চোখ।

আলমানযোর কাছে মনে হয় ঘোড়ার মত এত সুন্দর, এত আকর্ষণীয়, এত চমৎকার আর কিছুই নেই সারা পৃথিবীতে। যখন ভাবে, ওর একান্ত নিজস্ব করে একটা কোল্ট পেতে এখনও অনেক, অনেক বছর দেরি আছে, তখন কেমন যেন ধৈর্যহারা হয়ে ওঠে ও, ফাঁপর লাগে বুকের ভিতর।

এক বিকেলে ঘোড়ার খরিদ্দার এল গোলা-প্রাঙ্গণে। লোকটাকে ওরা কখনও দেখেনি আগে। শহুরে লোক। শহরের মেশিনে-তৈরি কাপড়ের পোশাক, ছোট্ট একটা লাল চাবুক দিয়ে নিজের পালিশ করা বুটে টোকা দিচ্ছে। চোখ দুটো নাকের দুপাশে খুব কাছাকাছি বসানো, গোঁফ জোড়া মোম দিয়ে পাকানো।

কোল্ট দুটোকে বের করে আনল বাবা। একেবারে একই চেহারা দুটোর, সমান উঁচু, চমৎকার স্বাস্থ্য, বাদামী গায়ের রঙে কোথাও কম-বেশি নেই, কপালে একই রকম সাদা তারা। ঘাড় বাঁকিয়ে চমৎকার ভঙ্গিতে হেঁটে বেরিয়ে এল।

'মে মাসে চার বছর হবে,' বলল বাবা। 'কোথাও কোনও খুঁত পাবেন না। শরীর স্বাস্থ্য তো দেখতেই পাচ্ছেন। সব রকম শেখানো হয়েছে, একাও টানতে পারে গাড়ি, আবার একসাথেও। যেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা, তেমনি শান্ত। মহিলাও চালাতে পারবে।'

খরিদ্দার কোল্টদুটোর পা ধরে দেখল, মুখ হাঁ করিয়ে দাঁত পরীক্ষা করল, বাবা হাসিমুখে দেখল ওকে—কারণ কিছুই লুকাবার নেই বাবার। লোকটা সরে দাঁড়ালে একটা লম্বা রশিতে বেঁধে এক এক করে কোল্ট দুটোকে নিজেকে ঘিরে প্রথমে হাঁটাল, তারপর দৌড় করিয়ে দেখাল। মুখে বলল, 'ভাল করে দেখুন কোনও দোষ পাওয়া যায় কি না।'

কোনও দোষ ধরতে পারল না ক্রেতা। মাথা ঝাঁকাল লোকটা। বাবাও আর কিছু না বলে চুপ করে থাকল। বেশ কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে দাম বলল লোকটা: প্রতিটা একশো পঁচাত্তর ডলার।

মাথা নাড়ল বাবা। দুইশো পঁচিশের কমে দেবে না। আলমানযো জানে, একটু বাড়িয়ে বলছে বাবা, আসলে ছেড়ে দেবে দুশো করে পেলেই।

এবার কোল্ট দুটোকে গাড়িতে জুতে উঠে বসল, খরিদ্দারকে নিল পাশের সীটে, তারপর বেরিয়ে গেল রাস্তায়। মাথা উঁচু করে দৌড়াচ্ছে ও দুটো, লেজ আর কেশর উড়ছে হাওয়ায়, দারুণ দেখাচ্ছে।

আলমানযো দৈনন্দিন কাজ ফেলে দাঁড়িয়ে থাকল দরদাম কীভাবে এগোয় দেখবে বলে।

গাড়ি যখন ফিরে এল তখনও দামে বনেনি ওদের, বাবা নিজের দাড়ি টানছে, আর লোকটা চোখা করছে গোঁফের প্রান্ত। লোকটা বাবাকে বোঝাবার চেষ্টা করল:

কোল্টগুলোকে নিউ ইয়র্কে নিয়ে যাওয়ায় খরচা আছে, তা ছাড়া বাজার এখন মন্দা, দু'পয়সা লাভ না হলে কারবার কীসের, প্রথমেই অনেক বেশি বলে ফেলেছে সে, একশো পঁচাত্তরের উপর আর কিছু দেওয়ার উপায় নেই।

বাবা বলল, 'বেশ তো, মাঝামাঝি একটা দামে রফা হতে পারে। দুশো ডলার। ব্যস, এর নীচে আমি বেচব না।'

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে মাথা নাড়ল লোকটা, 'নাহ্, তা হলে আর হচ্ছে না। এত দামে...'

'ঠিক আছে,' বলল বাবা, 'মনে কষ্ট নেবেন না। কথা আমাদের শেষ, তবে আপনি আমাদের সঙ্গে সাপার খেয়ে গেলে আমরা খুশি হব।'

কোল্ট দুটোকে গাড়ি থেকে খুলছে বাবা, খরিদ্দার বলল, 'সারানাক-এ এর চেয়ে ভাল ঘোড়া বিক্রি হচ্ছে একশো পঁচাত্তর ডলারে।'

কোনও জবাব না দিয়ে কোল্ট দুটোকে নিয়ে বাবা যখন ওদের স্টলের দিকে এগোচ্ছে, তখন তাড়াহুড়ো করে বলল লোকটা, 'ঠিক আছে, দু'শোই দেব। ঠকা হয়ে যাবে আমার, তবু, ধরুন, এই যে বায়না।' পকেট থেকে মোটাসোটা মানিব্যাগ বের করে দুশো ডলার এগিয়ে দিল বাবার দিকে। 'কাল ওদুটোকে শহরে পৌঁছে দিয়ে বাকি টাকা নিয়ে আসবেন।'

সাপারে থাকতে পারছে না বলে দুঃখ প্রকাশ করে চলে গেল লোকটা ওর ঘোড়ায় চেপে। বাবা রান্নাঘরে গিয়ে মায়ের হাতে দিল টাকাগুলো। চোখ কপালে উঠল মায়ের, 'বলো কী! এত টাকা বাড়িতে থাকবে সারারাত?'

'এখন আর শহরে গিয়ে ব্যাঙ্কে জমা দেয়ার সময় নেই,' বলল বাবা। 'বিপদের সম্ভাবনা তো দেখি না—আমরা ছাড়া আর কেউ জানে না টাকার কথা।'

'আয়-হায়! গেল আমার ঘুম! সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারব না আজ!'

'ঈশ্বর আছেন। উনিই দেখবেন। তুমি ভেবো না,' বলল বাবা।

এ-পর্যন্ত দেখেই দুধের বালতি নিয়ে ছুটল আলমানযো গোলাবাড়ির দিকে। ঠিক সময় মত সকাল-বিকেল দুধ না দোয়ালে গরুর দুধ কমে যায়। দুধ দুইয়ে, স্টল পরিষ্কার করে, সবক'টা পশুকে খাবার দিয়ে ঘরে ফিরতে ফিরতে আজ রাত আটটা বেজে গেল। ওর জন্য খাবার গরম রেখেছে মা।

টাকাটার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা থাকায় সাপার খাওয়াটা আজ জমল না। একা মা নয়, সবারই মনটা ভার হয়ে আছে। বলা তো যায় না, খারাপ কিছু ঘটে যেতে কতক্ষণ? প্রথমে ভাঁড়ার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল মা টাকাগুলো, কিছুক্ষণ পরেই ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে রেখেছে কাপড় রাখবার ক্লজিটে। তার কিছুক্ষণ পরেই শোনা গেল মা বিড়বিড় করে বলছে, 'মনে হয় না, কেউ ভাবতে পারবে যে ক্লজিটের মধ্যে কাপড়ের ভাঁজে টাকাগুলো—আরে! কীসের শব্দ!'

লাফিয়ে উঠল ঘরের সবাই, দম আটকে কান পেতে শুনছে।

'কে যেন বাড়ির চারপাশে ঘুরছে!' ফিসফিস করে বলল মা।

জানালার বাইরে ঘন অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। 'নাহ্! কিছু না!' বলল বাবা চাপা গলায়।

'আমি বলছি, আমি শব্দ শুনেছি!'

'আমি শুনিনি,' বলল বাবা।

'রয়াল,' বলল মা, 'দেখো তো কে।'

রান্নাঘরের দরজা খুলে বাইরে তাকাল রয়াল। একটু পরে বলল, 'কিছু না, একটা বাজে কুত্তা।'

'ভাগাও ওটাকে!' বলল মা। রয়াল বাইরে গিয়ে ওটাকে তাড়িয়ে দিয়ে এল।

কুকুরের কথা শুনে কেমন যেন করে উঠল আলমানযোর মনটা। ওর খুব শখ কুকুর পোষে। কিন্তু বাবা রাজি হয় না। ছোটগুলো পা দিয়ে আঁচড়ে বাগান নষ্ট করে, মুরগিকে তাড়া করে, ডিম খেয়ে নেয়; আর বড় কুকুর রেগে গেলে ভেড়া মেরে ফেলতে পারে। তা ছাড়া মা-ও বলে: অনেক জানোয়ার আছে এখানে, নোংরা একটা কুকুর নাই থাকল।

পা ধুচ্ছে আলমানযো, এবার শুতে যাবে, এমন সময় পিছনের আঙিনায় খচ্‌মচ্ আওয়াজ হলো।

বড় হয়ে গেল মায়ের চোখ।

'কিছু না, ওই কুকুরটাই,' বলে দরজা খুলল রয়াল। প্রথমে কিছুই দেখা গেল না, ফলে আরও বড় হলো মায়ের চোখ। তারপর ঘরের সবাই দেখতে পেল ওটাকে। মস্ত বড় একটা কুকুর, কিন্তু শুকিয়ে হাড় জিরজিরে হয়ে গেছে, লোমের নীচে পাঁজর দেখা যাচ্ছে। কুকড়ে সরে গেল ওটা অন্ধকারে।

'আহা রে, বেচারা!' বলল অ্যালিস, 'মা, ওকে একটু খেতে দিই?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, দাও,' বলল মা। 'কাল সকালে উঠে ওটাকে তাড়িয়ে দিয়ো, রয়াল।'

একটা টিনের থালায় কিছু খাবার নিয়ে দরজার কাছে মাটিতে নামিয়ে রাখল অ্যালিস। কিন্তু ভয়ে কাছে আসছে না কুকুরটা। তবে আলমানযো যেই দরজাট লাগিয়ে দিল অমনি শোনা গেল চিবানোর শব্দ। খাচ্ছে। দুই-দুইবার পরীক্ষা করে দেখল মা সব দরজায় ঠিকমত তালা দেওয়া হয়েছে কি না।

মোমবাতি নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই অন্ধকার হয়ে গেল ঘরটা, মনে হলো ডাইনিং রুমের জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে গাঢ় অন্ধকার। খাবার ঘরের দুটো দরজাতেই তালা দিল মা, সব সময় তালা দেওয়াই থাকে, তবু একবার বৈঠকখানার দরজাটা পরীক্ষা করে এল।

বিছানায় শুয়ে জেগে থাকল আলমানযো অনেকক্ষণ, কান খাড়া করে শুনবার চেষ্টা করছে কোথাও কোন অস্বাভাবিক শব্দ হয় কি না। এক সময় নিজের অজান্তেই ঢলে পড়ল ঘুমে। সকালের আগে জানতে পারল না কী ঘটে গেছে রাতে।

শুতে যাওয়ার আগে টাকাগুলো বাবার মোজার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিল মা, কিন্তু মিনিট দশেকের মধ্যেই বিছানা ছাড়ল আবার—ওগুলো এনে রাখল বালিশের নীচে। সারারাত ঘুমাতে পারবে না ভেবেছিল মা, কিন্তু কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না, হঠাৎ করেই অনেক রাতে ভেঙে গেল ঘুম, খাড়া হয়ে উঠে বসল বিছানায়। বাবা তখন ঘুমে অসাড়।

চাঁদের আলোয় আঙিনার লাইলাক ঝোপ দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। চারদিক চুপচাপ। নীচের ঘড়িতে রাত এগারোটার ঘণ্টা পড়ল। পরমুহূর্তে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল মা'র: চাপা, হিংস্র গর্জন ভেসে এল আঙিনা থেকে।

বিছানা থেকে নেমে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল মা। নীচে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কুকুরটা, গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেছে, দাঁত বের করে শাসাচ্ছে কাকে যেন। গাছের নীচে অন্ধকার–সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে কুকুরটা। জানালা দিয়ে দেখবার চেষ্টা করল মা, কিন্তু দেখা গেল না কিছুই, শুধু নীচ থেকে ভেসে আসছে কুকুরটার গরগর আওয়াজ।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল মা। মাঝরাতের ঘণ্টা পড়ল, আরও অনেকক্ষণ পর একটা বাজল। বেড়ার ধার ঘেঁষে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত টহল দিচ্ছে কুকুরটা, মাঝে মাঝে চাপা গলায় ধমক দিচ্ছে। অনেকক্ষণ পর শুয়ে পড়ল ওটা, কিন্তু মাথাটা উঁচু হয়ে আছে, কান খাড়া করে শুনবার চেষ্টা করছে কিছু। আস্তে করে বিছানায় উঠে পড়ল মা।

সকালে দেখা গেল চলে গেছে কুকুরটা, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেল না কোথাও। কিন্তু ওর পায়ের ছাপ রয়ে গেছে বেড়ার এপাশে। ওপাশে গাছের নীচে দু'জোড়া বুটের চিহ্ন পেল বাবা।

আর দেরি না করে নাস্তার আগেই গাড়িতে ঘোড়া জুতে ম্যালোনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল বাবা, কোল্ট দুটোকে বেঁধে নিল গাড়ির পেছনে। প্রথমে ব্যাঙ্কে দুশো ডলার জমা দিয়ে ঘোড়ার খরিদ্দারের কাছে পৌঁছে দিল কোল্ট দুটো। বকেয়া দুশো ডলারও ব্যাঙ্কে রেখে ফিরে এল।

বাড়ি ফিরে মা'কে বলল বাবা, 'ঠিকই বলেছ তুমি । গতরাতে ডাকাতিই হতে যাচ্ছিল এখানে।'

এক সপ্তাহ আগে ম্যালোনের কাছাকাছি এক গেরস্ত নাকি এক জোড়া ঘোড়া বিক্রি করে টাকাগুলো ঘরে রেখেছিল। ওই রাতেই ডাকাত পড়েছিল ওর বাড়িতে। ওর বউ-ছেলেমেয়েকে বেঁধে রেখে ওকে পিটিয়ে আধমরা করে জেনে নিয়েছে কোথায় রাখা হয়েছে টাকাগুলো। শেরিফ খুঁজছে এখন ওদের।

'ওই খরিদ্দারটার হাত রয়েছে এতে, আমার বিশ্বাস,' বলল বাবা। 'নইলে আর তো কারও জানার কথা নয় যে টাকা ছিল আমাদের বাড়িতে। কিন্তু এটা প্রমাণ করা যাবে না। খোঁজ নিয়ে জানলাম লোকটা কাল সারারাত হোটেলেই ছিল।'

মায়ের ধারণা, ওদের পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুরটাকে পাঠানো হয়েছিল ঈশ্বরের তরফ থেকে। আলমানযোর ধারণা, অ্যালিস খেতে দিয়েছিল বলেই থেকে গিয়েছিল ওটা।

'ওকে পাঠিয়ে ঈশ্বর আমাদের হয়তো পরীক্ষা করলেন,' বলল মা। 'আমরা কুকুরটাকে দয়া দেখানোয় আমরাও কৃপা পেলাম ঈশ্বরের।'

কুকুরটাকে আর কোনদিন দেখা গেল না ধারে কাছে। খুব সম্ভব হারিয়ে গিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছিল ওটা, খেতে না পেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল; অ্যালিসের দেওয়া খাবার খেয়ে শক্তি ফিরে পেয়ে চলে গেছে বাড়ির পথে।

বারো

সবুজ ঘাসে ছেয়ে গেছে প্রান্তর, গরম পড়তে শুরু করেছে–এটাই ভেড়ার গা থেকে উল ছেঁটে নেওয়ার উপযুক্ত সময়।

প্রথমে আলমানযো, পিয়েখ আর লুই ভেড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে এল নদীর ঘাটে, তারপর একটা একটা করে এগিয়ে দিল সামনে। বাবা আর লেযি জন ওটাকে ধরে পানির ধারে নিয়ে যেতেই আরেকটা ভেড়াকে ঠেলে দিল ওরা রয়াল আর ফ্রেঞ্চ জোর দিকে। ব্যা-ব্যা মরণ চিৎকার দিচ্ছে ওগুলো, হাত-পা ছুঁড়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করছে! কিন্তু ওরা ওদের আপত্তি গ্রাহ্য না করে প্রথমে আচ্ছামত সাবান মাখিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে গভীর পানিতে। নাকটা পানির উপরে রাখবার জন্য প্রাণপণে সাঁতার কাটছে ভেড়াগুলো, এদিকে ঘষে-মেজে ওগুলোর গা থেকে গত এক বছরের যত ময়লা বের করে দিচ্ছে বাবা আর লেযি জন কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে। পরিষ্কার করা হয়ে গেলেই ওদের এক-চুবান দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, সাঁতার কেটে পারে গিয়ে উঠছে ওরা; গা ঝাড়া দিয়ে পানি ঝরাচ্ছে চারপাশে। অল্পক্ষণেই রোদ লেগে শুকিয়ে ঝরঝরে হয়ে ধবধবে সাদা দেখাচ্ছে ওদের।

ভেড়া গোসল করানো মজার কাজ। গল্পগুজব, হাসি-তামাশার মধ্য দিয়ে কাজটা শেষ হলো। গা শুকিয়ে যেতেই ভেড়াগুলো নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খেতে শুরু করল–মনে হচ্ছে মাঠময় থোকা থোকা সাদা ফুল ফুটেছে।

পরদিন জন এল খুব সকালে। আলমানযো ভেড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে এল মাঠ থেকে। দক্ষিণ-গোলাঘরে ওদের উল ছাঁটা হবে একটা পাটাতনের উপর।

পাটাতনের উপর ঠেসে ধরে বাবা আর লেযি জন দুজন দুটো ভেড়ার লোম কাটছে। পুরু লোম একেবারে গোড়া থেকে ছাঁটবার ফলে মোটাসোটা ভেড়া দুটোকে মনে হচ্ছে গোলাপী চামড়া সর্বস্ব ছোট্ট প্রাণী। ছেড়ে দিতেই ব্যা-ব্যা ডাক ছেড়ে পালাচ্ছে ওগুলো, ততক্ষণে আরও দুটো ধরে শুইয়ে ফেলেছে বাবা আর জন পাটাতনের উপর।

রয়ালের কাজ হচ্ছে লোমগুলো গোল করে গুটিয়ে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা, আর আলমানযোর কাজ এক দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ওগুলো মাচায় তুলে রেখে আসা। দৌড়ে উপরে উঠছে আলমানযো, দৌড়ে নামছে, কিন্তু প্রতিবারই ফিরে এসে দেখছে আরেক বস্তা উল অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

এত ভারী ওগুলো যে একটার বেশি নেওয়া ওর পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়। ছুটোছুটি করে কাজ করছে ও, কিন্তু অন্যদের চেয়ে এগোতে পারছে না। তার পরেও, যখন হঠাৎ চোখে পড়ল গোলাবাড়ির একটা বেড়াল ইঁদুর ধরে মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে, তখন সামলাতে পারল না কৌতূহল, ছুটল ওর পিছনে।

নিশ্চয়ই বাচ্চা দিয়েছে, ইঁদুর নিয়ে যাচ্ছে বাচ্চাদের খাওয়াতে। ঠিকই। গোলাঘরের এক কোণে বেশ কিছু খড় জড়ো করে তার উপর শুইয়ে রেখেছে ছানাগুলোকে। ওগুলোকে ঘিরে শুয়ে পড়ল, গলায় গরগর আওয়াজ তুলে আদর জানাচ্ছে বাচ্চাদের, চোখের কালো দাগদুটো চওড়া হলো, আবার সরু হলো, আবার চওড়া হলো। নরম গলায় মিউ-মিউ করে উঠল ছানাগুলো, থাবার নখগুলো সাদা, চোখ বন্ধ।

ফিরে এসেই বকা খেল বাবার কাছে। ছ'টা বস্তা তৈরি হয়ে আছে ওর অপেক্ষায়। 'গেছিলে কোথায়? দেখো, আবার যেন পিছিয়ে না পড়ো!'

'আচ্ছা,' বলল আলমানযো। তাড়াহুড়ো করে তুলে নিল একটা গাঁটরি, কিন্তু দেখল, হাসছে জন।

'ও পারবে না,' বলল লেযি জন, 'আমাদের সঙ্গে ও পারবে না!'

বাবাও হাসল এই কথায়। বলল, 'ঠিক বলেছ, জন। যতই চেষ্টা করুক, ও পারবে না আমাদের সঙ্গে।'

দাঁড়াও, দেখাচ্ছি–মনে মনে ভাবল আলমানযো। এরপর এমনই তাড়াহুড়ো করল যে দুপুরের আগেই জমে যাওয়া সব বস্তা রেখে এল উপরে, তারপর একসময় নীচে নেমে দেখল এখনও বস্তা বাঁধছে রয়াল।

'দেখলে?' বলল আলমানযো, 'তোমাদের সমানই আছি, পেছনে ফেলতে পারোনি আমাকে!'

'আরে, না!' বলল জন, 'অসম্ভব। পারবে না। আমরা তোমাকে হারাবই হারাব। দেখো না, তোমার আগেই শেষ করব আমরা।'

সবাই হাসল এই কথায়। আলমানযো বুঝতে পারল না এত মজা কেন পাচ্ছে ওরা।

দুপুরের খাওয়া তৈরি হয়ে গেছে, বেজে উঠল ডিনার-হর্ন। বাবা আর জন হাত চালিয়ে দুটো ভেড়ার লোম ছেঁটে দিয়েই চলে গেল বাড়ির দিকে। রয়াল ওগুলো বেঁধে দিয়ে চলে গেল। এইবার আলমানযো বুঝে ফেলল এতক্ষণ ওকে নিয়ে হাসছিল কেন বড়রা। বস্তাটা উপরে নিয়ে গিয়ে রাখবার পর ও যেতে পারবে খেতে। যতই তাড়াহুড়ো করুক, সবার পরে শেষ হবে ওর কাজ।

'নাহ্, এভাবে তো ঠকে যাওয়া যায় না,' ভাবল আলমানযো। একটু ভাবতেই বুদ্ধি এসে গেল মাথায়।

একটা ভেড়ার গলায় রশি পরিয়ে টেনে এক ধাপ এক ধাপ করে সিঁড়ি ভেঙে উপরে তুলে নিয়ে গেল। ওখানেই ওটাকে বেঁধে রেখে বেশ কিছু খড় এনে দিল, যাতে না চেঁচায়। তারপর খুশি মনে চলে গেল খেতে।

সারাটা বিকেল লেযি জন আর রয়াল ওকে তাগাদা দিল, জল্‌দি করতে বলল, নইলে ওরা হারিয়ে দেবে ওকে। না বোঝার ভান করে ও বলেই চলল, 'পারবে না, আমাকে পেছনে ফেলতে পারবে না।'

শুনে হেসে খুন হয়ে গেল ওরা।

রয়ালের বাঁধা হলেই বস্তাটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে একছুটে রেখে আসছে ও উপরে। ওর এই ব্যস্ততা দেখে মুখ টিপে হাসছে সবাই, বারবার বলছে এক কথা,

'তুমি আমাদের হারাতে পারবে না, আমরাই আগে শেষ করব কাজ।'

সন্ধ্যার দিকে শেষ দুটো ভেড়ার লোম কে আগে ছাঁটতে পারে তাই নিয়ে ছোটখাট প্রতিযোগিতা হয়ে গেল বাবা আর জনের মধ্যে। জিতল বাবাই। শেষ বস্তার জন্য ফিরে এল আলমানযো। রয়াল ওটা বেঁধে বলল, 'আমাদের কাজ শেষ! আলমানযো, দেখো, আমরা তোমাকে হারিয়ে দিলাম!' কথাটা বলেই হাসিতে ফেটে পড়ল রয়াল আর জন, বাবাও যোগ দিল সে হাসিতে।

আলমানযো বলল, 'এই বস্তা রেখে এলেই আমার কাজ শেষ হবে তো? নাকি আরও আছে?'

জন বলল, 'না, আর নেই, এটাই শেষ বস্তা।'

'তা হলে তোমরা হেরে গেলে,' হাসিমুখে বলল আলমানযো। 'আরও একটা ভেড়া বাকি রয়ে গেছে তোমাদের। ওটাকে ওপরে বেঁধে রেখেছি আমি।'

হাসি থেমে গেল ওদের। আলমানযো শেষ বস্তাটা রেখে ভেড়ার বাঁধন খুলে দিতেই ব্যা করে বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল ভেড়াটা। ওটাকে নীচে নামিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল ও।

ওর দুষ্টবুদ্ধি দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল বাবা। বলল, 'কী হলো, জন? সারাটা দিন তো খুব হাসলে ওকে নিয়ে, এবার?'

তেরো

শেষ বসন্তে হঠাৎ বেশ ঠাণ্ডা পড়ল। দুপুরের রোদও কেমন যেন ঠাণ্ডা। শিম, মটরশুঁটি, গাজর, ভুট্টা–সবকিছুর বাড় বন্ধ হয়ে গেছে, যেন অপেক্ষা করছে গরমের। আবহাওয়ার এই অবস্থা দেখে বাবা উদ্বিগ্ন। অবশ্য আবহাওয়া এরকম থাকল না বেশিদিন।

প্রথম বসন্তের কাজের চাপ কমে যেতেই আবার স্কুলে যেতে হচ্ছে আলমানযোকে। বসন্তকালীন টার্মে শুধু ছোট ছেলেমেয়েরা ক্লাস করে। আলমানযোর বড় দুঃখ, কিছুতেই তাড়াতাড়ি বড় হতে পারছে না; আর একটু বড় হলেই আর মজার মজার কাজ ফেলে স্কুলে যেতে হত না।

মে মাসে ভুট্টা চারার ফাঁকে ফাঁকে কুমড়ো-বীচি পুঁতে দিল আলমানযো। তারপর গাজর খেতের আগাছা দূর করতে নিড়ানি দিল। তারপর বেশি ঘন হয়ে জন্মানো গাজর-চারা টেনে তুলে ফেলল–যাতে প্রতিটা গাজর অন্ততপক্ষে দুই ইঞ্চি দূরে দূরে থাকে।

বসন্তকালীন স্কুলের শেষ তিনটে দিন ঠিকমতই গেল সে স্কুলে, তারপর গ্রীষ্মকালের কাজকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুই সারি ভুট্টা চারার মাঝখান দিয়ে আবার লাঙল টানল বাবা, রয়াল আর আলমানযো আগাছা সাফ করল, একটা চারার গোড়াতেও আর আগাছা রইল না। নিজহাতে দুই একর ভুট্টা-খেত আর দুই একর

আলু-খেত একেবারে পরিষ্কার করে ফেলল আলমানযো কয়েকদিনের নিরলস পরিশ্রমে।

এর পরপরই এল স্ট্রবরি সংগ্রহের সময়। এবার দেরি হয়ে গেছে স্ট্রবরি পাকতে, কারণ প্রথম মুকুল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ঠাণ্ডায় বরফ জমে যাওয়ায়। সবুজ পাতার আড়ালে থোকা-থোকা ঝুলে আছে সুগন্ধি, মিষ্টি জাম। ঝুড়িতে তো নিচ্ছেই, একই সঙ্গে সমানে মুখ চালিয়ে যাচ্ছে আলমানযো। মাঝে মাঝে উইন্টারগ্রীনের সবুজ ডাল ভেঙে চিবাচ্ছে। কাঠবিড়ালী দেখলেই ঢিল মারছে, ইচ্ছে হলে খালের তীরে ঝুড়ি রেখে হাঁটু পানিতে নেমে মাছের পিছনে তাড়া করছে। বাড়ি ফিরল ঝুড়িভর্তি ফল নিয়ে।

রাতে খাবার টেবিলে আসছে দুধের সরের সঙ্গে স্ট্রবরি, পরদিন মা তৈরি করবে স্ট্রবরির আচার আর মোরব্বা।

'ভুট্টাগুলো কেন যে বাড়ছে না!' আপন মনে বিড়বিড় করে বাবা, খুব চিন্তিত। আবার একবার লাঙল দিল খেতে, রয়াল আর আলমানযো নিড়ানি দিল, কিন্তু চারাগুলো যেমন ছিল তেমনি থাকল, বাড়ার লক্ষণ নেই। বাবা বিড়বিড় করল, 'এমন তো দেখিনি কোনদিন!' জুলাই এসে গেছে, কিন্তু চারাগুলো মাত্র চার ইঞ্চি লম্বা হয়েছে। 'মনে হচ্ছে, সামনে বিপদ দেখে বাড়তে সাহস পাচ্ছে না।'

দেখতে দেখতে স্বাধীনতা দিবস এসে গেল। আগামীকাল ওরা সবাই যাবে ম্যালোনে। ব্যান্ড বাজবে, বক্তৃতা হবে, পিতলের কামান দাগা হবে। সন্ধ্যায় গোসল করতে হলো আলমানযোকে, যদিও দিনটা শনিবার নয়।

খুব ঠাণ্ডা পড়েছে হঠাৎ করে। রাতে খাওয়ার পর আবার গোলাবাড়িতে গিয়ে ঢুকল বাবা। জানালাগুলো সব বন্ধ করল একে একে। ভেড়ার বাচ্চাগুলোকে আলাদা না রেখে ওদের মায়েদের ঘরে ঢুকিয়ে দিল। ঘরে ফিরে এসে মাথা নাড়ল গম্ভীর ভাবে, বলল, 'বরফই জমে কি না!'

'থাক, থাক, অমঙ্গুলে কথা বোলো না,' মা বাধা দিল। কিন্তু মাকেও রীতিমত চিন্তিত দেখাচ্ছে।

রাতে একসময় খুব শীত লাগল আলমানযোর, কিন্তু ঘুমের ঘোরে এতই বেহুঁশ যে একটা চাদর বা কম্বলও টেনে নিতে পারল না। একটু পরেই মায়ের হাঁক-ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। 'রয়াল, আলমানযো!' চেঁচাচ্ছে মা, কিন্তু চোখ খুলতে পারছে না আলমানযো। 'উঠে পড়ো, অ্যাই, উঠে পড়ো সবাই–জমে যাচ্ছে ভুট্টার চারা!'

এক গড়ান দিয়ে বিছানা থেকে নামল আলমানযো, প্যান্ট পরে নিল, চোখ বন্ধ করে বোতাম লাগাচ্ছে অন্ধকার হাতড়ে, এত বড় বড় হাই তুলছে যে চোয়াল খসে যাওয়ার জোগাড়! রয়ালের পিছুপিছু টলতে টলতে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

মা, ইলাইযা জেন আর অ্যালিসও তৈরি হয়ে গেছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সবকিছু কেমন অদ্ভুত লাগল আলমানযোর। সাদা হয়ে আছে ঘাসগুলো বরফ জমে, আশপাশের সবকিছুই যেন অচেনা।

বেস্ আর বিউটিকে ওয়্যাগনের সঙ্গে জুতছে বাবা, পানির চৌবাচ্চা ভরছে রয়াল প্রাণপণে পাম্প করে, মেয়েদের সঙ্গে আলমানযোও হাত লাগাল বাড়ি থেকে

বালতি, গামলা যা আছে নিয়ে আসবার কাজে। বড়সড় কয়েকটা ড্রাম তুলল বাবা ওয়্যাগনে। ব্যারেল, ড্রাম, বালতি, গামলাগুলো ভর্তি করা হলো পানি দিয়ে, তারপর ওয়্যাগনের পিছু পিছু হেঁটে চলল সবাই ভুট্টা-খেতের দিকে।

সব কটা ভুট্টার চারা বরফ জমে শক্ত হয়ে গেছে। এখন ছুঁলেই ভেঙে যাবে পাতাগুলো। একমাত্র ঠাণ্ডা পানিই ওদের প্রাণ বাঁচাতে পারে এখন। সূর্য ওঠবার আগে প্রতিটা চারার গায়ে পানি ঢালতে হবে, কারণ রোদ লাগলেই মারা পড়বে চারাগুলো।

খেতের পাশে থামল ওয়্যাগন। বাবা, মা, রয়াল, ইলাইযা জেন, অ্যালিস আর আলমানযো এবার হাত লাগাল কাজে। বালতি ভরা পানি নিয়ে ছুটোছুটি করে ভিজিয়ে চলল একের পর এক ভুট্টাচারা। যত দ্রুত সম্ভব পানি দেওয়ার চেষ্টা করল আলমানযো, ভারী বালতি নিয়ে আর সবার সঙ্গে সমান গতিতে পেরে উঠছে না–তা ছাড়া ঠাণ্ডা পানি লেগে হাত দুটো জমে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে। কিন্তু চেষ্টায় কোনও ত্রুটি নেই, টালমাটাল পা ফেলে ছুটছে সে বালতি নিয়ে, একের পর এক চারার গায়ে ঢালছে পানি।

পুবের সবুজাভ ভাবটা গোলাপী হতে শুরু করেছে, একটু একটু করে বাড়ছে আলো। এতক্ষণ কুয়াশার মধ্যে ছায়ার মত লাগছিল সব, এখন লম্বা সারির শেষ মাথা পর্যন্ত চারাগুলো দেখতে পাচ্ছে আলমানযো। আরও দ্রুত হাত চালাবার চেষ্টা করল ও, বাঁচাতে হবে চারাগুলোকে।

একটু পরেই গাঢ় অন্ধকার ধূসর হয়ে গেল। সূর্য আসছে চারাগুলোকে খুন করতে।

প্রতিবার বালতিটা ভরবার জন্য দৌড় দিচ্ছে আলমানযো, ফিরেও আসছে দৌড়ে। হাতে, কাঁধে, বুকের পাঁজরে ব্যথা; কাদাটে মাটি টেনে ধরতে চায় পা–কিন্তু কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ওর, পাগলের মত দৌড়াচ্ছে, আর পানি ছিটাচ্ছে চারাগুলোর গায়ে।

ধূসর আলোয় আবছা ছায়া দেখা যাচ্ছে এখন চারাগুলোর। একটু পরেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল সূর্যটা, নরম রোদ পড়েছে এখন খেতে। হঠাৎ আলমানযো লক্ষ করল, ওর ব্যস্ততা দেখে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে বাবার মুখে, ঘাড় ফিরিয়ে নরম দৃষ্টিতে দেখছে ওকে।

'চালিয়ে যাও, বাপ,' বলল বাবা, 'আর কিছুক্ষণ!'

সবাই কাজ চালিয়ে গেল। বালতির পর বালতি পানি ঢালা হতে থাকল চারাগুলোর গায়ে।

খানিক পর সোজা হয়ে দাঁড়াল বাবা, ঘোষণা করল, 'ব্যস, হয়েছে! আর পানি দিয়ে কোনও লাভ নেই।' সূর্যের তাজা আলো পড়েছে এবার জমে যাওয়া চারার গায়ে, বাকিগুলো আর বাঁচানো সম্ভব নয়।

বালতি রেখে কোনমতে কোমরে হাত রেখে সোজা হলো আলমানযো, চারপাশে তাকিয়ে দেখছে। আর সবাইও দেখছে। ক্লান্তিতে কারও মুখে কথা নেই। তিন একর জমির চারা বাঁচানো গেছে। সিকি একর জমিতে আর পানি দেওয়া যায়নি–ওগুলো গেছে।

'কপাল ভাল আমাদের,' বলল বাবা, 'বেশিরভাগটাই রক্ষা করতে পেরেছি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!'

ওয়্যাগনে চড়ে ফিরে এল ওরা–ক্লান্ত, শীতার্ত, ক্ষুধার্ত। কিন্তু মনে অদ্ভুত এক প্রশান্তি।

চোদ্দ

চমৎকার জামা কাপড় পরে শহরে চলল ওরা স্বাধীনতা দিবসে আনন্দ করতে।

বাবার তেজি ঘোড়াগুলো চকচকে লাল চাকার ঝকঝকে গাড়িটাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। ছুটির আমেজ চারপাশে, সবাই চলেছে শহরের পানে। সবার ওয়্যাগন আর বাগিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে ওদের গাড়ি। পাশ কাটাবার সময় মাথার টুপি খুলে নাড়ছে আলমানযো।

ম্যালোনে পৌঁছে গির্জার আস্তাবলে গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলতে সাহায্য করল ও বাবাকে। রয়াল মা ও বোনেদের নিয়ে চলে গেল মজা দেখতে, কিন্তু আলমানযোর কাছে ঘোড়াগুলোকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা, ওদের নাকে একটু আদর করে দেওয়া, খড় খেতে দেওয়া–এসব ভাল লাগে আর সব কিছুর চেয়ে বেশি।

ঘোড়া বেঁধে বাবার সঙ্গে হাঁটছে আলমানযো। চারদিক লোকে লোকারণ্য। দোকানপাট সব বন্ধ আজ। সবখানে খালি পতাকা আর পতাকা। স্কয়্যারে ব্যান্ড বাজছে জনপ্রিয় সুরে। চলতে চলতে বারবার থামতে হচ্ছে ওদের, শহরের গণ্যমান্য সবাই হাত মেলাচ্ছে বাবার সঙ্গে, কুশল বিনিময় করছে। স্কয়্যারে পৌঁছে সামনের সারিতে বসল ওরা।

জাতীয় সঙ্গীতের বাজনা বেজে উঠতেই সবাই উঠে দাঁড়াল, মাথার টুপি খুলে গেয়ে উঠল:

"ওহ্, সে, ক্যান ইউ সী বাই দ্য ডন্‌স্ আর্লি লাইট,
হোয়াট সো প্রাউডলি উই হেইল্‌ড্ অ্যাট দ্য টোয়াইলাইট'স লাস্ট গ্লীমিং,
হুজ ব্রড স্ট্রাইপ্‌স্ অ্যান্ড ব্রাইট স্টারস থ্রু দ্য পেরিলাস নাইট,
ও'অর দ্য র‍্যাম্পার্টস উই ওয়াচ্‌ড্ ওয়্যার সো গ্যাল্যান্টলি স্ট্রীমিং?"

গর্বে বুকটা ফুলে উঠল আলমানযোর। মন-প্রাণ ঢেলে গাইল ও–চোখ দুটো তারা আর স্ট্রাইপ আঁকা উড়ন্ত আমেরিকান পতাকার উপর স্থির।

সবাই বসে পড়তে একজন কংগ্রেসম্যান প্ল্যাটফর্মে উঠে গম্ভীর কণ্ঠে পাঠ করলেন বিখ্যাত ডিক্লারেশন অভ ইনডিপেন্‌ডেন্স। এরপর দুজন বক্তা দুটো দীর্ঘ বক্তৃতা দিল: একজন উচ্চহারে শুল্ক আরোপের পক্ষে, অপরজন অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে–বড়রা মন দিয়ে শুনল, কিন্তু বিন্দুবিসর্গ কিছুই বুঝল না আলমানযো। আবার বাজনা বেজে উঠতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ও।

ডিনারের সময় হয়ে আসতেই বাবার সঙ্গে আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়াগুলোকে

খাওয়াল আলমানযো আগে। মা ওদিকে গির্জা-প্রাঙ্গণে মেয়েদের নিয়ে ঘাসের উপর পিকনিক-লাঞ্চের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। খাওয়া-দাওয়ার পর আবার স্কয়্যারে ফিরে গেল ওরা।

এক জায়গায় গোলাপী লেমোনেড বিক্রি হচ্ছে, এক নিকেলে এক গ্লাস। শহরের ছোকরারা ভিড় করেছে দোকানটার আশেপাশে। আলমানযো দেখল ওর চাচাত ভাই ফ্র্যাঙ্কও আছে ওদের মধ্যে। শহরের পাবলিক পাম্প থেকে পানি খেল আলমানযো, কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক বলল ও লেমোনেড খাবে। এক নিকেল দিয়ে এক গ্লাস গোলাপী লেমোনেড কিনে ধীরে সুস্থে তারিয়ে তারিয়ে খেল ও, তারপর ঠোঁট চেটে বলল, 'দারুণ! তুমিও খাও না এক গ্লাস?'

'নিকেল কোথায় পেলে?' জিজ্ঞেস করল আলমানযো।

'কেন, বাবা দিয়েছে,' বড়াই করে বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'যখনই চাই তখনই দেয়।'

'আমি চাইলে আমার বাবাও দিত,' বলল আলমানযো।

'তা হলে চাইছ না কেন?' তামাশা করে বলল ফ্র্যাঙ্ক। বিশ্বাস করেনি সে আলমানযোর কথা।

'কারণ, আমার চাওয়ার ইচ্ছে নেই।'

'আসলে দেবে না, তাই না? চাইলেও দেবে না!' বাঁকা হাসছে ফ্র্যাঙ্ক।

'দেবে।'

'তা হলে চেয়ে দেখো দেয় কি না।' ফ্র্যাঙ্কের বন্ধুরাও কৌতূহলী হয়ে শুনছে ওদের কথোপকথন।

দুই পকেটে হাত ভরে আলমানযো ঘোষণা করল, 'আমার ইচ্ছে হলে চাইব।'

'বুঝেছি। চাইলেও পাবে না!' বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'চাওয়ার সাহসই নেই তোমার, কারণ, জানো, দেবে না।'

কিছুটা দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিস্টার প্যাডকের সঙ্গে কথা বলছে বাবা। ওয়্যাগন তৈরির বড়সড় এক কারখানার মালিক উনি। ধীরপায়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেল আলমানযো। যতই এগোচ্ছে ততই ভয় বাড়ছে, যদি বাবা সত্যিই নিকেল না দেয়? এর আগে কোনদিন পয়সাকড়ি চায়নি ও বাবার কাছে, দরকারই পড়েনি।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ও। কথা শেষ করে ওর দিকে ফিরল বাবা।

'কী হয়েছে, বাপ?'

ভয়ে ভয়ে আলমানযো বলল, 'বাবা···' শুকিয়ে আসছে গলাটা।

'হ্যাঁ, বলো, বাপ।'

'বাবা, তুমি কি···তুমি কি চাইলে আমাকে একটা নিকেল দেবে?'

বাবা আর মিস্টার প্যাডক, দুজনেই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। আলমানযোর মনে হলো এক দৌড়ে ছুটে পালায়। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বাবা বলল, 'কী করবে?'

পায়ের মোকাসিনের উপর দৃষ্টি, মরে যাচ্ছে অস্বস্তিতে, কোনমতে বলল আলমানযো, 'ফ্র্যাঙ্কের কাছে একটা নিকেল ছিল, গোলাপী লেমোনেড কিনেছে ও।'

'বেশ,' ভেবেচিন্তে বলল বাবা, 'ও যদি তোমাকে খাইয়ে থাকে, তোমা উচিত ওকে কিনে খাওয়ানো।' পকেটে হাত ভরল বাবা, তারপর হঠাৎ থে সরাসরি প্রশ্ন করল, 'ও তোমাকে লেমোনেড খাইয়েছে?'

নিকেলটা পাওয়ার আগ্রহে মাথা ঝাঁকাল আলমানযো। পরমুহূর্তে ছটফট ব উঠে মাথা নাড়ল, নিচু গলায় বলল, 'না, বাবা।'

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল বাবা ওর দিকে। গোটা ব্যাপারটা আন্দাজ ব নিয়ে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে খুলল। ধীরেসুস্থে বের করল রুপে একটা গোল আধডলার। জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আলমানযো, এটা কী বল পারো?'

'আধডলার,' জবাব দিল আলমানযো।

'ঠিক। কিন্তু আধডলার আসলে কী তা জানো?'

আলমানযো মাথা নাড়ল, আধডলার ছাড়া আর কী হতে পারে জানে না।

'এটা হচ্ছে কাজ,' বলল বাবা, 'টাকা হচ্ছে কাজ, কঠিন শ্রম।'

মিস্টার প্যাডক মৃদু হাসলেন। 'খুবই ছোট বাচ্চা,' বললেন তিনি। 'এ বোঝার কি বয়স হয়েছে ওর, ওয়াইল্ডার?'

'দেখো না,' জবাব দিল বাবা, 'আসলে যা ভাবছ তার চেয়ে অনেক-বুদ্ধি ছেলে ও।'

জবাব না দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল আলমানযো। একটা নিকেল চাই এসে এমন বিপদ হবে জানলে আসতই না। এখন পালাতে পারলে বাঁচে।

'আলুর চাষ কী করে করতে হয় তুমি জানো, তাই না, আলমানযো?'

'জানি,' ঝটপট জবাব দিল আলমানযো।

'ধরো, বসন্তকালে একটা বীজ-আলু পেলে, কী করবে ওটা দিয়ে?'

'কেটে টুকরো করব, দু'তিনটে মুখ থাকবে প্রতিটা টুকরোয়,' ব আলমানযো।

'তারপর? বলতে থাকো।'

'খেতে সার দিয়ে লাঙল দিতে হবে, তারপর মই দেওয়ার পর দাগ ট জমিতে। আলু লাগিয়ে লাঙল আর নিড়ানি দিতে হবে দুই বার।'

'ঠিক। তারপর?'

'তারপর ওগুলো খুঁড়ে তুলে তলকুঠুরিতে রেখে দেব। গোটা শীতকাল থা ওগুলো ওখানে, মাঝে মাঝে ছোট আর পচা বেছে ফেলতে হবে। পরের বস গাড়ি ভর্তি আলু এনে বিক্রি করব এই শহরে।'

'হ্যাঁ। যদি ভাল দাম পাও তা হলে আধ-বুশেল আলুর জন্য কত পাবে?'

'আধডলার,' বলল আলমানযো।

'ঠিক বলেছ, বাপ,' খুশি হলো বাবা। 'আধ-বুশেল আলু চাষ করার খা রয়েছে এই আধডলারে।'

রুপোর চাকতিটার দিকে চেয়ে খাটুনির তুলনায় খুবই ছোট মনে হ আলমানযোর।

'এটা এখন তোমার,' বলল বাবা।

নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না আলমানযো। কিন্তু বাবা, সত্যিই ওটা এগিয়ে দিচ্ছে দেখে হাত বাড়িয়ে নিল।

'এটা তোমার,' আবার বলল বাবা। 'ইচ্ছে করলে ছোট্ট একটা মাদী শুয়োর কিনতে পারো এটা দিয়ে। যদি পেলেপুষে বড় করতে পারো, একগাদা বাচ্চা দেবে ওটা—বড় হলে ওগুলো প্রত্যেকটার জন্য পাবে চার কি পাঁচ ডলার করে। আবার ইচ্ছে করলে পুরো আধডলার দিয়ে লেমোনেড কিনে খেতে পারো। কেউ কিচ্ছু বলবে না, তোমার যা খুশি। তোমার টাকা দিয়ে যা খুশি তাই করতে পারো তুমি। যাও।'

আধডলারের মুদ্রাটা হাতে নিয়ে কয়েক সেকেন্ড বিহ্বল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল আলমানযো, তারপর ওটা পকেটে পুরে চলে এল লেমোনেড স্ট্যান্ডে দাঁড়ানো ছেলেদের কাছে।

লেমোনেড বিক্রেতা হাঁকছে: 'এদিকে আসুন, এদিকে আসুন! ঠাণ্ডা লেমোনেড, শীতল গোলাপী লেমোনেড! এক গ্লাস মাত্র পাঁচ সেন্ট! মাত্র আধ ডাইমে বরফ-শীতল গোলাপী লেমোনেড! আসুন, আসুন!'

'কই, নিকেল কোথায়? দেখি?' সাগ্রহে এগিয়ে এল ফ্র্যাঙ্ক।

'নিকেল দেয়নি বাবা,' বলল আলমানযো।

টিটকারির হাসি হেসে উঠল ফ্র্যাঙ্ক। 'ইয়াহ্, ইয়াহ্! আমি বলেছিলাম না, দেবে না? দেখলে?'

'নিকেল দেয়নি, চাইতেই আধডলার দিয়েছে,' নিচু, নরম গলায় বলল আলমানযো।

'মিথ্যে কথা!' বলল ফ্র্যাঙ্ক। অন্য ছেলেরা চাপ দিল, 'তা হলে দেখাও।'

সত্যি সত্যিই ওর হাতে আধডলার দেখে হাঁ হয়ে গেল সবার মুখ, দুচোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে ফ্র্যাঙ্কের। সবাই ঘনিয়ে এল, দেখবে এত টাকা আলমানযো কীসে খরচ করে। কিন্তু নির্বিকার ভঙ্গিতে মুদ্রাটা পকেটে রেখে দিল ও।

'বাচ্চা একটা শুয়োর কিনব এটা দিয়ে—পুষব।'

মার্চ করে স্কয়্যারের দিকে এগিয়ে আসছে ব্যান্ডপার্টি রাস্তা জুড়ে। পিছনে এক দঙ্গল বাচ্চা। সুরেলা বিউগল আর মনকাড়া ড্রামের ছন্দ ওদের পাগল করে দিয়েছে। বার দুই রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত টহল দিয়ে স্কয়্যারে এসে পিতলের কামানের পাশে থামল ব্যান্ডপার্টি।

আকাশের দিকে লম্বা আঙুল তাক করে বসে আছে কামান দুটো। দুজন লোক চিৎকার জুড়ে দিল, 'সরো! সরো! সরে যাও সবাই!' দেখা গেল কয়েকজন কামানে কালো বারুদ ভরতে শুরু করেছে। মাথায় কাপড় বাঁধা লম্বা লাঠি দিয়ে গুঁতিয়ে সমান ভাবে বসানো হচ্ছে বারুদগুলো টাইট করে।

বাচ্চারা দৌড়াল রেললাইনের পাশ থেকে ঘাস-লতা-পাতা ছিঁড়ে আনতে। লোক দুজন সেই লতা-পাতা-ঘাস ঠাসল কামানের মুখ দিয়ে, লাঠি দিয়ে ঠেলে পাঠিয়ে দিল ভিতরে যতদূর যায়। রেল লাইনের ধারে জ্বালা হয়েছে আগুন, তাতে গরম করা হচ্ছে দুটো শিক।

ঘাস-পাতা ভালমত ঠাসা হয়ে গেলে দুই কামানের দুটো টাচ্-হোলে আরও কিছুটা বারুদ ভরল একজন। এবার সবাই মিলে তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করল, 'সরে যাও! সরে যাও!'

কোত্থেকে এসে চিলের মত ছোঁ মেরে আলমানযোর হাত ধরল মা, সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে টেনে।

'আরে, টানছ কেন?' আপত্তি জানাল আলমানযো, 'ওরা তো শুধু ঘাস-পাতা ভরেছে কামানে, কারও জখম হওয়ার ভয় নেই। আমি সাবধানেই থাকব, সত্যি।' কিন্তু কে শোনে কার কথা, টেনে কামানের কাছ থেকে অনেকটা দূরে নিয়ে গেল মা ওকে।

দুজন লোক আগুন থেকে তুলে নিল শিকদুটো। চুপ হয়ে গেছে সবাই, দেখছে আগ্রহ নিয়ে। কামান থেকে যতদূর সম্ভব পিছিয়ে থেকে লোক দুজন হাত লম্বা করে শিকের আগা ছোঁয়াল টাচহোলে। দপ্ করে জ্বলে উঠল আগুন। শ্বাস আটকে রেখেছে সবাই। তারপরই—বুম্‌ম্! বুম্‌ম্!

লাফিয়ে পিছনে সরে গেল কামানদুটো, আকাশ-বাতাস ছেয়ে গেছে ছিন্নভিন্ন ঘাস-লতা-পাতায়। আর সব বাচ্চার সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে কামানের গায়ে হাত দিয়ে দেখল আলমানযো কতটা গরম। কানে তালা লাগানো বিকট আওয়াজ নিয়ে আলাপ করছে সবাই।

স্বাধীনতা দিবসের সব মজা শেষ হলো। শহরে আর করবার কিছু নেই। গাড়িতে ঘোড়া জুতে ফিরে চলল ওরা বাড়ির পথে। ওখানে পড়ে রয়েছে অনেক অনেক জরুরি কাজ।

পনেরো

গরমকাল এসে গেছে। দ্রুত বাড়ছে খেতের ফসল। আরেকবার লাঙল দিল বাবা ভুট্টার জমিতে, রয়াল আর আলমানযো নিড়ানি দিল। আর ভুট্টার ফলন নিয়ে চিন্তা থাকল না, কোমর সমান উঁচু হয়ে গেছে গাছগুলো, এখন আর আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না আগাছা।

আলুরও খুবই বাড়-বাড়ন্ত অবস্থা। সাদা ফুলে ছেয়ে গেছে মাঠ। একই অবস্থা জই আর গমের। মৌমাছিদের ব্যস্ত আনাগোনায় সরগরম হয়ে রয়েছে খেতগুলো। কাজের তেমন চাপ নেই, তাই নিজের ছোট্ট বাগান নিয়ে মেতে আছে আলমানযো। ছোট একটুকরো জমিতে আলুর বীজ লাগিয়েছে ও, দেখতে চায় বীজ থেকে কেমন ফলন হয়। তা ছাড়া কাউন্টি-মেলায় প্রতিযোগিতার জন্য দুধ খাইয়ে বড় করছে ও একটা কুমড়োকে, সেটার দিকেও সদা-সতর্ক নজর আছে ওর।

কায়দাটা অবশ্য বাবার কাছেই শিখেছে ও। খেতের সবচেয়ে তাজা চারাটা

বেছে নিয়ে একটা রেখে বাকি সব শাখা ছেঁটে ফেলেছে; সেই একটা শাখায় যে-কটা ফুল ছিল সেগুলোর মধ্য থেকে সবচেয়ে সুন্দরটা রেখে বাকিগুলো ছিঁড়ে ফেলেছে। কিছুদিন পর ছোট্ট সবুজ কুমড়ো ধরলে বোঁটা থেকে শিকড়ের মাঝামাঝি জায়গায় নীচের দিকে লতার গাটা চিরে ছোট একটা গর্ত করেছে, তারপর সেই গর্তের নীচে মাটি খুঁড়ে বসিয়ে দিয়েছে একটা দুধ-ভরা পেয়ালা। এবার মা'র কাছ থেকে একটা মোম তৈরির সুতো চেয়ে নিয়ে এক মাথা সাবধানে ঢুকিয়ে দিয়েছে চেরা জায়গাটা দিয়ে, অপর মাথা চুবিয়ে দিয়েছে দুধের পাত্রে।

রোজ নিয়মিত একবাটি করে দুধ শুষে নিয়ে দৈত্যাকার হয়ে উঠতে শুরু করেছে কুমড়োর বাচ্চা। এখনই খেতের অন্যান্য কুমড়োর চেয়ে তিনগুণ বড় হয়ে উঠেছে ওটা।

নিয়মিত যত্ন পেয়ে আলমানযোর শূকর-ছানাও দ্রুত বেড়ে উঠছে গায়ে-গতরে।

আলমানযো নিজেও। তাড়াতাড়ি বড় হওয়ার জন্য বেশি বেশি করে দুধ খাচ্ছে ও। ওর আশা, আর একটু বড় হতে পারলে হয়তো পোষ মানাবার জন্য অন্তত একটা কোল্ট ওকে দেবে বাবা।

প্রত্যেকদিন আলমানযো গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করে কীভাবে নিয়মিত ট্রেনিং দিয়ে বাবা দু-বছরী কোল্টদুটোকে পোষ মানাচ্ছে। প্রথমে একটাকে লম্বা দড়ির মাথায় বেঁধে শেখায় এগোনো আর থামা, তারপর অন্যটাকে। এটা শেখা হয়ে গেলে লাগাম আর সাজ পরা শেখায়। এরপর সুশিক্ষিত একটা ঘোড়ার সঙ্গে হালকা গাড়িতে জুতে ট্রেনিং দেওয়া হবে ওদের একে একে। তারপর ওদের দুটোকে একসঙ্গে জুতে শেখানো হবে গাড়ি টানা। ওদের ভয় না ভাঙা পর্যন্ত চলতে থাকবে ট্রেনিং।

কিন্তু সামনে যাওয়া আলমানযোর বারণ। এসব কাজ নয় বছর বয়েসী ছেলেদের নয়।

এদিকে এ-বছর অপূর্ব সুন্দর একটা বাচ্চা দিয়েছে বিউটি। জীবনে এত সুন্দর কোল্ট আলমানযো দেখেনি। কপালে চমৎকার সাদা তারা আঁকা। ওটাকে দেখামাত্র নাম দিয়েছে আলমানযো–স্টারলাইট।

গ্রীষ্মকালে কাজ নেই, আবার আছেও। নিজের বাগানটা আগাছা উপড়ে, নিড়ানি দিয়ে ঠিকঠাক রাখা, সীমানা ঘেরা পাথরের বেড়াগুলো মেরামত করা, কাঠ চেরা, এসব টুকটাক কাজ করতে হয়। তা ছাড়া নিত্যকার গোলাঘরের কাজ তো আছেই। অবসর পেলেই সাঁতার কাটে ও নদীতে।

বৃষ্টির দিন বাবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে আলমানযো ট্রাউট রিভারে মাছ ধরতে। দুজন পাল্লা দিয়ে ধরে–কোনও কোনদিন দশবারোটা করে ধরে একেকজন। মা সেগুলো কর্নমিলে চুবিয়ে ভাজে, দুপুরের খাওয়াটা দারুণ জমে ওঠে তাজা মাছভাজার কল্যাণে।

হঠাৎ কোনও কোনদিন বাবা বলে বসে, 'আগামীকাল আর কোনও কাজ নয়। চলো, জাম কুড়াতে যাই।'

আসলে পিকনিক।

কাঠ-টানার ওয়্যাগনে চড়ে বড়সড় এক বাস্কেটে লাঞ্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ওরা জঙ্গলের উদ্দেশে। লেকের ধারে পাহাড়ের কাছে হাকলবরি আর ব্লুবরির অনেক গাছ আছে। দূর-দূরান্ত থেকে বহু পরিবার আসে এখানে জাম কুড়াতে। বাস্কেট হাতে একেকজন চলে যায় একেক দিকে, লাঞ্চের সময় ফিরে এসে তুলনা করে—কে কতগুলো পেয়েছে। সারাদিন গান-বাজনা, গল্প-গুজব করে সন্ধ্যায় একগাদা হাকলবরি আর ব্লুবরি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। মা মেয়েদের নিয়ে জ্যাম, জেলি আর আচার-মোরব্বা বানায় ওই জাম দিয়ে, পরবর্তী বেশ কিছুদিন খাবার টেবিলে পাওয়া যায় হাকলবরি পাই অথবা ব্লুবরি পুডিং।

হঠাৎ একদিন রাতে খেতে বসে ঘোষণা দিল বাবা, 'এবার কদিন তোমাদের মা আর আমি ছুটি নেব। ভাবছি আঙ্কেল অ্যানড্রুর ওখানে কাটাব একটা সপ্তাহ। ছেলেমেয়েরা, তোমরা এই কটা দিন সবাই মিলে ভাল হয়ে চলে সংসারটা চালিয়ে নিতে পারবে না?'

'ইলাইযা জেন আর রয়ালের তো পারা উচিত,' বলল মা। 'অ্যালিস আর আলমানযো তো রয়েইছে সাহায্যের জন্যে।'

আলমানযো চাইল অ্যালিসের দিকে, তারপর দুজন একসঙ্গে চাইল স্বৈরশাসক ইলাইযা জেনের দিকে। তারপর সবাই একসঙ্গে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, বাবা।'

ষোলো

দশ মাইল দূরে থাকে আঙ্কেল অ্যানড্রু।

এই দশ মাইল যাওয়ার আগে বাবা আর মা প্রস্তুতি নিল পুরো একটা সপ্তাহ। প্রতিদিনই গোটা কয়েক কাজের কথা মাথায় আসছে তাদের, যেগুলো সেরে রেখে না গেলে ক্ষতি হবে। এমন কী গাড়িতে চড়তে চড়তেও মার মনে আসছে নানান কথা: 'সন্ধের সময় ডিম তুলে আনতে ভুলো না, আর সর ঘেঁটে মাখন তোলবার দায়িত্ব কিন্তু তোমার উপর দিয়ে গেলাম ইলাইযা জেন—মাখনে আবার লবণ বেশি দিয়ে দিয়ো না, ছোট গামলাটায় রাখবে ওগুলো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে। বীজ হিসেবে যে-সব শিম আর মটরশুঁটির বীচি রেখেছি, ওগুলো আবার খেয়ে ফেলো না। সবাই লক্ষ্মী হয়ে থেকো, কেমন?' সিটে বসার পর মনে পড়ল আগুনের কথা বলা হয়নি। 'আর শোনো, ইলাইযা জেন, আগুনের ব্যাপারে খুব সাবধান! চুলোয় আগুন থাকা অবস্থায় বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না। মোমবাতির ব্যাপারেও সাবধান, যাই করো না কেন…' গাড়ি চলতে শুরু করল, চেঁচিয়ে বলল মা, 'আর, সব চিনি আবার খেয়ে ফেলো না!'

বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়ি, দুলকি চালে ছুটছে ঘোড়াগুলো। চলে গেল বাবা-মা। কয়েক মুহূর্ত পর চাকার শব্দও মিলিয়ে গেল।

কেউ কিছু বলল না। তবে ডাকসেঁটে ইলাইযা জেনকেও মনে হলো একটু যেন দমে গেছে। বাড়িটা, গোলাঘরগুলো আর ফসলের মাঠ মনে হচ্ছে মস্ত বিশাল আর শূন্য। পুরো একটা সপ্তাহ দশ মাইল দূরে থাকবে বাবা-মা।

হঠাৎ শূন্যে টুপি ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল আলমানযো। দুই হাতে বুক বাঁধল অ্যালিস।

'প্রথমে কী করব আমরা?' গদগদ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল অ্যালিস।

বাবা নেই, মা নেই–যা খুশি করতে পারে ওরা এখন, বাধা দেওয়ার নেই কেউ।

'বাসন-কোসন মেজে রেখে বিছানা ঠিকঠাক করে ফেলব এখন আমরা,' বলল ইলাইযা জেন।

কেউ পাত্তা দিল না ওকে। রয়াল বলল। 'চলো, আইসক্রীম বানাই!'

আইসক্রীমের ভক্ত ইলাইযা জেনও, একটু ইতস্তত করে রাজি হয়ে গেল, 'চলো।'

আইস-হাউস থেকে কাঠের গুঁড়ো সরিয়ে বড়সড় একটা বরফের চাঁই নিয়ে এল রয়াল আর আলমানযো, ওটা একটা ছালায় ভরে ছোট কুড়ালের ভোঁতা দিক দিয়ে পিটিয়ে গুড়ো করল। একটা পেয়ালায় ডিমের সাদা অংশ ফেঁটতে ফেঁটতে বেরিয়ে এল অ্যালিস বরফের ব্যবস্থা কতদূর এগোল দেখতে।

ইলাইযা জেন মাপ মত দুধ আর দুধের সর নিল, তারপর ভাঁড়ার ঘরের ব্যারেল থেকে সাদা চিনি নিয়ে এল। এ-চিনি ঘরে তৈরি করা বাদামি রঙের মেপ্‌ল্ শুগার নয়, শহর থেকে কিনে আনা। অতিথি এলেই শুধু এ-চিনি ব্যবহার করে মা। ব্যারেল থেকে ছয় কাপ চিনি তুলে নিয়ে হাত দিয়ে সমান করে দিল সে উপরের চিনি–কারও টের পাওয়ার উপায় নেই যে এখান থেকে নেওয়া হয়েছে।

বড় একটা দুধের গামলায় দুধ-চিনি-ডিম ভাল মত নেড়েচেড়ে মিশিয়ে হলুদ কাস্টার্ড তৈরি করা হলো, তারপর তারচেয়েও বড় একটা বালতিতে ওটা বসিয়ে চারপাশ দিয়ে লবণ মেশানো বরফের কুচি ঠাসা হলো আচ্ছা করে; এবার একটা কম্বল দিয়ে মুড়ে ঢেকে ফেলা হলো সবকিছু। কয়েক মিনিট পরপর কম্বল সরিয়ে বড় খুন্তি দিয়ে নেড়ে দিল ওরা জমে আসা আইসক্রীম।

সবটা যখন ভাল মত জমে গেল তখন কয়েকটা প্লেট আর চামচ নিয়ে এল অ্যালিস, আর ভাঁড়ার থেকে মস্ত একটা কেক আর গরু জবাই করবার ছুরি নিয়ে এসে মস্ত বড় বড় টুকরো করতে শুরু করল আলমানযো। প্রতিটা প্লেটে উঁচু করে আইসক্রীম তুলে দিল ইলাইযা জেন। খাও এখন যার যত খুশি, কেউ কিচ্ছু বলবে না।

দুপুরের মধ্যেই পুরো কেক খেয়ে শেষ করল ওরা, আইসক্রীমও আছে আর অতি সামান্যই। ইলাইযা জেন নিয়মের ভক্ত, সে বলল ডিনার খাওয়ার সময় হয়েছে এখন; কিন্তু কেউ খেতে রাজি হলো না, জানিয়ে দিল, পেটে জায়গা নেই।

আলমানযো বলল, 'এখন একটা তরমুজ পেলে জমত।'

লাফিয়ে উঠল অ্যালিস। 'গুড! চলো নিয়ে আসি একটা!'

'অ্যালিস!' হুকুম ঝাড়ল ইলাইযা জেন, 'এদিকে এসো। সকালের নাস্তার বাসন-পেয়ালা পড়ে রয়েছে, আর এখন জমেছে এগুলো। সব ধুতে হবে।'

'ঠিক আছে,' বলল অ্যালিস, 'ফিরে এসে···' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তরমুজ-খেতে রোদে তেতে আছে ছোট-বড় অসংখ্য তরমুজ। কাঁচা না পাকা দেখে বোঝবার কোনও উপায় নেই, টোকা দিয়ে বুঝতে হয়। শব্দটা যদি কাঁচা-কাঁচা লাগে তা হলে ওটা কাঁচা, আর যদি পাকা মনে হয় তা হলে পাকা। বড়সড় তরমুজগুলোর গায়ে টোকা দিচ্ছে আলমানযো, কিন্তু শব্দটা কাঁচা না পাকা সে ব্যাপারে একমত হতে পারছে না দুজন—এ যদি বলে কাঁচা, ও বলে: নাহ্, আমার মনে হচ্ছে পাকা।

শেষ পর্যন্ত ছটা তরমুজের ব্যাপারে একমত হলো ওরা। ওগুলো ছিঁড়ে একটা একটা করে নিয়ে এল বরফ-ঘরে। ওখানে বরফের উপর ছড়ানো ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে কাঠের গুঁড়োর উপর বসিয়ে দিল ওগুলো।

অ্যালিস গেল বাসন পেয়ালা ধুয়ে গুছিয়ে রাখতে। আলমানযো বলল, এখন ওর কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না, খুব সম্ভব সাঁতার কাটতে যাবে। কিন্তু অ্যালিস চোখের আড়ালে যেতেই এক দৌড়ে বেরিয়ে গেল ও গোলাবাড়ি থেকে। সোজা মাঠে গিয়ে হাজির হলো, যেখানে চরছে কোল্টগুলো।

পশু চরানোর মাঠটা মস্তবড়। কড়া রোদ উঠেছে। দূরে তাকালে মনে হয় গরমে ভাপ উঠছে মাঠ থেকে—কাঁপা কাঁপা, হালকা ধোঁয়ার মত। ঝিঁঝি পোকা তীক্ষ্ণ আওয়াজ করছে। একটা গাছের ছায়ায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে 'বেস' আর 'বিউটি', ওদের ছোট্ট কোল্ট দুটো দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশেই, লেজ নাড়ছে, দু-চার কদম নড়েচড়ে দেখছে কেমন লাগে। এক-বছরী, দু-বছরী আর তিন-বছরী কোল্টগুলো ঘাস খাচ্ছে মাঠে। সব কটা মাথা তুলে চেয়ে থাকল আলমানযোর দিকে।

হাতে কী যেন আছে, এমনি এক ভঙ্গি করে ধীর পায়ে এগোল ও কোল্টগুলোর দিকে। আসলে কিছুই নেই ওর হাতে, ও শুধু কাছে গিয়ে একটু আদর করতে চাইছে ওদের। একটা বড় কোল্ট এগিয়ে আসছে আলমানযোর দিকে, তারপর আরেকটা—পরমুহূর্তে সব কটা এগিয়ে এল। সঙ্গে গাজর আনেনি বলে খুব খারাপ লাগল ওর। রোদ লেগে চিকচিক্ করছে ঘোড়াগুলোর গা। আহা, কী সুন্দর! চলবার ছন্দে নড়ছে শক্তিশালী পেশি।

হঠাৎ একটা কোল্ট 'হুশ্শ্!' শব্দ করল, আরেকটা পা ঠুকল মাটিতে, চিহিঁ করে উঠল অপর একটা। মাথা উঁচু হয়ে গেল সব কটার, খাড়া হয়ে গেল লেজ, শুরু হলো দৌড়। সব কটার বাদামি রঙের পশ্চাৎদেশ আর কালো খাড়া লেজ আলমানযোর দিকে ফেরানো। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের মত একটা গাছকে চক্কর দিয়ে এক সঙ্গে ছটা কোল্ট এবার সোজা ছুটে আসছে ওর দিকে—দৌড়ের ছন্দে নড়ছে বুকের পেশি। এতই জোরে দৌড়াচ্ছে যে আলমানযো বুঝতে পারল, এখন ওরা থামতে পারবে না। সরে যাওয়ারও সময় নেই। চোখ বন্ধ করে চেঁচিয়ে উঠল ও, 'ওয়াও!'

কাঁপছে জমিন, দ্রুত এগিয়ে আসছে ওরা। চোখ মেলল ও। দেখল, ঠিক সামনে একজোড়া বাদামি হাঁটু উঠছে উপর দিকে, তারপর সাঁই করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল পেট আর পিছনের পা দুটো। বাতাসের ধাক্কায় উড়ে গেল মাথার টুপি। থতমত খেয়ে গেছে ও। ওকে টপকে চলে গেছে একটা তিন বছরী কোল্ট। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল তুফানবেগে ছুটছে ওরা মাঠের উপর দিয়ে, পরমুহূর্তে দেখতে পেল, রয়াল আসছে।

'আবার তুমি এসেছ কোল্টের কাছে!' চেঁচিয়ে উঠল রয়াল। রাগে লাল হয়ে গেছে চেহারা, 'কানে কথা যায় না, না? এমন মার খাবে আজ, জীবনে ভুলবে না!' খপ্ করে আলমানযোর একটা কান ধরে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে চলল সে গোলাবাড়ির দিকে। ও যে আসলে কিছুই করেনি সেকথা বোঝাবার চেষ্টা করল আলমানযো, কিন্তু রয়াল শুনল না'কোনও কথা।

'আর একবার যদি ওই মাঠে ধরতে পারি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রয়াল, 'তোমার চামড়া তুলে নেব আমি। বাবাকেও বলে দেব!'

কান ডলতে ডলতে চলে গেল বিমর্ষ আলমানযো ট্রাউট রিভারের দিকে, যতক্ষণ না কিছুটা ভাল বোধ হলো, ততক্ষণ সাঁতার কাটল। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছল: বাড়িতে সবার ছোট হওয়ার মত বাজে ব্যাপার আর হয় না।

বিকেলে বাড়ির সামনের প্রাঙ্গণে বলস্যাম গাছের নীচে ঘাসের উপর বসে ঠাণ্ডা তরমুজ খেল ওরা যার যত খুশি। পিচ্ছিল বীচিগুলো দুই আঙুলে টিপে টিপে পিস্তলের গুলির মত মারতে থাকল আলমানযো ইলাইযা জেনের দিকে, থামল ও যখন খেঁকিয়ে উঠে ধমক মারল তখন।

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল আলমানযো। 'যাই, লুসিকে নিয়ে আসি, খোসাগুলো খাবে।'

'খবরদার!' চেঁচিয়ে উঠল ইলাইযা জেন। 'ছিহ্! কী আক্কেল! নোংরা একটা ধাড়ি শুয়োর নিয়ে আসবেন উনি বাড়ির সামনের উঠানে।'

'কে বলেছে ও নোংরা ধাড়ি শুয়োর?' খেপে উঠল আলমানযো। 'আমার লুসি ছোট আর অসম্ভব পরিষ্কার। সব জানোয়ারের মধ্যে ওরাই সবচেয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ওর ঘরে গিয়ে ওর বিছানাটা একবার দেখলেই বুঝতে পারবে। ওরা নিজেরাই নিজেদের বিছানা করে–গরু, ঘোড়া বা ভেড়া তা পারে না। শুয়োরেরা…'

'হয়েছে, হয়েছে! লেকচার মারতে হবে না। শুয়োর সম্পর্কে আমি তোমার চেয়ে কম জানি না!' বলল ইলাইযা জেন।

'তা হলে আর কখনও ওকে নোংরা বলতে এসো না! তোমার সমানই পরিষ্কার ও।'

'আচ্ছা! মা কিন্তু তোমাকে হুকুম দিয়ে গেছে আমার কথা শুনতে,' জবাব দিল ইলাইযা জেন। 'একটা শুয়োরের পেছনে তরমুজের খোসা কিছুতেই আমি নষ্ট করব না। ওগুলো দিয়ে মোরব্বা বানাব।'

'আমার ধারণা, ওগুলোর মধ্যে আমার খোসাও আছে। যদি…' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু উঠে দাঁড়াল রয়াল।

'চলে এসো, মানযো, কাজগুলো সেরে ফেলি।'

দৈনন্দিন কাজ শেষ হলে লুসিকে নিয়ে এল আলমানযো বাড়িতে। গুয়োরটা বাড়ির চারপাশে ঘুরে ঘুরে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আর চেঁচামেচি এতই করল যে দুই কানে হাত চাপা দিতে হলো ইলাইযা জেনকে। রাতের খাবার শেষ হলে একটা প্লেটে করে এঁটো খাবার নিয়ে গিয়ে খাওয়াল আলমানযো লুসিকে। কান খাড়া করে শুনল, রান্নাঘরে তর্ক হচ্ছে রয়াল আর ইলাইযা জেনের। রয়াল চিনির মিঠাই খেতে চায়, কিন্তু ইলাইযা জেনের ধারণা: কেবল শীতের সন্ধ্যাতেই খায় ওগুলো। রয়াল বোঝানোর চেষ্টা করছে: গ্রীষ্মের সন্ধ্যাতেও একই সমান মজা লাগবে। কথাটা খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হলো আলমানযোর, সে-ও গিয়ে রয়ালের পক্ষ নিল।

অ্যালিস বলল, ও জানে কী করে চিনির মিঠাই তৈরি করে। ইলাইযা জেন যখন করবে না, তখন ওর উপরই দায়িত্ব পড়ল। চিনি আর চিটাগুড় পানিতে গুলে চুলোয় জ্বাল দিল অ্যালিস যতক্ষণ আঠা-আঠা একটা ভাব না আসে; তারপর কয়েকটা প্লেটে মাখন মাখিয়ে ঢালল জিনিসটা সমান ভাগে। ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য রেখে এল প্লেটগুলো বারান্দায়। যত ঠাণ্ডা হয়ে আসবে, ততই জমে শক্ত হয়ে আসবে মিঠাই। সবাই এবার আস্তীন গুটিয়ে হাতে মাখন মেখে নিল আঠার ভয়ে। দেখা গেল, ইলাইযা জেনও মাখন মাখছে হাতে।

বাইরে দাঁড়িয়ে আলমানযোর জন্য চেঁচাচ্ছে লুসি অনেকক্ষণ ধরে। আলমানযো বেরোল চিনির মিঠাই ঠাণ্ডা হয়েছে কি না দেখতে। হাত দিয়ে দেখল হয়েছে। ভাবল লুসিরও কিছুটা পাওয়া উচিত। এদিক ওদিক চেয়ে একথাবা মিঠাই তুলে নিয়ে বারান্দার কিনার থেকে আলগোছে ছেড়ে দিল লুসির হাঁ করা উদগ্রীব মুখে।

ঠাণ্ডা হয়েছে শুনে যে-যার প্লেট নিয়ে টানতে শুরু করল। টান দিলেই লম্বা হচ্ছে মিঠাই, আবার টানলে দ্বিগুণ লম্বা হচ্ছে, কিন্তু শক্ত হচ্ছে না কিছুতেই। কুছ পরোয়া নেই, শুরু হলো খাওয়া—অল্পক্ষণেই ওদের দাঁত, জিভ, আঙুল, গাল, এমন কী চুল পর্যন্ত চটচটে হয়ে গেল আঠায়। মেঝেতে খানিকটা পড়ে গেল আলমানযোর হাত থেকে, আটকে গেল সেখানেই, আর তোলা গেল না। কটকটে শক্ত হওয়ার কথা চিনির মিঠাই, কিন্তু যে-কার তেমনি নরম আঠা হয়ে থাকল ওটা। শেষ কালে হাল ছেড়ে দিয়ে শুতে গেল ওরা।

পরদিন সকালে গোলাবাড়ির কাজে রওনা হয়েই আলমানযো দেখল, লুসি দাঁড়িয়ে আছে উঠানে—মাথাটা ঝুলে পড়তে চাইছে নীচের দিকে, ওকে দেখলেই যে ছোট্ট লেজটা প্রবল বেগে নাড়ে, সেটা ঝুলে আছে নীচের দিকে। ওকে দেখেও টুঁ-শব্দ করল না; মাথাটা নাড়ল বিমর্ষ ভঙ্গিতে, ভোঁতা নাকটা কুঁচকাল।

ঝকঝকে সাদা দাঁতের জায়গায় মসৃণ বাদামি কী যেন দেখা যাচ্ছে ওর মুখে। মুহূর্তে বুঝে ফেলল আলমানযো ব্যাপারটা—দাঁতে দাঁত আটকে গেছে ওর চিনির মিঠাই খেতে গিয়ে। এখন না পারছে হাঁ করতে, না কিছু খেতে, না কোনও আওয়াজ করতে। আলমানযোকে এগোতে দেখেই দৌড় দিল লুসি উল্টো দিকে।

চিৎকার করে রয়ালকে ডাকল আলমানযো। দুজন মিলে ছুটল ওর পিছনে।

দৌড়, দৌড়, দৌড়! দুজনকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল লুসি–এদিক যায়, ওদিক যায়; স্লো বল ঝোপের নীচ দিয়ে, লাইল্যাককে পাক খেয়ে, বাগানটাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে, বাউলি কেটে ডানে যায়, বাঁয়ে যায়; মুখে টুঁ-শব্দটি নেই, চিনির মিঠাই আটকে দিয়েছে দু'পাটি দাঁত।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে রয়ালের দু'পায়ের ফাঁক গলে ছুটল আবার, আছাড় খেল রয়াল। আলমানযো প্রায় ধরে ফেলেছিল, ডিগবাজি খেয়ে কয়েক গড়ান দিয়ে আবার দৌড় দিল লুসি। মটর শুঁটির গাছ ছিঁড়ে, পাকা টম্যাটো মাড়িয়ে, বাঁধা কপি উপড়ে ছুটছে ওরা, অ্যালিস এসে যোগ দিয়েছে সঙ্গে; দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ইলাইযা জেন চেঁচাচ্ছে, 'এই যে, এদিক দিয়ে যায়! ওই যে গেল, ধরো, ধরো!'

শেষকালে তিনজনে এক কোনায় আটকাল লুসিকে, তাও সে দমবার পাত্রী নয়; অ্যালিসের পাশ দিয়ে বাউলি কেটে চলে যাচ্ছিল, ঝাঁপ দিয়ে জাপটে ধরল আলমানযো। ভয় পেয়ে পা ছুঁড়ল লুসি, ফড়ফড় করে বুক থেকে নাভী পর্যন্ত ছিঁড়ে গেল আলমানযোর কাপড়।

ছাড়ল না আলমানযো, অ্যালিস চেপে ধরল পিছনের দুই পা। রয়াল জোর করে ওর মুখ টেনে খুলে আঙুল দিয়ে চেঁছে বের করল আঠালো মিঠাই। এতক্ষণে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল লুসি! রাতভর যে-নালিশ সে জানাতে পারেনি; আধঘণ্টা ধরে তাড়া করা হচ্ছে, অথচ যে-ভয় সে প্রকাশ করতে পারেনি–সব একসঙ্গে বেরিয়ে এল ওর কণ্ঠ চিরে। ছাড়া পেয়েই ছুটল সে নিজের ঘরের দিকে।

'আলমানযো জেম্‌স্ ওয়াইল্ডার,' মায়ের ভঙ্গি নকল করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল ইলাইযা জেন, 'নিজের চেহারাটা একটু দেখো গিয়ে আয়নায়!'

পাত্তা দিল না আলমানযো। যদিও জানে ইতিমধ্যেই দু-দুটো অপরাধ করে ফেলেছে–চিনি-মিঠাই খাইয়েছে গুয়োরকে, আর কাপড়টা ছিঁড়েছে এমন জায়গায় যে সেলাই করলেও দেখা যাবে–তবু স্বস্তি বোধ করছে সে, পুরো একটা সপ্তাহ মা জানবে না কিচ্ছু।

ওইদিন আবারও আইসক্রীম বানাল ওরা, শেষ করল শেষ কেকটাও। অ্যালিস বলল পাউন্ডকেক কী করে বানাতে হয় জানে ও, একটা বানিয়ে রেখে বৈঠকখানায় আরাম করতে যাবে।

'না, যাবে না,' বাধা দিল ইলাইযা জেন। 'তুমি ভাল করেই জানো, বৈঠকখানাটা কেবল মেহমানদের জন্যে।'

ওর মুখের উপর কেউ কিছু বলল না, কিন্তু আলমানযোর মনে হলো, বেশি বেশি বাড়াবাড়ি করছে ইলাইযা জেন।

এটা ওর বৈঠকখানা নয়, মা-ও বলেনি যে ওখানে বসা যাবে না–ইচ্ছে করলে অ্যালিস ওখানে বসবে না কেন?

বিকেলে পাউন্ড-কেকের খবর নিতে রান্নাঘরে এল আলমানযো। দেখল, চুলো থেকে মাত্র নামিয়েছে ওটা অ্যালিস। এতই অপূর্ব গন্ধ, যে কোনা থেকে একটু ভেঙে মুখে না দিয়ে পারল না ও। ভাঙাটা ঢাকবার জন্য কেকের এক পাশ থেকে দুটো টুকরো কাটল অ্যালিস, দুজন দু'টুকরো কেক খেল অবশিষ্ট আইসক্রীমটুকু দিয়ে।

'আরও আইসক্রীম বানাব?' জিজ্ঞেস করল অ্যালিস।

'দূর!' উপরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ওপরে আছে ও। চলো বৈঠকখানায় গিয়ে বসি।'

পা টিপে চলে এল ওরা বৈঠকখানায়। খড়খড়ি নামানো, তাই ঘরটা আধো-অন্ধকার, কিন্তু সত্যিই চমৎকার করে সাজানো। ওয়াল-পেপারগুলো সাদার উপর সোনালী কাজ করা, কার্পেটটা মার অনেক যত্নে নিজ হাতে বোনা। সেন্টার টেবিলের উপরটা মার্বেল পাথরে ঢাকা, তার উপর রয়েছে সুন্দর, গোলাপের নক্সা আঁকা, লম্বা একটা ল্যাম্প। তার পাশে ভেলভেট মোড়া ছবির অ্যালবাম।

চারপাশের দেয়াল ঘেঁষে মখমলের গদি লাগানো সুদৃশ্য চেয়ার রাখা। দুই জানালার মাঝখানের দেয়ালে ঝুলছে জর্জ ওয়াশিংটনের ছবি, কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন চোখে চোখে।

আলগোছে সোফায় উঠে বসল অ্যালিস, কিন্তু সোফার পিচ্ছিল কাপড় ওকে ফেলে দিল মেঝেতে। জোরে হাসার সাহস নেই, পাছে ইলাইযা জেন শুনে ফেলে, বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়েছে অ্যালিসের। আবার উঠে বসল সোফায়, আবার পিছলে নেমে গেল। মজা পেয়ে আলমানযোও বসল কয়েকবার। ওই একই ঘটনা, থাকা যায় না, পিছলে নেমে আসতে হয়। মনের আনন্দে হাসছে দুজন। খুশি যখন গলার আওয়াজ হয়ে বেরিয়ে আসবার উপক্রম করল, তখন আর সোফায় উঠতে সাহস হলো না।

সত্যিই সুন্দর করে সাজিয়েছে মা ঘরটা। ঘুরে ঘুরে শো-কেসে সাজানো ঝিনুক, প্রবাল, চিনামাটির পুতুল, সব দেখল ওরা অনেকক্ষণ ধরে, কিন্তু যেই ইলাইযা জেনের পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল সিঁড়িতে, পা টিপে বেরিয়ে দরজা ভিড়িয়ে দিল ওরা বৈঠকখানার।

এত আনন্দ, এত স্বাধীনতা–মনে হচ্ছিল এভাবেই বুঝি চলতে থাকবে, সপ্তাহ আর ফুরাবে না। কিন্তু এক সকালে বলল ইলাইযা জেন, 'কাল ফিরবে বাবা-মা।'

খাঁওয়া বন্ধ হয়ে গেল সবার। বাগানের আগাছা পরিষ্কার করা হয়নি, মটরশুঁটি আর শিম তোলা হয়নি, মুরগির ঘরটা চুনকাম করবার কথা ছিল–হয়নি সেটা।

'দেখার-মত হয়েছে বাড়িটা,' বলল ইলাইযা জেন চারপাশে চেয়ে। 'মাখন তুলতে হবে আজ যতটা পারা যায়। ইশ্‌শ্‌, মাকে কী জবাব দেব? চিনি তো সব শেষ!'

চিনির ব্যারেলে গিয়ে উঁকি দিল ওরা। সত্যিই, তলাটা দেখা যাচ্ছে।

সান্ত্বনা দিল অ্যালিস, 'ভাগ্য ভাল, তলায় সামান্য হলেও আছে একটু চিনি। মা বলে গেছে: "সব চিনি খেয়ে ফেলো না।" কই, আমরা কি সব খেয়েছি?'

হুঁশ ফিরে এসেছে সবার। যে যতটা পারে সাধ্যমত কাজ এগিয়ে রাখবার চেষ্টায় মন দিল। রয়াল আর আলমানযো নিড়ানি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাগানে, মুরগির ঘর চুনকাম করে ফেলল, গোয়ালাঘর আর দক্ষিণ গোলাঘরের মেঝে পরিষ্কার করে ফেলল। ঘরের মেঝে পরিষ্কার করছে দুই বোন। আলমানযোকে দিয়ে দুধের সর ঘাঁটাল ইলাইযা জেন, মাখন তুলল ব্যস্ত হাতে, লবণ মিশিয়ে

তুলে রাখল গামলায়। ঘর-দোর ঠিক করতেই মেয়েরা সারাদিন এত ব্যস্ত থাকল যে ডিনার সারতে হলো সবাইকে শুধু রুটি, মাখন আর জ্যাম দিয়ে। পেটের এক কোনাও ভরল না আলমানযোর।

'এবার আলমানযো, তুমি স্টোভটা পালিশ করে ফেলো,' হুকুম দিল ইলাইযা জেন।

স্টোভ পালিশের কাজটা খুব খারাপ লাগে আলমানযোর, তবে কথা না শুনলে যদি আবার শুয়োরকে চিনি-মিঠাই খাওয়ানোর ব্যাপারটা মাকে বলে দেয়, সেই ভয়ে কালি আর ব্রাশ নিয়ে কাজে লেগে গেল ও। কিন্তু অযথা তাড়া দিচ্ছে ইলাইযা জেন, ঘ্যান-ঘ্যান করছে, তাই মেজাজ ঠিক রাখা ভীষণ কঠিন হয়ে উঠল ওর পক্ষে।

'সাবধান! মেঝেতে আবার রঙ ফেলো না!' ঝাড়ু দিতে দিতে আবার বলল ইলাইযা জেন। একটি কথাও বলল না আলমানযো।

'অত পানি দিয়ো না, আলমানযো। ইশ্‌শ্‌, আরেকটু জোরে ডলতে পারো না?' কোনও জবাব দিল না আলমানযো।

বৈঠকখানায় ঢুকল ইলাইযা জেন ঝাড়-পোঁছ করতে। ওখান থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'আলমানযো, হয়েছে তোমার স্টোভ-পালিশ?'

'না।'

'এহ্‌-হে! হাত চালাও, হাত চালাও!'

'উহ্‌, চাকর খাটাচ্ছেন!' বিড়বিড় করে বলল আলমানযো, 'বিবি সাহেব!'

'কী বললে?' গলা চড়িয়ে জানতে চাইল ইলাইযা জেন।

'কিছু না।'

দরজায় এসে দাঁড়াল ইলাইযা জেন। 'কিছু না মানে? কী যেন বললে এখুনি বিড়বিড় করে?'

সোজা হয়ে বসল আলমানযো, চেঁচিয়ে উঠল কর্কশ কণ্ঠে, 'বলেছি, তুমি বিবি সাহেব? চাকর পেয়েছ আমাকে?'

হাঁ হয়ে গেল ইলাইযা জেন। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'দাঁড়াও তুমি, আলমানযো জেমস ওয়াইল্ডার! আসুক মা, মাকে আমি বলব…'

কালি মাখা ব্রাশটা আসলে ঠিক ছুঁড়তে চায়নি আলমানযো, কিন্তু কেমন করে জানি ওটা ছুটে গেল হাত থেকে, ইলাইযা জেনের কানের পাশ দিয়ে সাঁই করে চলে গেল। থ্যাপ! সোজা গিয়ে বৈঠকখানার ওপাশের দেয়ালে লাগল ওটা। সাদার উপর সোনালী কাজ করা দামি ওয়াল-পেপারের উপর এখন বিচ্ছিরি ধাবড়া একটা কালো দাগ দেখা যাচ্ছে।

ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল অ্যালিস। ঘুরেই গোলাবাড়ির দিকে দৌড় দিল আলমানযো। সিঁড়ি বেয়ে খড়ের গাদায় উঠে যতদূর সম্ভব ভিতরে সেঁধিয়ে লুকিয়ে থাকল। ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে করছে ওর, কিন্তু বয়সটা প্রায় দশ বছর হয়ে যাওয়ায় পারছে না।

মা এসে দেখবে তার সাধের বৈঠকখানার কী হাল করেছে ও, বাবা ওকে উঁড-শেডে নিয়ে গিয়ে ব্ল্যাকস্নেক চাবুক দিয়ে পিটাবে। এই খড়ের গাদার মধ্যেই

যদি বাকি জীবন লুকিয়ে থাকতে পারত ও, তা হলে বড় ভাল হত।

অনেক···অনেকক্ষণ পর খড়ের গাদার কাছে এসে ডাকল ওকে রয়াল। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল ও—বুঝতে পারল সবই জানে রয়াল।

'মানুষ রে, বড় জব্বর পিট্টি খাবি এবার,' বলল রয়াল সহানুভূতির সুরে। ওরা দুজনেই জানে এ-পিট্টি এড়ানোর উপায় নেই। বাবা জানতে পারলে চাবুক মারবেই। আর না জানতে পারবার কোনও কারণই নেই। তা ছাড়া, মারাটা যে অন্যায় হবে, তাও না।

'মারুক, আমি কেয়ার করি না,' বলল আলমানযো।

দৈনন্দিন কাজ সবই করল ও রয়ালের সঙ্গে সঙ্গে, সাপার খেল চুপচাপ। তারপর শুতে চলে গেল উপরে। যাওয়ার আগে একবার বৈঠকখানার দিকে তাকাল ও। দরজাটা বন্ধ, কিন্তু মনের চোখে পরিষ্কার দেখতে পেল ও দেয়ালের গায়ে কুৎসিত কালো দাগটা।

পরদিন গাড়িতে চড়ে ফিরে এল বাবা-মা। সবার সঙ্গে আলমানযোকেও বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হলো। ওর কানে কানে বলল অ্যালিস, 'অত ভেবো না। হয়তো তেমন একটা দোষ ধরবে না ওরা।' কিন্তু খুবই উদ্বিগ্ন দেখাল ওকেও।

খুশি খুশি গলায় বাবা বলল, 'এই যে, তোমরা। সবাই ঠিক ঠাক মত ছিলে তো?'

'হ্যাঁ, বাবা,' জবাব দিল রয়াল। ঘোড়া খুলবার জন্য বাবার পিছু নিয়ে আজ আস্তাবলে গেল না আলমানযো, বাড়িতেই থাকল।

মা হ্যাটের ফিতে খুলতে খুলতে ঘুরে ফিরে দেখছে বাড়ির অবস্থা।

'তোমাদের প্রশংসা করতেই হয়, ইলাইযা জেন আর অ্যালিস,' বলল মা দেখে শুনে, 'সব দেখছি ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছ! বাহ্, আমি যে ছিলাম না, তা কে বলবে?'

'মা,' নিচু গলায় ডাকল অ্যালিস। 'কিন্তু, মা···'

'কী হয়েছে, বাছা? কিছু বলবে?'

'মা, সব চিনি খেতে মানা করেছিলে আমাদের, কিন্তু আমরা যে, প্রায় সবটুকুই খেয়ে ফেলেছি।'

হাসল মা। 'তোমরা সবাই মিলেমিশে লক্ষ্মী হয়ে থেকেছ,' ওর কাঁধে হাত রাখল, 'তাই চিনির জন্যে আমি বকব না।'

কিন্তু মা তো বৈঠকখানার ওই কালো দাগটা দেখেনি। দরজা বন্ধ। সেই দিন কিছুই টের পেল না মা, পরদিনও না। এদিকে আলমানযোর গলা দিয়ে তো আর খাবার কিছুতেই নামতে চায় না। মা চিন্তিত হয়ে পড়ল। ওকে ধরে ভাঁড়ার ঘরে নিয়ে হজমের জন্য সেই ভয়ঙ্কর বিটকেল ওষুধটা খাওয়াল বড় চামচের পুরো এক চামচ।

আলমানযো ভাবছে, এখনও দেখছে না কেন মা দাগটা? একবার দেখে ফেললে যা হওয়ার হয়ে যেত, এমন ভয়ে ভয়ে আর থাকতে হত না সারাক্ষণ।

দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় একটা গাড়ি এসে থামল সামনের আঙিনায়। মিস্টার ও মিসেস ওয়েব এসেছেন বেড়াতে। বাবা-মা বাইরে গিয়ে সাদরে ডেকে আনল

অতিথিদের। আলমানযো শুনল, মা বলছে, 'আসুন, একেবারে বৈঠকখানায় গিয়ে বসি।'

পাথরের মূর্তির মত জমে গেল আলমানযো। জবান বন্ধ হয়ে গেছে। হায়, হায়। কপালটা ওর এতই খারাপ হবে ভাবতেও পারেনি ও। সাজানো-গুছানো বৈঠকখানাটা মায়ের গর্বের জিনিস। বেচারী জানেও না কী সর্বনাশটা করে রেখেছে ও এই ঘরের। মেহমানদের নিয়ে ঢুকছে মা বৈঠকখানায়, এখুনি চোখে পড়বে কালো বিশ্রী দাগটা, তারপর···আর ভাবতে পারল না ও।

সবাইকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল মা। ওদের পিছনটা শুধু দেখতে পেল আলমানযো, আর শুনতে পেল জানালার শেডগুলো উঠে যাচ্ছে উপরে। ঘরটা এখন পুরোপুরি আলোকিত। ওর মনে হলো অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলছে না।

'আপনি এই বড় চেয়ারটা নিন, মিস্টার ওয়েব,' মায়ের গলা শোনা গেল। 'আরাম করে বসুন। আর মিসেস ওয়েব, আসুন আপনি আর আমি ওই সোফায় বসি।'

মা কি দেখেনি?

'বাহ্, কী সুন্দর বৈঠকখানা আপনার!' মিসেস ওয়েবের কণ্ঠে অকৃত্রিম প্রশংসা।

আর এক পা এগোতেই দেয়ালের সেই জায়গাটা দেখতে পেল আলমানযো। আরে! নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না ও। সেখানটায় ব্রাশের ধাবড়া কালো দাগ থাকবার কথা, সেখানে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ওয়ালপেপার, সাদার উপর চমৎকার সোনালী কাজ করা। কোথাও কোন দাগ নেই। ওর সন্দেহ হলো, ও কি ভুল জায়গায় খুঁজছে? হয়তো অন্য জায়গায় লেগেছিল ব্রাশটা। ভাল করে দেখবার জন্য আর একটু সামনে বাড়তেই দেখে ফেলল মা ওকে।

'এই যে, আলমানযো। এসো, ভেতরে এসো,' ডাকল মা।

ভিতরে গিয়ে একটা মখমলের চেয়ারে বসল আলমানযো। মেঝেতে পা ঠেকিয়ে রাখল যেন পিছলে পড়ে না যায়। আঙ্কেল অ্যানড্রুর ওখানে বেড়াতে যাওয়ার গল্প শোনাচ্ছে মা-বাবা। এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে কোথাও কোন দাগ দেখতে পেল না ও।

'বাচ্চাদের রেখে এতদূর গিয়ে ওদের জন্যে দুশ্চিন্তা হয়নি আপনার?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ওয়েব।

'না,' গর্বের সঙ্গে বলল মা। 'আমি জানতাম, ওরা সব ঠিকমত চালিয়ে নিতে পারবে। ফিরে এসে দেখি, যেমন রেখে গেছি তেমনি আছে ঘর-দোর, সব কাজ হয়েছে ঠিক-ঠাক মত।'

পরদিন চুরি করে বৈঠকখানায় ঢুকল আলমানযো। ঠিক যেখানে গিয়ে লেগেছিল ব্রাশটা, ভাল করে লক্ষ করে দেখল, সেখানে সূক্ষ্ম একটা কাটা দাগ দেখা যায়। জায়গাটা কেটে বের করে সেখানে আরেকটা ওয়ালপেপার সাঁটা হয়েছে অতি যত্নে, নক্সার সঙ্গে এমন সুন্দর ভাবে মিলে গেছে যে জেনেশুনে না খুঁজলে কারও চোখে পড়বার জো নেই।

তক্কে তক্কে থাকল আলমানযো, ইলাইযা জেনকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বৈঠকখানার ওই ওয়ালপেপারটা মেরামত করেছ?'

'হ্যাঁ,' হাসল ইলাইযা জেন। 'চিলে কোঠায় খুঁজতেই বেঁচে যাওয়া এক টুকরো ওয়ালপেপার পেয়ে গেলাম। ওটাকে কেটেকুটে সাইজ করে ময়দার আঠা দিয়ে সেঁটে দিলাম।'

'আমাকে মার থেকে বাঁচাবার জন্যে?'

'তবে আর কেন?'

ভাবাবেগ ফুটে উঠল আলমানযোর চেহারায়। বলল, 'তোমার দিকে ব্রাশটা ছোঁড়ার জন্যে আমি দুঃখিত। সত্যিই। কী করে যে ছুটে গেল ওটা! আমি সত্যিই দুঃখিত, ইলাইযা জেন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বলল ইলাইযা জেন। 'আমিও খুব সম্ভব ত্যক্ত-বিরক্ত করে ফেলেছিলাম তোমাকে। যদিও তা চাইনি আমি—আসলে তখন খুব টেনশনে ছিলাম তো! মেজাজ চড়ে গিয়েছিল। যাক, আমিও দুঃখিত। আর তোমাকে মার খাওয়াব কেন? তুমিই তো আমার একমাত্র ছোট্ট দুষ্টু ভাই।'

কৃতজ্ঞতায় চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল আলমানযোর। চট্ করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হাঁটা দিল অন্যদিকে।

মা কোনদিন জানতেই পারেনি বিশ্রী ওই কালো দাগের কথা।

সতেরো

কাস্তেগুলো শান দিয়ে রেখে ফ্রেঞ্চ জো আর লেযি জনকে খবর দিল আলমানযো, আগামীকাল সকাল থেকে শুরু হবে খড় কাটার কাজ।

বড় তিনজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ গোড়া কাটছে কোমর সমান ঘাসের, আর ওরা এগিয়ে যেতেই পিয়েখ, লুই আর আলমানযো পিচ-ফর্ক দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে ওগুলো সমান করে, যাতে রোদ লেগে শুকিয়ে যায় তাড়াতাড়ি।

এ-সময়টা রোদও খুব কড়া। সূর্য একটু চড়তেই হ্যাটের ভিতর সবুজ ঘাস পুরে মাথায় পরল সবাই। কিছুক্ষণের জন্য শান্তি। আর খানিক বাদে বাড়ি গিয়ে ঠাণ্ডা শরবত নিয়ে এল আলমানযো এক বালতি—দুধ, দুধের সর, ডিম, গরম মশলা আর চিনি মিশিয়ে তৈরি। সবাই দাঁড়াল ওকের ছায়ায়, তৃপ্তির সঙ্গে পান করল শরবত। তারপর আবার কাজ।

তিন সপ্তাহ ধরে চলল খড় সংগ্রহের কাজ। সব খড় শুকিয়ে নিয়ে গোলাবাড়িতে ঠেসে-ঠুসে রাখতে রাখতে এসে গেল ফসল কাটবার সময়। পেকে গেছে জই আর গম। শিম, বরবটি, কুমড়ো, গাজর, শালগম আর আলু তুলবার সময় হয়েছে। শুরু হলো প্রচণ্ড পরিশ্রমের কাজ। বিশ্রামের সময় নেই। উদয়াস্ত খাটছে বাবা, রয়াল আর আলমানযো। মা, ইলাইযা জেন আর অ্যালিসেরও

কাজের অন্ত নেই–শশা, সবুজ টম্যাটো আর তরমুজের খোসা দিয়ে তৈরি করছে আচার, ভুট্টা আর আপেল শুকাচ্ছে, জ্যাম-জেলি-মোরব্বা বানাচ্ছে।

গ্রীষ্মের ফসলের কিছুই ফেলা যায় না। আপেলের মাঝের অংশটুকুও রেখে দেওয়া হয় সিরকা তৈরি হবে বলে, একগাদা জইয়ের খড় ভেজানো রয়েছে পিছনের আঙিনায়–আগামী গ্রীষ্মে পরবার জন্য হ্যাট তৈরি হবে ওগুলো বুনে।

প্রথমে জই কাটা হলো, তারপর গম। সব আঁটি বেঁধে নিয়ে আসা হলো গোলাবাড়িতে। এবার মটর, তারপর শিম আর বরবটি তোলা।

ওরা সবাই যখন এসব নিয়ে ব্যস্ত তখন নিউ ইয়র্ক শহর থেকে এল মাখনের খরিদ্দার। প্রতিবছরই আসে। চমৎকার শহুরে পোশাক, চেইনে বাঁধা সোনার ঘড়ি বুক পকেটে, সুন্দর গাড়ি আর ঘোড়া। সবাই লোকটাকে পছন্দ করে। ডিনারের সময় রাজ্যের গল্প আর ফ্যাশন ও রাজনীতির সর্বশেষ খবর শোনায়।

ডিনারের পর তলকুঠরিতে গিয়ে প্রতিটা মাখনের গামলা পরীক্ষা করল লোকটা লম্বা একটা স্টীলের ফাঁপা রড দিয়ে। কোথাও কোনও ত্রুটি না পেয়ে অকুণ্ঠ প্রশংসা করল, বলল: এত ভাল মাখন জীবনে দেখেনি সে, ন্যায্য দাম দিতেও কুণ্ঠিত হলো না। আড়াইশো ডলার দিয়ে মায়ের পাঁচশো পাউন্ড মাখন কিনে নিয়ে খুশি মনে চলে গেল গাড়ি হাঁকিয়ে। মা-ও গাড়িতে ঘোড়া জুতে নিয়ে ছুটল শহরের ব্যাঙ্কের দিকে–কারণ অত টাকা কিছুতেই বাড়িতে রাখবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে আগেই।

মাকে নিয়ে খুব গর্ব হলো আলমানযোর। নিউ ইয়র্কের কত অজানা-অচেনা মানুষ মা'র তৈরি মাখন খেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করবে, কিন্তু কেউ জানবে না কে বানাল এত চমৎকার মাখন।

মধ্য-গ্রীষ্ম ঢলে পড়তেই ঠাণ্ডার ভাব টের পাওয়া গেল বাতাসে। ভুট্টা কেটে খেতেই আঁটি বাঁধা অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। কুমড়ো গাছের পাতাগুলো শুকিয়ে ঝরে গেছে, তার উপর বসে রয়েছে গাট্টাগোট্টা কুমড়োগুলো। এখন শুধু কেটে নিয়ে গোলাবাড়িতে তোলা।

আলমানযোর দুধ-খাওয়া কুমড়োটা এতদিনে বিশাল আকার ধারণ করেছে। সাবধানে লতা থেকে কেটে ওটাকে আলাদা করল আলমানযো, কিন্তু তুলতে পারল না, এমন কী নড়াতেও পারল না। শেষে বাবা ওটাকে ওয়্যাগনে তুলে নিয়ে এল গোলাবাড়িতে, একগাদা খড়ের উপর সাবধানে নামিয়ে রাখল। কাউন্টির মেলায় নিয়ে যাওয়া হবে ওটাকে।

অন্যান্য কুমড়োগুলো ছিঁড়ে এক জায়গায় গাদা করল আলমানযো, বাবা সেগুলো তুলে নিয়ে রেখে এল গোলাবাড়িতে। ওখান থেকে ভালগুলো বেছে বাড়ির নীচে সেলারে রাখা হবে মোরব্বা বানাবার জন্য। অন্যগুলো থাকবে দক্ষিণ গোলাঘরের মেঝেতে, প্রতি সন্ধ্যায় আলমানযো হাত-কুড়োল দিয়ে কয়েকটা কেটে খাওয়াবে গরু-বাছুর আর ষাঁড়গুলোকে।

আপেল বাগানে প্রতিটা গাছে ঝুলছে অসংখ্য গাছ-পাকা আপেল। বাবা, রয়াল আর আলমানযো মই লাগিয়ে উঠে নিখুঁত আপেলগুলো বেছে বেছে পেড়ে ঝুড়িতে ভরল। এক ওয়্যাগন ঝুড়ি ভর্তি আপেল ধীরে ধীরে চালিয়ে বাড়িতে নিয়ে

আসা হলো। তলকুঠুরির আপেল রাখবার বাক্সে একটা একটা করে সাজিয়ে রাখা হলো। চোট খাওয়া আপেল ওখানে রাখা যাবে না। একটা আপেল পচলে গোটা বাক্সের সব আপেল নষ্ট হয়ে যাবে।

ভাল আপেলগুলো সব পেড়ে বাক্স-বন্দি করবার পর রয়াল আর আলমানযো গাছে উঠে ঝাঁকুনি দিয়ে পাড়ল আপেল। ডাল ধরে প্রবল ঝাঁকি দিলেই শিলা বৃষ্টির মত মাটিতে পড়তে থাকে আপেলগুলো। টপাটপ কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হলো ওয়্যাগনে–সাইডার তৈরি হবে এগুলো দিয়ে।

ওয়্যাগন ভর্তি আপেল নিয়ে বাবা চলে গেল সাইডার-মিলে, আর আলমানযো চলে এল বাগানে–ঝুড়িতে করে বীট, শালগম, ওলকপি; গাজর তুলে রেখে দিল বাড়ির নীচে, সেলারে। তারপর পেঁয়াজ টেনে তুলল আলমানযো, আর ওগুলোর শুকনো পাতা বিনুনির মত করে বুনে আটকে ফেলল অ্যালিস, মা সেগুলো ঝুলিয়ে রাখল চিলে কোঠায়। মরিচের গোটা গাছ উপড়ে তুলল আলমানযো, আর অ্যালিস সুঁই-সুতো নিয়ে লালগুলো গেঁথে বড় বড় মালা বানাল, তারপর ঝুলিয়ে দিল পেঁয়াজের পাশে।

সাইডার মিল থেকে দুটো বিশাল জালা নিয়ে ফিরে এল বাবা, গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে রেখে এল সেলারে; আগামী আপেল মরসুম পর্যন্ত সাইডারের চাহিদা মিটাবে জালা দুটো।

পরদিন সকাল থেকে ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাস বইতে শুরু করল। মেঘগুলো গড়াগড়ি দিচ্ছে ধূসর আকাশে। চিন্তায় পড়ল বাবা। খেতের গাজর আর আলু এখন তুলে ফেলতে হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

জুতো, মোজা, টুপি, কোট আর দস্তানা পরে তৈরি হলো আলমানযো, অ্যালিস পরল ঘোমটার মত মাথাঢাকা টুপি আর শাল। ও-ও সাহায্য করবে কাজে।

বেস আর বিউটিকে লাঙলে জুতে গাজরের লম্বা সারিগুলোর মাঝ দিয়ে চাষ দিল বাবা। দু'পাশের মাটি আলগা হয়ে যাওয়ায় গাজরগুলো এখন শুধু সরু একফালি জমিনের উপর দাঁড়িয়ে। আলমানযো আর অ্যালিস টপাটপ টেনে তুলতে শুরু করল গাজরগুলোকে ঝুঁটি ধরে, আর রয়াল ঝুঁটি ছেঁটে ওগুলো ছুঁড়ে ফেলতে লাগল ওয়্যাগনে। ওয়্যাগন ভরে গেলে বাবা ওগুলো সেলারে বড় বড় গাজরের বাক্স ভর্তি করে রেখে ফিরে এল।

আলমানযো আর অ্যালিস সেদিন যে ছোট্ট লাল দানা বুনেছিল, সেগুলোই এখন দুশো বুশেল গাজরে পরিণত হয়েছে। যত খুশি নিয়ে রান্না করবে মা, তার পরেও শীতকালে গরু আর ঘোড়াগুলোকে খাওয়ানোর জন্য যথেষ্ট থাকবে গাজর।

আলু তুলবার কাজে সাহায্য করতে এল লেযি জন। নিড়ানি দিয়ে খুঁচিয়ে জমি থেকে আলু তুলছে বাবা আর জন, অ্যালিস আর আলমানযো ওগুলো তুলে বাস্কেটে রাখছে, বাস্কেট ভরে গেলে ঢেলে দিয়ে আসছে ওয়্যাগনে। দুটো ওয়্যাগন আনা হয়েছে আজ মাঠে, একটা ভরে গেলেই রয়াল সেটা নিয়ে গিয়ে সেলারের জানালা দিয়ে বেলচার সাহায্যে ঢেলে দিয়ে আসছে আলুর বাক্সে। ততক্ষণে আরেকটা ওয়্যাগন প্রায় ভরে ফেলছে অ্যালিস আর আলমানযো।

দুপুরে কাজ থামাল না ওরা, অন্ধকারে যখন আর দৃষ্টি চলে না, তখন বাড়ি ফিরে গেল। জমিতে বরফ জমে যাওয়ার আগেই তুলতে হবে আলু। নইলে বরবাদ হবে আলু খেতের পিছনে একবছরের খাটনি। আলু কিনে খেতে হবে তখন ওদের।

'এই সময়ে এরকম আবহাওয়া জীবনে দেখিনি আমি,' বলল বাবা।

পরদিন খুব ভোরে উঠে আবার কাজে লাগল ওরা। বিশ্রামের কোনও তোয়াক্কা করল না। সূর্য আজ আর উঠলই না। অনেক নীচে নেমে এসেছে ধূসর মেঘ। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে জমি, আলুগুলোও ঠাণ্ডা। শীতল হাওয়ায় মাঝেমাঝে শিউরে উঠছে শরীর, ধুলো এসে পড়ছে চোখে। চোখে ঘুম নিয়ে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে আলমানযো আর অ্যালিস। তাড়াতাড়ি করবার চেষ্টা করছে ওরা, কিন্তু আঙুলগুলো ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে আসায় ধরতে পারছে না ঠিকমত, হাত থেকে খসে পড়ছে আলু।

'নাকটা এমন ঠাণ্ডা হয়েছে না!' বলল অ্যালিস। 'কান ঢাকার ব্যবস্থা আছে, নাক ঢাকার ব্যবস্থা করা যায় না?'

বাবাকে জানাল আলমানযো, ঠাণ্ডা লাগছে। বাবা বলল, 'হাত চালাও, বাপ। জলদি করো, তা হলে শীত কম লাগবে।'

চেষ্টা করে দেখল ওরা, কিন্তু কাজ হলো না, ঠাণ্ডায় হাত চলছে না। একটু পর বাবা বলল, 'আলুর শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালো না, অনেক আরাম হবে।'

দুজন মিলে একগাদা শুকনো পাতা জড়ো করে ফেলল এক জায়গায়, বাবার কাছ থেকে ম্যাচ নিয়ে আগুন ধরাল একটা পাতায়। একপাতা থেকে আগুন লেগে গেল অন্যান্য পাতায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে মনে হলো পুরো মাঠটাই বেশ গরম হয়ে উঠেছে।

এরপর আর কাজ করতে অসুবিধে হলো না। যখনই বেশি ঠাণ্ডা লাগে, ছুটে গিয়ে দাঁড়ায় ওরা আগুনের ধারে, সেই সঙ্গে আরও কিছু শুকনো পাতা জড়ো করে রাখে।

'খিদে লেগেছে,' বলল আলমানযো।

'আমারও,' বলল অ্যালিস। 'মনে হচ্ছে ডিনারের সময় হয়ে এসেছে।'

সূর্য নেই, তাই ছায়া দেখে যে আন্দাজ করবে তার উপায় নেই। এক নাগাড়ে কাজ করে চলেছে ওরা, কিন্তু ডিনারের শিঙা আর বাজেই না।

'এই সারিটা শেষ হওয়ার আগেই, দেখো, শিঙা বাজবে, আমি বলে দিলাম,' বলল আলমানযো। কিন্তু বাজল না শিঙা। ওটা নষ্ট হয়ে গেল না কি, ভাবল আলমানযো। বাবাকে বলল, 'মনে হচ্ছে, খাওয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।'

হেসে উঠল জন। বাবা বলল, 'কেবল মাঝ-সকাল হয়েছে, বাপ। দুপুরের অনেক দেরি।'

আবার কাজে লেগে গেল আলমানযো। আলু তুলছে বাস্কেটে, রয়ালকে দিচ্ছে, রয়াল ফেলছে ওয়্যাগনে। মেশিনের মত চলছে সবার হাত। বাবা বলল, 'একটা আলু পুড়িয়ে খাও, খিদে কিছুটা কমবে।'

বড় দেখে দুটো আলু রাখল আলমানযো গরম ছাইয়ের উপর, আশপাশ থেকে আরও ছাই টেনে ঢেকে দিল আলু দুটো, তারপর আরও কিছু শুকনো পাতা ফেলল আগুনের মধ্যে। কাজে ফিরে যাওয়া দরকার বুঝতে পারছে, কিন্তু আগুনের কাছ থেকে নড়তে ইচ্ছে করছে না, বেশ লাগছে আঁচটা, অপেক্ষা করছে কখন সেঁকা হবে আলুগুলো।

ওদিকে অ্যালিস একা কাজ করে চলেছে দেখে অস্বস্তিও লাগছে, তবে নিজেকে বুঝ দিচ্ছেঃ আমিও তো কাজেই আছি, ওর জন্যেও তো একটা আলু রোস্ট করছি।

হঠাৎ হিস্-হিস্ শব্দ কানে এল, পরমুহূর্তে কী যেন উড়ে এসে থ্যাপ করে পড়ল ওর চোখে-মুখে। আটকে আছে জিনিসটা গালের সঙ্গে, প্রচণ্ড গরম। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল আলমানযো, চেঁচাতেই থাকল। অসহ্য ব্যথা, চোখে দেখতে পাচ্ছে না কিছুই।

চিৎকার, চেঁচামেচি শুনতে পেল ও, দৌড়ে আসছে কারা ওর দিকে। বড় এক জোড়া হাত ওর হাতদুটো সরিয়ে দিল গালের উপর থেকে, বাবা ওর মাথাটা পিছনে হেলাচ্ছে। অনর্গল ফ্রেঞ্চ বলছে লেযি জন, আর ফুঁপিয়ে কাঁদছে অ্যালিস, 'কী হয়েছে, বাবা? কী হলো আলমানযোর?'

'চোখ দুটো একটু খোলো তো, বাপ,' বলল বাবা।

আলমানযো চেষ্টা করে দেখল, শুধু একটা চোখ খোলে, ডানচোখটা মেলা যাচ্ছে না। বুড়ো আঙুল দিয়ে বন্ধ চোখের পাতা খুলল বাবা, ব্যথায় উহ্ করে উঠল আলমানযো। বাবা বলল, 'যাক, বাঁচা গেল! চোখে লাগেনি।'

একটা আলু ফেটে গিয়ে ছিটকে এসে পড়েছে ওর চোখে-মুখে। চোখের পাতা ঠিক সময় মত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শুধু পাতার উপরটা আর গালের একাংশ ছ্যাঁকা খেয়েছে।

রুমাল দিয়ে চোখটা বেঁধে দিয়ে লেযি জনকে নিয়ে কাজে ফিরে গেল বাবা।

পুড়ে গেলে যে এত ব্যথা লাগে জানত না আলমানযো। কিন্তু অ্যালিসকে বলল ব্যথা লাগছে না–মানে, খুব বেশি না। একটা কাঠি দিয়ে অন্য আলুটা বের করে আনল ও ছাইয়ের নীচ থেকে।

'মনে হচ্ছে এটা তোমার আলুটা,' নাক টেনে বলল ও। এখনও নাক চোখ দিয়ে পানি ঝরছে।

'না, এটা তোমারটা,' বলল অ্যালিস। 'আমারটা ফেটেছে।'

'কী করে জানলে কারটা ফেটেছে?'

'তা জানি না। এটা তোমার। তুমি ব্যথা পেয়েছ, তাই এটা তোমার। তা ছাড়া আমার খিদে নেই, মানে, বেশি খিদে নেই।'

'আমার সমানই খিদে লেগেছে তোমার!' বলল আলমানযো। 'এসো, এটাকে অর্ধেক করে খাই।'

বাইরেটা পুড়ে কালো হয়ে গেছে, কিন্তু আলুর ভিতরটা সাদা–চমৎকার সুগন্ধ ছাড়ছে। ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য একটু সময় দিয়ে ভিতরের অংশটা খেয়ে নিল দুজন, তারপর ফিরে গেল কাজে।

গালে ফোস্কা পড়েছে, ডান চোখটা ফুলে বন্ধ হয়ে গেছে আলমানযোর। কিন্তু দুপুরে একটা পুল্টিশ লাগিয়ে দিল মা ওখানে, রাতে সেটা বদলে আরেকটা–পরদিনই ব্যথা কমে গেল অনেকখানি।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর শেষ হলো আলু তুলবার কাজ। প্রতি মিনিটে বাড়ছে ঠাণ্ডা। ওয়্যাগনের পিছু পিছু ফিরে এল ওরা বাড়িতে। বাতি জ্বেলে সেলারে আলু রাখছে বাবা, রয়াল আর আলমানযোকে সারতে হলো প্রাত্যহিক কাজগুলো। সবাই খুশি, যাক, ঠিক সময় মত তুলে আনা গেছে আলুগুলো।

ওই রাতেই জমে গেল মাটি। এর পরই শুরু হবে তুষারপাত।

তাড়াহুড়ো করে মাঠ থেকে আঁটি বাঁধা ভুট্টা আর দলা পাকানো মটর ও শিম নিয়ে আসা হলো গোলাবাড়িতে।

সমস্ত ফসল তোলা হয়েছে। তলকুঠুরি, চিলেকোঠা আর গোলাঘরগুলো উপচে পড়বার অবস্থা। প্রচুর খাবার–নিজেদের জন্য, পশুগুলোর জন্য–শীতের সঞ্চয় ঘরে তুলে সবাই নিশ্চিন্ত।

এবার কিছুদিন শুধুই আনন্দ। প্রস্তুত হচ্ছে সবাই কাউন্টি মেলার জন্য।

আঠারো

কাউন্টি ফেয়ারে প্রতি বছর বিশাল আয়োজন হয়। সাজ সাজ রব পড়ে যায় চারদিকে। সবাই ছুটছে শহরের দিকে, নিজ নিজ সেরা পোশাক পরে। ওয়াইল্ডার পরিবারও রোববারের পোশাক পরে তৈরি। শুধু মা সেরা পোশাক না পরে মাঝারি-ভাল পোশাক পরেছে, সঙ্গে নিয়েছে অ্যাপ্রন। গির্জার ডিনারে রান্নার কাজে সাহায্য করবে মা।

বাগির সিটের নীচে জেলি, আচার আর মোরব্বার পাত্র রাখা হয়েছে–এগুলো মেলায় প্রদর্শনের জন্য নিয়ে যাচ্ছে ইলাইযা জেন আর অ্যালিস। অ্যালিস ওর এমব্রয়ডারির কাজটাও নিয়েছে প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে বলে। আলমানযোর বিশাল কুমড়ো চলে গেছে গত কালই ওয়্যাগনে চড়ে। অতবড় কুমড়ো বাগিতে করে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

যত্নের সঙ্গে ধুয়ে, মুছে, পালিশ করেছে ওটা আলমানযো, ওয়্যাগনে নরম খড় বিছিয়ে তার উপর আলগোছে বসিয়ে দিয়েছে বাবা ওটা তুলে। তারপর দুজনে পৌঁছে দিয়েছে মেলা প্রাঙ্গণে মিস্টার প্যাডকের কাছে। তিনিই এ-ধরনের জিনিসের দায়িত্বে আছেন।

রাস্তাঘাটে প্রচুর লোক, সবাই চলেছে ম্যালোনের পথে। শহরে পৌঁছে দেখা গেল লোকে-লোকারণ্য। স্বাধীনতা দিবসের চেয়ে অনেক বেশি মানুষ হয়েছে মেলায়–মাছির মত ভন্-ভন্ করছে সবখানে। পত্পত্ করে উড়ছে পতাকা, ব্যান্ড বাজছে মন-মাতানো সুর ও ছন্দে।

মা রয়াল আর দুই মেয়েকে নিয়ে নেমে গেল মেলা প্রাঙ্গণে, কিন্তু আলমানযো বাবার সঙ্গে চলে গেল গির্জার শেডে, ঘোড়া খুলতে সাহায্য করল। শেডগুলো ভর্তি হয়ে গেছে। রাস্তার দুপাশ দিয়ে মানুষের স্রোত বইছে যেন, ধুলো উড়িয়ে যাচ্ছে-আসছে অসংখ্য বাগি। উৎসবের সাজ পরেছে সবাই, আনন্দ আর ধরে না।

'বলো তো, বাপ,' জিজ্ঞেস করল বাবা, 'কোন্‌দিক থেকে শুরু করি?'

'আগে ঘোড়াগুলো দেখলে কেমন হয়?' বলল আলমানযো।

মৃদু হেসে বাবা বলল, 'চলো তা হলে।'

অনেকেই ডেকে থামিয়ে কুশল বিনিময় করল বাবার সঙ্গে। সবাই কথা বলছে। কয়েকজন শহুরে ছেলের সঙ্গে ফ্র্যাঙ্ক চলে গেল পাশ কাটিয়ে। মাইল্‌স্ লিউইস আর আরন্ ওয়েবকে দেখল আলমানযো। ওরা ডাকল ওকে, কিন্তু ও বাবার সঙ্গেই রয়ে গেল।

মেলা-প্রাঙ্গণের দোকানে হাঁক ছাড়ছে বিক্রেতারা: 'কমলা, কমলা, ফ্লোরিডার মিষ্টি কমলা!' 'ভাগ্য পরীক্ষা, ভাগ্য পরীক্ষা—এক ডাইম, মাত্র এক ডাইম।'

টেইল কোট আর চক্‌চকে উঁচু হ্যাট পরা এক লোক ভিড় জমিয়ে ফেলেছে। একটা মটর দানা রাখছে সে তিনটে খোলার যে-কোনও একটার নীচে, ঠিক ঠিক বলতে পারলে টাকা দিচ্ছে।

'আমি জানি কোথায় রেখেছে, বাবা!' বাবার আঙুলে টান দিল আলমানযো।

'ঠিক জানো?' জিজ্ঞেস করল বাবা।

'হ্যাঁ,' আঙুল তুলে দেখাল আলমানযো। 'ওই যে, ওটার নীচে।'

'বেশ, তাকিয়ে থাকো, একটু পরেই জানা যাবে।'

ঠিক সেই সময়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল একজন লোক, খোলাগুলোর পাশে রাখল পাঁচ ডলারের একটা নোট। তারপর আঙুল তুলে আলমানযো বাবাকে যেটা দেখিয়েছিল সেই খোলাটা দেখাল।

লম্বা হ্যাট পরা লোকটা খোলা তুলল। মটর নেই ওটার নীচে। পরমুহূর্তে সাঁৎ করে পাঁচ ডলারের নোটটা ঢুকিয়ে রাখল টেইল কোটের পকেটে। তারপর মটরটা সবাইকে দেখিয়ে আবার সবার সামনে লুকিয়ে রাখল একটা খোলার নীচে।

তাজ্জব বনে গেছে আলমানযো। ওই খোলের নীচে মটরটা রাখতে দেখেছিল ও নিজের চোখে, অথচ দেখা গেল নেই ওখানে! বাবাকে জিজ্ঞেস করল কী করে হলো এটা।

'আমি জানি না, বাপ,' মৃদু হেসে বলল বাবা। 'তবে ওই লোকটা জানে। এটা ওর খেলা। অন্যের খেলায় কখনও নিজের টাকা বাজি ধরতে নেই।'

ঘোড়ার শেডে চলে এল ওরা। 'মরগান' ঘোড়া দেখল আলমানযো খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মাথাটা ছোট, চোখ উজ্জ্বল, সরু পা, ছোট্ট খুর। কিন্তু বাবা যে চার বছরী কোল্টদুটো বিক্রি করেছে, সেগুলোর তুলনায় কিছুই না।

এরপর 'থরোব্রেড' ঘোড়া দেখল ওরা। এগুলো মরগানের চেয়ে কিছুটা লম্বা, গলা কিছুটা সরু। কিন্তু খুব নার্ভাস। মরগানের চেয়ে দ্রুত দৌড়াবে এরা, কিন্তু ওদের চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য।

থরোব্রেডের পরেই মস্তবড় তিনটে ধূসর রঙের ঘোড়া। ওগুলোর গর্দান মোটা, পা ভারী। খুরগুলো লম্বা লোম দিয়ে ঢাকা। বিরাট মাথা ওগুলোর, চোখজোড়া শান্ত, মায়াময়। এরকম ঘোড়া আলমানযো দেখেনি কোনদিন। বাবা বলল ইউরোপে ফ্রান্সের পাশে বেলজিয়াম নামে এক দেশ আছে–এ-ঘোড়া সেই দেশের। ফরাসীরা জাহাজে করে নিয়ে এসেছে এই জাতের ঘোড়া কানাডায়, এখন কানাডা থেকে আসছে এ-দেশে। বাবার খুব পছন্দ হয়েছে ঘোড়াগুলো। আলমানযোকে বলল, 'দেখো, ওদের পেশিগুলো দেখো! মনে হচ্ছে কোনও গোলাঘরে জুতে দিলে টেনে নিয়ে যাবে!'

'গোলাঘর টানার কি আমাদের দরকার আছে?' বলল আলমানযো। 'এ ঘোড়া আমাদের কী কাজে লাগবে? আমাদের মরগানগুলোর যা পেশি আছে তা ওয়্যাগন টানার জন্যে যথেষ্ট, বাগি টানার উপযোগী যথেষ্ট স্পীডও আছে।'

'ঠিক বলেছ, বাপ!' স্বীকার করল বাবা। মাথা নাড়ল দুঃখিত ভঙ্গিতে। 'প্রচুর খাবে এই বিশাল ঘোড়া, দানাপানির অপচয় হবে, অথচ আমাদের কোনও কাজে লাগবে না। ঠিকই বলেছ।'

বাবা ওর মতামতের দাম দিচ্ছে দেখে খুব ভাল লাগল আলমানযোর।

ওখান থেকে খচ্চরের ঘরে এসে অবাক হয়ে গেল আলমানযো–এ কী জানোয়ার! মনে হচ্ছে ঘোড়ার ক্যারিক্যাচার। ওটার একেবারে কাছে চলে গেল ও। হঠাৎ ওর কানের কাছে এমন বিশ্রীভাবে ডেকে উঠল ওটা যে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল ও, ভিড় ঠেলে পালিয়ে এল বাবার কাছে। সবাই হাসছে ওর দিকে চেয়ে, কিন্তু বাবা হাসল না।

'এটা একটা খচ্চর,' বলল বাবা। 'এর আগে দেখোনি কখনও। আর তুমি একাই ভয় পেয়েছ তা মনে কোরো না, এখানকার অনেকেই ভয় পেয়েছে।'

কোল্টের ঘরে গিয়েই মন খারাপ হয়ে গেল আলমানযোর। ইশ্, ওদের কোল্টগুলোর কাছে এগুলো কী! বিশেষ করে, স্টারলাইট যদি এখানে থাকত, আর কেউ কি কোনও পাত্তা পেত? কথাটা বলেই ফেলল ও বাবাকে।

'বেশ তো,' বাবা বলল, 'আগামী বছর আসুক, তারপর দেখা যাবে।'

ঘোড়া দেখা শেষ হতেই এল গরুর প্রদর্শনী। ঘুরে ঘুরে দেখল ওরা নানান জাতের আমেরিকান, ফ্রেঞ্চ ও ব্রিটিশ গরু। তারপর চেষ্টার হোয়াইট শুয়োর, মেরিনো আর কটস্‌উওল্ড ভেড়া। এসব দেখতে দেখতে খিদে লেগে গেল আলমানযোর, তাই চলে এল ওরা গির্জার ডাইনিং রুমে।

ঘর-ভর্তি লোক খাচ্ছে, টেবিলে জায়গা নেই। আরও কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে ইলাইযা জেন আর অ্যালিস রান্নাঘর থেকে ব্যস্তপায়ে প্লেট-ডিশ-বাউল আনছে। খাবারের সুগন্ধ মউমউ করছে সারা ঘরে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সীট পেয়ে গেল ওরা। তৃপ্তির সঙ্গে পেট পুরে খেয়ে নিল আলমানযো, তারপর বেরিয়ে এসে বাবার সঙ্গে বসে ঘোড়দৌড় দেখল। রয়ালকে দেখা গেল বড় কয়েকটা ছেলের সঙ্গে রেসের উপর বাজি ধরছে।

একটা-দুটো রেস দেখতে দেখতেই তিনটে বেজে গেল। বাড়ি ফিরে এল ওরা। এসেই প্রাত্যহিক কাজগুলো সেরে খেয়ে নিয়ে ঘুম। পরদিন আবার চলল

ওরা মেলায়। আরও দুদিন চলবে মেলা।

আজ সোজা তরি-তরকারি আর শস্যের শেডে চলে এল আলমানযো বাবার সঙ্গে। ঢুকেই সারি দিয়ে রাখা কুমড়োর দিকে চোখ গেল আলমানযোর। ওগুলোর সঙ্গে রয়েছে ওর কুমড়োটাও, দৈত্যের মত লাগছে ওটাকে আরগুলোর পাশে।

'ধরে নিয়ো না, যে প্রাইজ পাবেই,' বলল বাবা নিচুগলায়। 'আকৃতির চেয়ে গুণের কদর বেশি।'

যেন প্রাইজ না পেলেও কিছু এসে যায় না, এমন একটা ভাব নেওয়ার চেষ্টা করল আলমানযো। কুমড়োর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে, কিন্তু মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে নিজের কুমড়োটার দিকে না তাকিয়ে পারছে না। আলু, বীট, ওলকপি, পেঁয়াজ দেখতে দেখতে চলেছে; গম, জই, কানাডা মটর, নেভি শিম, সাদা ভুট্টা, হলুদ ভুট্টা, লাল-সাদা-নীল ভুট্টা দেখে আবার ফিরে আসছে। কুমড়োর দিকে অনেকেই তাকাচ্ছে দেখে আলমানযো ভাবল, যদি ওরা জানত যে সবচেয়ে বড় কুমড়োটা ওর!

দুপুরের খাওয়ার পর চটপট ফিরে এল সে–বিচার শুরু হবে এখন।

কোটে ব্যাজ আঁটা লোক তিনজনই বিচারক, বুঝতে পারল আলমানযো। নিচুগলায় নিজেদের মধ্যে কী আলাপ করছেন ওঁরা শুনবার উপায় নেই। সবাই চুপ।

শস্য মুঠোয় নিয়ে ওজন দেখছেন, চোখের কাছে এনে খুঁটিয়ে দেখছেন, কয়েক দানা চিবিয়ে দেখছেন। মটরশুঁটি আর শিম দু'ভাগ করে বীচি ছাড়িয়ে দেখছেন। বড় ছুরি দিয়ে ঘ্যাঁচ করে দুটুকরো করে দেখছেন আলু, পেঁয়াজ। আলুকে আবার চিকন করে কেটে আলোর দিকে তুলে দেখছেন। তারপর চিবুকে অল্পকিছু দাড়িওয়ালা, চিকন, লম্বা বিচারক পকেট থেকে বের করলেন লাল আর নীল রিবন। লালটা সেকেন্ড, আর নীলটা ফার্স্ট প্রাইজের জন্য। বিজয়ী তরি-তরকারির গায়ে লাল-নীল রিবন এঁটে দিলেন তিনি।

এতক্ষণ টু-শব্দ ছিল না কারও মুখে, এবার সবাই হাঁপ ছেড়ে এক সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। আলমানযো লক্ষ করল যারা প্রাইজ পায়নি তারা সবাই বিজয়ীকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। ও বুঝতে পারল ওর কুমড়োটা যদি প্রাইজ না পায়, ইচ্ছে না করলেও ওর অভিনন্দন জানাতে হবে বিজয়ীকে।

এইবার কুমড়োর দিকে এগোলেন বিচারকমণ্ডলী। কান আর গাল গরম হয়ে উঠল আলমানযোর। নির্বিকার ভাব বজায় রাখা মুশকিল হলো ওর পক্ষে।

কসাইদের ইয়া বড় ধারাল ছুরি সংগ্রহ করে আনলেন মিস্টার প্যাডক। প্রধান বিচারক নিলেন সেটা, তারপর ভ্যাঁচাৎ করে ঢুকিয়ে দিলেন একটা কুমড়োর ভিতর। ছুরির বাঁটে চাপ দিয়ে পুরু একটা ফালি কেটে বের করে উঁচু করে ধরলেন। অন্য বিচারকেরা পরীক্ষা করলেন কুমড়োর হলুদ অংশ, খোসার পুরুত্ব, ভিতরের ফাঁপা জায়গা আর বীচির পরিমাণ। ছোট কয়েকটা ফালি কেটে চিবিয়ে স্বাদ নিলেন।

তারপর আরেকটা কুমড়োয় ছুরি চালানো হলো। ভিড়ের চাপে বাবার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে আলমানযো। হাঁ করে শ্বাস নিতে বাধ্য হচ্ছে ও। একের

পর এক কুমড়ো কাটতে কাটতে অবশেষে আলমানযোর বিশাল কুমড়োর কাছে পৌঁছলেন প্রধান বিচারক। মাথাটা একটু যেন ঘুরছে আলমানযোর। দেখা গেল, মস্ত কুমড়োর মাঝখানের গর্তও বিরাট, অসংখ্য বীচিতে ভরা। এর মাংসটা অন্যগুলোর তুলনায় কিছুটা ফ্যাকাসে। এটা ভাল কি মন্দ জানে না আলমানযো। বিচারকেরা সবাই চিবিয়ে স্বাদ নিলেন কুমড়োটার। কিন্তু তাঁদের মুখ দেখে বোঝা গেল না স্বাদটা কেমন।

এরপর অনেকক্ষণ গোপন শলা-পরামর্শ করলেন বিচারকরা। কিছুই শুনতে পেল না ও। সরু, লম্বা প্রধান বিচারক মাথা নাড়লেন, থুতনির দাড়ি টানলেন। সবার চেয়ে হলুদ কুমড়োটা থেকে আর এক ফালি কাটলেন তিনি, আলমানযোরটার থেকেও কাটলেন এক ফালি। মুখে দিয়ে চিবালেন এক-এক করে, ফালি দুটো বাড়িয়ে দিলেন অন্যদের দিকে। অন্যেরাও স্বাদ নিলেন। মোটা বিচারক কিছু বলতেই অন্য দুজন হাসলেন।

মিস্টার প্যাডক ঝুঁকে এলেন টেবিলের উপর থেকে। 'এই যে, মিস্টার ওয়াইল্ডার! বাপ-বেটা দুজনেই উপস্থিত দেখছি? মেলা কেমন লাগছে, আলমানযো?'

কোনও মতে জবাব দিল আলমানযো। 'ভাল, সার।'

লম্বা বিচারক একটা লাল আর একটা নীল রিবন বের করে ফেলেছেন পকেট থেকে। সবাই চুপ। তিনটে মাথা এক হলো, ফিসফিস করে কথা হলো নিজেদের মধ্যে। তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন প্রধান বিচারক। একটা পিন নিয়ে নীল রিবনে গাঁথলেন তিনি, আলমানযোর কুমড়ো থেকে বেশ কিছুটা দূরে। অন্য একটা কুমড়োর উপর দুলছে ওটা। ঝুঁকলেন বিচারক, তারপর হাত লম্বা করলেন ধীরে ধীরে, তারপর ঘ্যাঁচ্ করে পিনটা ঢুকিয়ে দিলেন আলমানযোর কুমড়োর গায়ে।

বাবার হাত এসে পড়ল আলমানযোর কাঁধে। শ্বাস আবার চালু হতে আলমানযো বুঝল, এতক্ষণ দম বন্ধ করে রেখেছিল ও। খুশির একটা ঝিরঝিরে অনুভূতি সারা শরীরে। ওর হাত ঝাঁকাচ্ছেন মিস্টার প্যাডক। সব কজন বিচারক হাসছেন ওর দিকে চেয়ে। চেনা-অচেনা অনেক লোক অভিনন্দন জানাচ্ছে ওদের। 'বাহ্, মিস্টার ওয়াইল্ডার, দারুণ দেখিয়েছে আপনার ছেলেটা!'

মিস্টার ওয়েব প্রশংসা করলেন, 'চমৎকার কুমড়ো ওটা, আলমানযো। এর চেয়ে ভাল কুমড়ো জীবনে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

মিস্টার প্যাডক বললেন, 'এতবড় কুমড়ো আমিও জীবনে দেখিনি, বাবা! কী করে এত বড় করলে এটাকে, আলমানযো?'

আলমানযো বুঝতে পারল না কী জবাব দেবে। দুধ খাইয়ে বড় করেছে বললে যদি দোষ হয়? সত্যি কথা বললে যদি প্রাইজটা কেড়ে নেয়, তা হলে? ওরা হয়তো ভাববে ও ঠকিয়েছে সবাইকে।

বাবার দিকে চাইল আলমানযো, কিন্তু সেখান থেকে কোনও সাহায্য এল না।

'আমি, আমি, ভালমত নিড়ানি দিয়েছি, তারপর···' পরিষ্কার বুঝল ও মিথ্যে কথা বলছে, আর বাবা শুনছে সে-মিথ্যে। ঝট করে তাকাল ও মিস্টার প্যাডকের

দিকে। 'দুধ খাইয়ে বড় করেছি আসলে। আচ্ছা, এতে কোনও দোষ হয়নি তো?'

'না। ঠিকই করেছ ওটাকে দুধ খাইয়ে,' বললেন মিস্টার প্যাডক।

বাবা হাসল। ছেলে সত্যি কথা বলায় খুব খুশি। পরমুহূর্তে নিজের ভুলটা বুঝতে পারল আলমানযো। বাবা তো জেনে শুনেই ওটাকে দুধ খাওয়াতে বলেছিল। এটা বেআইনী হলে নিশ্চয়ই বলত না। ঠকিয়ে প্রাইজ নেওয়ার লোক তো বাবা নয়।

বাবার সঙ্গে ভিড় ঠেলে চলল আলমানযো। দেখল যে কোল্টটা প্রথম পুরস্কার পেয়েছে, স্টারলাইটের কাছে সেটা কিছুই নয়। মনে মনে স্থির করল আগামী বছর বাবাকে বলে স্টারলাইটকে নিয়ে আসবে মেলায়।

এরপর ওরা হাঁটবার প্রতিযোগিতা দেখল, লাফ দেওয়ার প্রতিযোগিতা দেখল, ছুঁড়ে মারবার প্রতিযোগিতা দেখল ঘুরে ঘুরে। বেশিরভাগ সময়ই চাষী-ছেলেরা জিতল, শহুরে ছেলেরা পারল না ওদের সঙ্গে। বারবার ঘুরেফিরে নিজের বিজয়টা মনে আসছে আলমানযোর—বুকের ভিতর শিরশির করছে চমৎকার সুখানুভূতি।

বাড়ি ফেরবার সময় জানতে পারল আলমানযো, অ্যালিসের উলের কাজও প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। ইলাইযা জেন জেলিতে পেয়েছে লাল রিবন, অ্যালিস পেয়েছে নীল। খুশি হয়ে বাবা বলল, দেখা যাচ্ছে, ওয়াইল্ডার পরিবারেরই জয়-জয়কার!

পরদিনও মেলা হচ্ছে, কিন্তু ওরা আর গেল না। দুইদিনই যথেষ্ট। নিয়ম ভাঙা একদিন ভাল লাগে, বড় জোর দুদিন—তারপর আর মজা থাকে না ওতে। নিজেদের স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরে গেল ওরা।

উনিশ

'উত্তর থেকে বইছে বাতাস,' নাস্তা খেতে খেতে বলল বাবা। 'মেঘও করেছে। সময় থাকতে বীচনাট কুড়িয়ে আনা দরকার।'

আলমানযো, রয়াল আর অ্যালিস গরম জামা পরে চলল বাবার সঙ্গে। রাস্তা দিয়ে গেলে দুই মাইল, কিন্তু মাঠের উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে গেলে মাত্র আধ মাইল। সুপ্রতিবেশী মিস্টার ওয়েবের অনুমতি নিয়ে তাঁর জমির সীমানা থেকে পাথরের প্রাচীরের একটা অংশ সরিয়ে রেখে ওয়্যাগনে করে জঙ্গলে চলে এল ওরা। মাঠ-ময়দান খালি এখন, সবার সব পশু গোলাঘরের গরমে আরাম করছে; তাই এখুনি প্রাচীরটা ঠিক করবার দরকার পড়ল না, শেষ ট্রিপে পাথরগুলো আবার সাজিয়ে দিলেই হবে।

হলুদ পাতা বিছিয়ে রয়েছে বীচ জঙ্গলের নীচে, আর সেই পাতার উপর পড়ে আছে অসংখ্য বীচনাট। সাবধানে বাদামসহ বীচপাতা ওয়্যাগনে তুলছে বাবা আর রয়াল পিচফর্ক দিয়ে; অ্যালিস আর আলমানযোর কাজ হলো ওয়্যাগনে তুলবার

পর ওগুলোর উপর দৌড়-ঝাঁপ-লাফালাফি-নাচানাচি করে সমান করা, জায়গা বাড়ানো।

ওয়্যাগন ভর্তি হয়ে গেলে বাবা আর রয়াল ওগুলো গোলাঘরে রেখে আসতে গেল। সেই সময়টুকু ওরা দুজন নানান খেলায় মেতে থাকল। খেলা ভাল না লাগলে গাছের গুঁড়িতে বসে দাঁত দিয়ে ভেঙে তিনকোনা বীচনাট খেল।

ঠাণ্ডা হাওয়া। সূর্যটা ঝাপসা। ছুটোছুটি করে বাদাম কুড়াচ্ছে চঞ্চল কাঠবিড়ালী—শীতের সঞ্চয়। আকাশ থেকে আসছে বুনো হাঁসের ডাক, ঝাঁক বেঁধে দক্ষিণে চলেছে ওরা—উত্তর জমে যাচ্ছে শীতে।

ওয়্যাগন ফিরে এলে আবার লাফ-ঝাঁপ দিয়ে উঁচু হয়ে থাকা পাতা নামায় ওরা, আর ব্যস্ত পিচফর্ক পাতা সরিয়ে সরিয়ে খালি জমির পরিমাণ বাড়ায়।

সারাদিনে যতটা পারা গেল বীচনাট সংগ্রহ করল ওরা। গোধূলি নামতে প্রাচীরের পাথর আবার সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়ে ফিরে এল ওরা। দক্ষিণ গোলাঘরে ফ্যানিং মিলের পাশে উঁচু স্তূপ হয়ে রয়েছে পাতা সহ বীচনাট।

'আজই তুষারপাত শুরু হবে মনে হচ্ছে,' বলল বাবা রাতে। 'ধরে নাও শেষ হলো গ্রীষ্মকাল।'

সত্যিই। সকালে ঘুম থেকে উঠে আলমানযো দেখল সাদা হয়ে গেছে মাঠ-ঘাট, গোলাঘরের ছাদ।

ছয় ইঞ্চি পুরু তুষার জমেছে বটে, কিন্তু জমি এখনও পুরোপুরি শক্ত হয়ে যায়নি। খুশি হলো বাবা। 'এটা হচ্ছে গরীবের সার।' রয়ালকে পাঠানো হলো খেতগুলোতে লাঙল দেওয়ার জন্য। এই সময় জমিতে লাঙল দিলে উপরের তুষার ভিতরে গিয়ে সারের কাজ করে, পরের মরসুমে ফসল ভাল হয়।

আর বাবার সঙ্গে থেকে আলমানযো গোলাঘরের জানালাগুলো ভাল করে বন্ধ করল, আলগা হয়ে যাওয়া তক্তাগুলো পেরেক মেরে আটকাল শক্ত করে। বাড়ি আর গোলাঘরের দেয়ালগুলো খড় দিয়ে ছাওয়ার পর পাথর চাপা দিল, যাতে বাতাসে উড়ে না যায়।

এসব করতে করতেই এসে গেল শীত, জমিনের উপর জমে শক্ত হয়ে গেল বরফ। এবার সারা শীতের জন্য মাংসের জোগান রাখতে হবে ঘরে। খবর দেওয়া হলো ফ্রেঞ্চ জো আর লেযি জনকে।

পরদিন খুব সকালে মস্ত এক লোহার কড়াই এনে গোলাঘরের কাছে তিনটে পাথরের উপর বসাল রয়াল আর আলমানযো। ওটাকে কানায় কানায় ভরতে তিন ব্যারেল পানি লাগল। পানি ভরে আগুন জ্বেলে দিল ওর নীচে কাঠ সাজিয়ে।

ইতোমধ্যে এসে গেছে লেযি জন আর ফ্রেঞ্চ জো। সামান্য নাস্তা খেয়েই কাজে লেগে গেল সবাই। আজ পাঁচটা শুয়োর আর একটা বাছুর জবাই হবে।

মারবার পর এক-এক করে প্রতিটা মৃতদেহ বাবা, জন আর জো মিলে বিশাল কড়াইয়ের ফুটন্ত পানিতে চুবাল, তারপর তুলে নিয়ে ফেলল পুরু তক্তার উপর। ওগুলোর গায়ের সব লোম চেঁছে পিছনের পা-দুটো বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো গাছের ডালে, তারপর ছুরি দিয়ে পেট ফেড়ে ভিতরের সবকিছু নেওয়া হলো গামলায়।

আলমানযো আর রয়াল দু'দিক থেকে ধরে নিয়ে রাখল সে-গামলা রান্নাঘরে। ওখানে দুই মেয়ে নিয়ে তৈরি হয়ে আছে মা, ঝট্‌পট্ কলিজা আর হৃৎপিণ্ড কেটে ধুয়ে আলাদা করে রাখল, চর্বি বের করে রাখল আলাদা পাত্রে–গলিয়ে সংরক্ষণ করা হবে।

বাবা আর জো সাবধানে ছাল ছাড়াল বাছুরের, এই ছাল দিয়েই জুতো তৈরি করা হবে আগামী বছর।

সারা দুপুর মাংস কাটা হলো, রয়াল আর আলমানযো সে-সব নিয়ে গিয়ে লবণ মাখিয়ে রেখে এল সেলারে। উডশেডের চিলেকোঠায় রাখা হলো হৃৎপিণ্ড, কলিজা, জিভ, পাঁজরা ইত্যাদি। বাছুরের মাংসও ঝুলিয়ে রাখা হলো ওখানে, ঠাণ্ডায় জমে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই, গোটা শীতকাল একই রকম থাকবে ওগুলো চিলেকোঠায়, যখন যেমন দরকার পেড়ে এনে ব্যবহার করা হবে।

কাজ শেষ করে মজুরি হিসেবে মাংস নিয়ে শিস দিতে দিতে বাড়ি চলে গেল ফ্রেঞ্চ জো আর লেযি জন।

দুই মেয়ে নিয়ে মা রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকল পরের পুরো একটা সপ্তাহ। মাংস, চর্বি, মগজ–কোনটা ভেজে রাখছে, কোনটা সেদ্ধ করে, কোনটা ছেঁকে; কোনটা শক্ত চাকা, কোনটা জেলির মত নরম; কোনটা চুবিয়ে রাখছে সেরকায়, কোনটা ব্র্যান্ডিতে। আলমানযোকে ধরে তাকে দিয়ে মাংস পেষানো হলো কয়েক হাজার টুকরো, সসেজ হবে ওগুলো দিয়ে। মাংস পেষার মেশিনের হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাত ব্যথা হয়ে গেল আলমানযোর। সেই মাংস সেদ্ধ করে বড় বড় 'বল্' বানাল মা, বাবার উডশেডের চিলেকোঠায় রেখে এল আলমানযো ওগুলো পরিষ্কার কাপড়ের উপর। ওখানেই জমে থাকবে গোল পিন্ডগুলো, রোজ সকালে একটা করে এনে কেটে-কুটে ভেজে দেওয়া হবে নাস্তার সময়।

এরপর শুরু হলো মোমবাতি-পর্ব। গরুর চর্বি গলিয়ে ঢালা হলো সুতো বসানো কয়েকটা টিনের টিউবের মধ্যে। আলমানযো ওগুলো ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য রেখে এল বাইরে। তারপর মোল্ডগুলো গরম পানিতে একটু চুবিয়ে টিউবটা দু'ভাগ করতেই বেরিয়ে এল কয়েকটা মোমবাতি। পুরো একটা দিন গেল মোমবাতি তৈরির কাজে। সাজিয়ে রাখা হলো সব জায়গামত। আগামী এক বছর চলবে ওদের এই মোমবাতি দিয়ে।

এ বছর মুচি আসতে দেরি করছে বলে খুব অস্থির হয়ে উঠল মা। আলমানযোর মোকাসিন ভর্তা হয়ে গেছে, রয়ালের বুটের অবস্থা তারচেয়েও খারাপ–পা বড় হয়ে যাওয়ায় জায়গায় জায়গায় চামড়া চিরে ফেলতে হয়েছে। এখন ঠাণ্ডায় পা কন্-কন্ করে, কিন্তু মুচি না আসা পর্যন্ত কিছুই করবার নেই। প্রতি বছর এই সময়ে আসে মুচি, কয়েকদিন থেকে যার যেমন পছন্দ জুতো বানিয়ে দিয়ে যায়। বড্ডো দেরি করছে লোকটা এবার আসতে।

এদিকে রয়াল, ইলাইযা জেন আর অ্যালিসের অ্যাকাডেমিতে পড়তে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। প্রত্যেকেরই জুতো বানানো একান্ত দরকার। পোশাক তৈরি করে ফেলেছে মা। রয়ালের জন্য নতুন সুট, সেই সঙ্গে গ্রেটকোট আর ফ্ল্যাপ লাগানো টুপি, চিবুকের নীচে বোতাম লাগালেই ঢাকা পড়ে কান। ইলাইযা-জেনের

জন্য বাদামী আর অ্যালিসের জন্য বেগুনি রঙের সুন্দর নতুন ড্রেস সেলাই করা সারা। ওরা দুজন এখন পুরানো কাপড়টা সেলাই খুলে উল্টে নিয়ে সেলাই করায় ব্যস্ত—এর ফলে নতুনের মত দেখাবে এগুলো, মনে হবে দুটো ড্রেস পেয়েছে ওরা এ-বছর।

প্রত্যেক সন্ধ্যায় মায়ের উলের কাঁটা দুটো তুফান বেগে চলে, ক্লিক্-ক্লিক্ শব্দ হয় মৃদু। সবার জন্য তৈরি হচ্ছে গরম মোজা। কিন্তু কোথায় মুচি!

ব্যাটা এল না তো এলই না! মেয়েদের স্কার্টে ঢাকা পড়েছে পুরানো জুতো, কিন্তু রয়াল বেচারা কোথায় লুকাবে জুতো? চমৎকার একটা সুট পরে যাবে সে অ্যাকাডেমিতে, কিন্তু জুতোর দিকে তাকালে কাটা চামড়ার ফাঁক দিয়ে সাদা মোজা দেখা যাবে। কিছুই করবার নেই।

বাবার সঙ্গে একা গোলাঘরের কাজগুলো সারল আলমানযো। রয়ালের জন্য মনটা কেমন যেন করে উঠল ওর। নাস্তার সময় দেখা গেল রয়াল, ইলাইযা জেন আর অ্যালিস পোশাক পরে তৈরি। কেউই তেমন কিছু খেতে পারল না। বাবা গেল স্লেতে ঘোড়া জুতে সামনের আঙিনায় নিয়ে আসতে, আলমানযো বড় ভাই আর বোনেদের ব্যাগগুলো নীচে এনে রাখল। অ্যালিস না গেলে ভাল হত, ভাবল ও একবার।

গাড়ি এসে দাঁড়াতেই উঠে পড়ল সবাই। অ্যাপ্রনে চোখ মুছে হাসি মুখে বিদায় দিল মা ওদের। চলতে শুরু করল স্লে। অ্যালিস ফিরে তাকিয়ে বলল, 'গুড-বাই! গুড-বাই!'

সারাটা দিন মন খারাপ থাকল আলমানযোর। মনে হলো, সবকিছু যেন থেমে আছে, সব শূন্য। বাবা-মার সঙ্গে বসে ডিনার খেল ও একা। সন্ধ্যার বেশ একটু আগে থেকেই গোলাবাড়ির কাজ শুরু হলো রয়াল নেই বলে। কাজ সেরে বাড়ি ফেরবার কোন তাগিদ বোধ করল না ও আজ। কারণ গিয়ে দেখবে অ্যালিস নেই। মন খারাপ লাগছে আজ ইলাইযা জেনের জন্যও।

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে চেষ্টা করল ও পাঁচ মাইল দূরে ওরা কে কী করছে।

পরদিনই হাসতে হাসতে ঢুকল মুচি।

তিন সপ্তাহ দেরি করে আসায় মা প্রথমে খুব বকাবকি করল ওকে। কিন্তু জানা গেল দোষটা ওর নয়, এক বিয়ে-বাড়িতে ওকে আটকে রাখা হয়েছিল অনেকগুলো জুতো বানিয়ে দেওয়ার জন্য।

মুচি লোকটা মোটাসোটা, হাসিখুশি, আমোদপ্রিয়। খাবার ঘরের জানালার পাশে নিজের কাজের বেঞ্চ বসিয়ে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে তৈরি হয়ে নিল, ডিনার খেয়েই লেগে পড়বে কাজে। গত বছরের ট্যান করা চামড়া এনে দিল বাবা, কীভাবে কী তৈরি হবে বুঝিয়ে দিল।

ডিনারের সময় মজার মজার খবর শোনাল মুচি, হাসির গল্প বলল, অকুণ্ঠ প্রশংসা করল মায়ের রান্নার, এমন সব রসাল কৌতুক শোনাল যে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল বাবা, হাসতে হাসতে পানি এসে গেল মায়ের চোখে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে জানতে চাইল মুচি কার জুতো দিয়ে শুরু করবে কাজ।

বাবা বলল, 'আমার মনে হয় আলমানযোর জন্যে একজোড়া বুট দিয়ে শুরু করতে পারো।'

অবাক হয়ে গেল আলমানযো, বলে কী! ওর বহুদিনের শখ বুট পরে, কিন্তু এত দ্রুত বাড়ছে ওর পা যে ভেবেছিল এবছরও মোকাসিনই পরতে হবে।

'ওকে মাথায় তুলছ তুমি, জেম্‌স্,' মা আপত্তি করল।

'কীভাবে?' প্রশ্ন করল বাবা, 'আমার তো মনে হয় বুট পরার বয়স হয়ে গেছে ওর।'

পুলকিত আলমানযো মোকাসিন আর মোজা খুলে একটা কাগজে পা রাখল, মুচি তার লম্বা পেনসিল দিয়ে ছবি এঁকে নিল পায়ের, তারপর কোন্‌দিকে কয় ইঞ্চি লিখে ফেলল মাপ-জোখ করে।

ব্যস, আলমানযোকে আর ওর দরকার নেই। কাজেই বাবার সঙ্গে গোলাবাড়ির কাজে লেগে গেল আলমানযো। পরদিন সকালে ওর বুটের সোল কাটা হলো চামড়ার ঠিক মাঝখান থেকে, ভিতরের সোল কাটা হলো কিনারের পাতলা চামড়া থেকে, উপরের অংশ কাটা হলো সবচেয়ে নরম চামড়া থেকে। তারপর সেলাইয়ের সুতোয় মোম ঘষতে শুরু করল মুচি। এইবার শুরু হবে সেলাই।

বুট জোড়া তৈরি হয়ে গেলে পায়ে দিয়ে হেঁটে দেখল আলমানযো। চমৎকার ফিট্ করেছে পায়ে। বেশ গটমট আওয়াজ হচ্ছে হাঁটলে। মনের খুশি আর চাপতে পারছে না আলমানযো, হাসি এসে যাচ্ছে সামান্য কথায়।

শনিবার ম্যালোনে গিয়ে অ্যালিস, রয়াল আর ইলাইযা জেনকে নিয়ে এল বাবা। খুশি মনে ওদের জন্য নানান রকম খাবার তৈরি করল মা, বারবার গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল আলমানযো অ্যালিস আসবে বলে।

এক বিন্দু বদলায়নি অ্যালিস, বাগি থেকে নামবার আগেই চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, আলমানযো! নতুন বুট পরেছ তুমি!'

চমৎকার একজন মহিলা হওয়ার শিক্ষা নিচ্ছে ও অ্যাকাডেমিতে, গান শিখছে, আচার-আচরণ শিখছে—কিন্তু বাড়ি ফিরতে পেরে ওর আনন্দের সীমা নেই।

ইলাইযা জেনের কথাবার্তা আগের চেয়েও কর্কশ। প্রথমেই বলল, আলমানযোর বুটে আওয়াজ বেশি।

রয়াল কোনও কথায় গেল না। পুরানো কাপড় গায়ে দিয়ে লেগে গেল দৈনন্দিন কাজে। কিন্তু আলমানযোর মনে হলো কাজ থেকে ওর মন উঠে গেছে। ওই রাতেই বিছানায় উঠে রয়াল জানাল, ও আসলে শহরে একটা দোকান দিতে চায়।

'আমার মনে হয়, মস্ত বোকামি করবে তুমি, যদি চাষাবাদের পেছনে জীবনটা নষ্ট করো,' বলল ও।

'ঘোড়া ভাল লাগে আমার,' আলমানযো বলল।

'আরে দূর! দোকান-মালিকেরও ঘোড়া থাকে,' জবাব দিল রয়াল। 'প্রতিদিন সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে ওরা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, গাড়ি হাঁকায়। দোকান ভাল চললে এমন কী কোচম্যানও রাখে।'

কিছু বলল না আলমানযো, তবে পরিষ্কার জানে, কোচম্যানের ওর কোনও দরকার নেই। কোল্টগুলোকে ট্রেনিং দেবে, পোষ মানাবে, তারপর নিজের ঘোড়া নিজে দাবড়াবে।

পরদিন একসঙ্গে গির্জায় গেল ওরা। রয়াল, ইলাইযা জেন আর অ্যালিসকে অ্যাকাডেমিতে নামিয়ে দিয়ে শুধু মুচিকে নিয়ে ফিরে এল খামারে।

সবার মাপ নিয়ে নিয়েছে, তাই কোনও অসুবিধে হলো না; ডাইনিংরুমের বেঞ্চে বসে মনের আনন্দে শিস দিল আর একটার পর একটা জুতো বানিয়ে চলল লোকটা। চোদ্দ দিন পর সবার জুতো বানিয়ে দিয়ে যন্ত্রপাতি গুটিয়ে নিয়ে যখন চলে গেল, তখন আবার সুনসান হয়ে গেল বাড়িটা।

সেই সন্ধ্যায় বাবা বলল, 'কাল স্টার আর ব্রাইটের জন্যে একটা বব-স্লেড বানালে কেমন হয়?'

'সত্যিই?' লাফিয়ে উঠল আলমানযো। 'আমি কি···তুমি কি এবার জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনতে আমাকেও নেবে?'

ঝিকমিক করে উঠল বাবার চোখ দুটো। 'তা ছাড়া আর কী করবে তুমি বব-স্লেড দিয়ে?'

বিশ

পরদিন জঙ্গলে গিয়ে সোজা দেখে ছোটখাট একটা ওক গাছ কাটল বাবা, ছোট ডালগুলো ছেঁটে দিতেই সুন্দর করে গুছিয়ে আঁটি বাঁধল আলমানযো। তারপর দেখে শুনে রানারের জন্য দুটো বাঁকা গাছ কাটল বাবা—পাঁচ ইঞ্চি মোটা আর ছয় ফুটের পর যেগুলো বাঁক নিয়েছে।

সব কাঠ বড় বব-স্লেডে তুলে নিয়ে ওরা বাড়ি ফিরে এল। তারপর ডিনার সেরে দুজন মিলে বড় গোলাঘরটায় বসে বানাল ছোট্ট একটা সুন্দর বব-স্লেড। খুশিতে, গর্বে লাফাতে ইচ্ছে করল আলমানযোর, কিন্তু বাবার সামনে ওটা করা যায় না বলে অনেক কষ্টে দমন করল নিজেকে।

সন্ধ্যা হয়ে এল বব-স্লেড তৈরি করতে করতে। কাজটা শেষ করে পশুদের খাওয়া-দাওয়া আর ঘর পরিষ্কারের কাজ সেরে, দুধ দুইয়ে, ভরা বালতি নিয়ে যখন ঘরে ফিরবে বলে গোলা-প্রাঙ্গণে বেরোল ওরা, তখন জোর বাতাস উঠেছে। ঘুরপাক খাচ্ছে তুষার, বিষণ্ন কান্নার মত শোনাচ্ছে বাতাসের বিলাপ।

পড়ুক, আরও তুষার পড়ুক—ভাবছে আলমানযো, শীঘ্রিই নতুন বব-স্লেড নিয়ে কাঠ কেটে আনতে যাবে ও বাবার সঙ্গে। কিন্তু ঝড়ের মতিগতি দেখে বাবা বলল, আগামী কয়েক দিন ঘরের বাইরে কোনও কাজ করা যাবে না; কাজেই কাল থেকে গম মাড়াই শুরু করবে ওরা।

'আচ্ছা, মেশিনে মাড়াই করলে কি গমের ক্ষতি হয়?' জানতে চাইল

আলমানযো। শহরে মেশিন এসেছে ও শুনেছে।

'কিছুটা হয়,' বলল বাবা। 'তবে আসল ক্ষতি হয় খড়ের, ওগুলো আর গরু-বাছুরকে খাওয়ানোর উপযুক্ত থাকে না। আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি। মেশিন হচ্ছে অলস লোকের জন্যে। হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি হয় ঠিকই, কিন্তু আমাদের তাড়াটা কোথায়? এই ধরো, আগামী কয়েকটা দিন বাইরে কোন কাজ নেই; গম মাড়াইয়ের কাজটা হাতে না থাকলে বসে বসে আঙুল ফোটানো ছাড়া আর কিছু করবার থাকত আমাদের?'

'ঠিক।' মাথা ঝাঁকাল আলমানযো, 'নিজেরা করাই সব দিক দিয়ে ভাল।'

পুরোটা শীতকাল ধরে যখনই আবহাওয়া খারাপ থাকবে, তখনই গম, জই, কানাডা মটর, যব এসব মাড়াইয়ের কাজ চলবে, ফ্যানিং মিলের হাতল ঘোরাবে আলমানযো, হপারের ভিতর বাবা ঢালবে শস্য; প্রবল বাতাসে খোসা বেরিয়ে যাবে সামনের মুখ দিয়ে, নীচে পড়বে পরিষ্কার শস্যের দানা।

খেতে মই দিয়েছে আলমানযো, আগাছা পরিষ্কার করেছে, ফসল বুনেছে; তারপর ফসল তুলেছে ঘরে, এখন মাড়াই করছে। নিজেকে পরিপূর্ণ একজন মানুষ মনে হলো ওর।

ক্ষুধার্ত গরু, ঘোড়া, ভেড়া, শুয়োর, মুরগি—সবাইকে খাওয়াচ্ছে; আর বলতে ইচ্ছে করছে: আমার উপর নির্ভর করতে পারো তোমরা, আমি বড় হয়ে উঠছি, কোনদিন কোনও কষ্ট হবে না তোমাদের!'

বড়দিনের ছুটিতে বাড়ি ফিরে এল রয়াল, ইলাইযা জেন আর অ্যালিস। এসেই কাজে লেগে গেল সবাই, কারণ এবারের ক্রিসমাসে আঙ্কেল অ্যানড্রু, আন্ট ডেলিয়া, আঙ্কল ওয়েসলি, আন্ট লিন্ডি তাদের বাচ্চা-কাচ্চা সবাইকে নিয়ে বেড়াতে আসছে। দুপুরের ডিনারে সারা বছরের সেরা খাবারের বন্দোবস্ত হবে।

মেয়েরা বাড়ি-ঘর পরিষ্কারের কাজে লেগেছে, মা হরেক পদের রান্না নিয়ে ব্যস্ত। রয়াল গেছে বাবার সঙ্গে মাড়াইয়ের কাজে, আলমানযোকে রেখে দিয়েছে মা ফাই-ফরমাশ খাটবার জন্য।

স্টীলের চামচ, কাঁটা, ছুরি ঘষে মেজে পরিষ্কার করা, রুপোর প্লেট, তস্তরি, ডিশ পালিশ করে চকচকে করা—এসবের ভার পড়েছে ওর উপর। একটা অ্যাপ্রন গায়ে চড়িয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে ও। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই মোজার ভিতর পাওয়া যাবে বড়দিনের উপহার। ভাল হয়ে চললে ভাল উপহার পাওয়া যায়, নইলে নাকি মোজার ভিতর থাকে ছোট্ট একটা কাঠের টুকরো।

রান্নাঘর থেকে এতই সুগন্ধ আসছে যে পানি এসে যাচ্ছে জিভে। পাউরুটি সেঁকে বের করে রাখা হয়েছে ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য, সেই মনোহর গন্ধের সঙ্গে মিশেছে কেক-বিস্কিট আর হরেক জাতের পিঠে-পুলির সুগন্ধ। আস্ত একটা রাজহাঁসের ভিতর বাইরে পুরু করে মশলা মাখাচ্ছে মা, সম্ভবত রোস্ট করা হবে ওটাকে।

একমনে কাজ করে চলেছে আলমানযো, তারই ফাঁকে ফাঁকে ছুটতে হচ্ছে চিলেকোঠা থেকে তেজপাতা বা গরম মশলা নিয়ে আসবার জন্য। পরমুহূর্তে

হয়তো ছুটতে হলো তলকুঠুরি থেকে আপেল আনতে, তারপর আবার ছোটো চিলেকোঠায় পেঁয়াজ আনতে। এরপরই আবার ঠাণ্ডার মধ্যে বেরিয়ে একদৌড়ে পানি আনতে হবে পাম্প থেকে বালতি ভরে। সব কাজ সেরে উঠে দাঁড়িয়েছে, এমনি সময় আদুরে গলায় মা বলল, 'বাবা আলমানযো, স্টোভটা একটু পালিশ করে দাও তো।'

ঘর-বাড়ি ঝকঝকে-তকতকে, সবাই ক্লান্ত, ঘুমে ভেঙে আসছে চোখ। রাতের খাওয়া হয়ে যেতেই মশলা মাখানো রাজহাঁস আর ছোট্ট একটা শুয়োর রাতভর ধীরে ধীরে রোস্ট হওয়ার জন্য ঢুকিয়ে দেওয়া হলো হীটারের সঙ্গের চুলোয়। ঘড়িতে চাবি দিল বাবা হাই তুলে। আলমানযো আর রয়াল দুটো পরিষ্কার মোজা ঝুলিয়ে রাখল একটা চেয়ারের পিঠে, আরেকটা চেয়ারের পিঠে ওদের মোজা ঝুলিয়ে রাখল অ্যালিস আর ইলাইযা জেন।

তারপর মোম হাতে সিঁড়ি বেয়ে চলে গেল সবাই যে-যার বিছানায়।

খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে ঘুম ভেঙে গেল আলমানযোর। ভিতরে কেমন যেন একটা উত্তেজনা—হঠাৎ মনে পড়ল, আরে, আজ তো ক্রিসমাসের সকাল! লেপ সরিয়েই লাফিয়ে পড়ল ও জ্যান্ত কিছুর উপর, ককিয়ে উঠল রয়াল। রয়াল যে পাশে আছে ভুলেই গিয়েছিল ও। ওর উপর দিয়ে আছড়ে-পাছড়ে নেমে গেল আলমানযো, গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে, 'ক্রিসমাস! ক্রিসমাস! মেরি ক্রিসমাস!'

নাইট শার্টের উপর প্যান্ট পরে নিল ও। রয়ালও খাট থেকে লাফিয়ে নেমে একটা মোম জ্বালল। এক থাবা দিয়ে ওটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুটল আলমানযো সিঁড়ির দিকে।

'আরে! কী করো! আমার প্যান্ট গেল কই?'

আলমানযো ততক্ষণে নেমে গেছে অর্ধেক সিঁড়ি। অ্যালিস আর ইলাইযা জেনও ছুটে বেরিয়ে এসেছে ওদের ঘর থেকে, কিন্তু আলমানযোর সঙ্গে দৌড়ে পারল না। দূর থেকেই দেখা গেল মোটাসোটা হয়ে ঝুলছে ওর মোজাটা। একটা মোমদানিতে মোমটা দাঁড় করিয়েই তুলে নিল ও মোজা। প্রথমেই বেরুল চমৎকার একটা কানঢাকা টুপি! মেশিনে সেলাই করা দারুণ একখানা টুপি, চিবুকের নীচ থেকে বোতাম খুলে কানের ঢাকনাটা মাথার উপর তুলে রাখা যায় বোতাম এঁটে।

মনের আনন্দে চিৎকার ছাড়ল আলমানযো। এত সুন্দর টুপি পাবে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি ও। উল্টে-পাল্টে ভিতরটা দেখল ও, বাইরেটা দেখল, মসৃণ লাইনিঙে আঙুল বুলিয়ে দেখল; তারপর মাথায় পরল ওটা। একটু বড় হলো মাথায়, ভালই হলো, ও তো বাড়ছে, অনেকদিন পরা যাবে এই টুপি।

ইলাইযা জেন আর অ্যালিসও নিজ নিজ মোজার ভিতর হাত পুরে চিঁহি-চিঁহি ডাক ছাড়ছে। রয়াল পেয়েছে একটা সিল্কের মাফলার, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে খুশিতে। মোজার ভিতর আবার হাত ঢুকাল আলমানযো, বেরিয়ে এল দামী একটা হোরহাউন্ড ক্যান্ডি। একটা কাঠির শেষ প্রান্তে কামড় দিল ও। বাইরেটা নরম, কিন্তু ভিতরে শক্ত—অনেকক্ষণ ধরে মজা করে খাওয়া যাবে।

এরপর বেরোল একজোড়া নতুন দস্তানা, তারপর একটা কমলা, তারপর এক

প্যাকেট শুকনো ডুমুর। আরিব্বাপ! এত উপহার? ওর মনে হলো কেউ কোনদিন এত ভাল ভাল উপহার পায়নি ক্রিসমাসে। যা পেয়েছে এ-ই শেষ মনে করেছিল ও, কিন্তু মোজার গোড়ালির কাছে আছে আরও কী যেন! ছোট, পাতলা, শক্ত মত কী যেন। কী হতে পারে, ভাবতে ভাবতে বের করে আনল ও জিনিসটা।

আরি সর্বনাশ! জ্যাক-নাইফ! চার ব্লেডের একটা জ্যাক-নাইফ!

চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে ফেলল আলমানযো। সব কটা ফলা খুলে দেখল—ঝকঝকে, ধার! উফ্, এত আনন্দ রাখবে কোথায় ও।

'দেখো, অ্যালিস! রয়াল, দেখো! দেখো, দেখো আমার জ্যাক-নাইফ!'

বাবার গলা ভেসে এল উপর থেকে: 'তার আগে ঘড়িটা দেখো!'

থমকে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, রয়াল মোমবাতিটা তুলে ধরতে সবাই তাকাল ঘড়ির দিকে। সাড়ে তিনটে বাজে।

ইলাইযা জেন পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে গেল, কী বলবে বুঝে পেল না। দেড় ঘণ্টা আগেই হৈ-চৈ করে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে ওরা বাবা-মার।

'কয়টা বাজে?' জানতে চাইল বাবা।

আলমানযো তাকাল রয়ালের দিকে। রয়াল তাকাল ইলাইযা জেনের দিকে। ইলাইযা জেন ঢোক গিলে মুখ খুলতে গেল, কিন্তু তার আগেই অ্যালিস বলল, 'মেরি ক্রিসমাস, বাবা! মেরি ক্রিসমাস, মা! এখন···এখন চারটে বাজতে তিরিশ মিনিট বাকি, বাবা।'

ঘড়িটা বলে চলেছে, 'টিক! টক! টিক! টক! টিক···!'

বাবার চাপা হাসি শোনা গেল।

হীটারের তাপ বাড়িয়ে দিল রয়াল ড্যাম্পার খুলে, ইলাইযা জেন রান্নাঘরের চুলো ধরিয়ে কেতলি চড়িয়ে দিল। গরম হয়ে উঠল বাড়িটা। নেমে এল বাবা-মা। পুরো একটা ঘণ্টা বাড়তি সময় পাওয়া গেছে উপহারগুলো উপভোগ করবার জন্য।

অ্যালিস পেয়েছে একটা সোনার লকেট, ইলাইযা জেন পেয়েছে গার্নেটের একজোড়া কানের দুল। মার হাতে বোনা নতুন লেস্ কলার আর কালো লেস লাগানো দস্তানাও পেয়েছে ওরা দুজন। রয়াল সিল্কের মাফলার ছাড়াও পেয়েছে সুন্দর একটা চামড়ার মানিব্যাগ। কিন্তু আলমানযোর ধারণা সবার সেরা উপহার পেয়েছে ও-ই। এমন ক্রিসমাস আর হয় না!

একটু পরেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠল মা, তাড়া দিতে শুরু করল সবাইকে। গোলাবাড়ির কাজ সারতে হবে, দুধ জ্বাল দিতে হবে, নাস্তা সেরেই তরকারি কুটতে হবে, পুরো বাড়িটা ধোপ-দুরস্ত করে মেহমান পৌঁছানোর আগেই জামা-কাপড় পরে তৈরি হয়ে নিতে হবে।

সূর্য উঠে পড়ল। চরকির মত ঘুরছে মা সবখানে, কথা বলছে অনর্গল। 'আলমানযো, কান দুটো ধুয়ে ফেলো। আহ্-হা, রয়াল, পায়ে পায়ে ঘুরো না তো! ইলাইযা জেন, খেয়াল রাখো, আলুগুলো কুটছ না তুমি—কাটছ। আর আলুর চোখ বেরিয়ে থাকছে কেন, দেখতে পেলে তো লাফিয়ে চলে যাবে পেয়ালা থেকে। আর অ্যালিস, বাসনগুলো গুনে ফেলো, তার সঙ্গে মিলিয়ে ছুরি-কাঁটা-চামচ আলাদা

করে রাখো। ভাল টেবিলক্লথগুলো নীচের শেল্‌ফে। আয়-হায়! ঘড়ি দেখো!'

স্লে-বেলের আওয়াজ কানে আসতেই দড়াম করে চুলোর দরজা বন্ধ করে ছুটল মা অ্যাপ্রন ছেড়ে ক্রচটা পরে আসবার জন্য। অ্যালিস দৌড়াল নীচের দিকে, ইলাইযা ছুটল উপর দিকে–দুজনেই আলমানযোকে কলার সোজা করতে বলল। ওদিকে মাকে ডাকছে বাবা গলাবন্ধটা লাগিয়ে দেওয়ার জন্য। এমনি সময়ে আঙ্কেল ওয়েসলির স্লে-টা থেমে দাঁড়াল, ঝাঁকি খেয়ে অনেকগুলো ঘণ্টা বেজে উঠল এক সঙ্গে।

দৌড়ে বেরিয়ে গেল আলমানযো, ওর পেছন পেছন এমন ভঙ্গিতে ধীরে সুস্থে বেরোল বাবা-মা, যেন তাড়াহুড়ো কাকে বলে জানেই না। ফ্র্যাঙ্ক, ফ্রেড, অ্যাবনার আর ম্যারি নেমে এল স্লে থেকে। আন্ট লিন্ডি নামবার আগে বাচ্চাটাকে মার কোলে দিচ্ছে, এমন সময় পৌঁছে গেল আঙ্কল অ্যানড্রুর স্লে। আঙিনা ভর্তি হয়ে গেল ছেলেতে, আর বাড়ি ভর্তি হয়ে গেল হুপস্কার্টে। আঙ্কল দুজন মাটিতে পা ঠুকে তুষার ঝরাল বুট থেকে, তারপর মাফলার খুলল।

রয়াল আর চাচাত ভাই জেম্‌স্ বাগি-হাউসে নিয়ে গেল স্লে দুটোকে; ঘোড়া খুলে স্টলে ঢোকাল, ঘষে দিল ওদের তুষারে হিম লাগা পাগুলো।

নতুন টুপি মাথায় দিয়ে চাচাত ভাইদের নিজের জ্যাক-নাইফ দেখাল আলমানযো। ফ্র্যাঙ্কের টুপিটা পুরানো হয়ে গেছে এতদিনে। ওর অবশ্য জ্যাক-নাইফ আছে একটা, কিন্তু ওটার ফলা মাত্র তিনটে। সবাইকে নিয়ে গিয়ে স্টার আর ব্রাইটকে দেখাল ও, নিজের ছোট্ট বব-স্লেডটাও দেখাল, লুসির পিছন দিকটা গমের শিস দিয়ে চুলকানোর অনুমতি দিল। তারপর বলল, যদি চুপ করে থাকে তা হলে স্টারলাইটকেও দেখাতে পারে।

সবাই মিলে গেল ঘোড়ার স্টলে। এগিয়ে আসছিল স্টারলাইট, কিন্তু বারের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে ফ্র্যাঙ্ক ওকে ধরতে যেতেই চট্ করে সরে গেল।

'ওকে ধরতে গেলে কেন?' বিরক্ত হলো আলমানযো।

'বাজি ধরে বলতে পারি ভেতরে গিয়ে ওর পিঠে ওঠার সাহস তোমার নেই!' চ্যালেঞ্জ করল ফ্র্যাঙ্ক।

'সাহস আছে, কিন্তু বোকার মত কাজ আমি করতে যাব কেন? নষ্ট হয়ে যাবে চমৎকার কোল্টটা।'

'নষ্ট হবে কী রকম?' বিদ্রূপ করল ফ্র্যাঙ্ক, 'আসলে বলো, ভয় পাচ্ছ তুমি। অতটুকু একটা ঘোড়ার বাচ্চাকে ভয় পাচ্ছ তুমি।'

'ভয় কেন পাব? বাবার বারণ আছে।'

'বারণ থাকলেও আমার ইচ্ছে করলে আমি কাজটা করতামই করতাম। লুকিয়ে হলেও।'

এর প্রত্যুত্তরে কোন কথা বলল না আলমানযো। এবার ফ্র্যাঙ্ক বেড়া বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল–ওপারে গিয়ে ঘোড়ায় চড়বে।

'নামো ওখান থেকে!' বলেই ফ্র্যাঙ্কের পা চেপে ধরল আলমানযো। 'ভয় পাবে কোল্টটা!'

'ভয় দেখাতেই তো যাচ্ছি!' পা ঝাড়া দিল ফ্র্যাঙ্ক। স্টলময় দৌড়ে বেড়াচ্ছে

স্টারলাইট। রয়ালকে ডাকবার জন্য চেঁচাতে গিয়েও মুখ বন্ধ করে ফেলল ও, কারণ এখন চিৎকার দিলে আরও ভয় পেয়ে যাবে স্টারলাইট।

দাঁতে দাঁত চেপে গায়ের জোরে টান মারল আলমানযো। হড়-হড় করে নেমে এল ফ্র্যাঙ্ক। চমকে উঠে লাফ দিল সবকটা ঘোড়া, স্টারলাইট পিছাতে গিয়ে ধাক্কা খেল খাবারের গামলায়।

'চাবকে পিঠের ছাল তুলে নেব, ব্যাটা!' বলল ফ্র্যাঙ্ক উঠে দাঁড়িয়ে।

'চেষ্টা করে দেখো না কেন?' জবাব দিল আলমানযো।

গোলমাল শুনে দক্ষিণ গোলাঘর থেকে দৌড়ে এল রয়াল। আলমানযো আর ফ্র্যাঙ্কের কাঁধ ধরে ঠেলে বের করে দিল গোলাবাড়ি থেকে। ফ্রেড, অ্যাবনার আর জন চুপচাপ অনুসরণ করল ওদের।

'আবার যদি কোল্টগুলোর কাছে তোমাদের দেখি,' চোখমুখ পাকিয়ে বলল রয়াল, 'বাবাকে আর আঙ্কেল ওয়েসলিকে বলব আমি। পিঠের চামড়া তুলে নেবে! সাবধান!'

প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকাল ও দুইজনকে, তারপর ঠুকে দিল দুটো মাথা। অনেকগুলো তারা দেখতে পেল আলমানযো–ফ্র্যাঙ্কের অবস্থাও তথৈবচ।

'ক্রিসমাসের দিনে মারপিট! অ্যাঁ? লজ্জা করে না তোমাদের?'

'আমি তো ওকে শুধু বারণ করছিলাম, যেন স্টারলাইটকে ভয় না দেখায়…'

'শাট আপ্!' ধমক দিল রয়াল। 'এখন একটু ভদ্র হয়ে চলো, নইলে কপালে দুঃখ আছে! যাও, হাত ধুয়ে নাও সবাই, ডিনারের সময় হয়ে গেছে।'

হাত ধুয়ে নিল সবাই রান্নাঘরে গিয়ে।

মা, আন্ট আর চাচাত বোনেরা টেবিল সাজাচ্ছে, নানান রকম খাবারে বোঝাই হয়ে গেছে টেবিল। নিজস্ব আলাদা আলাদা সুগন্ধ ছাড়ছে একেকটা ডিশ।

মাথা নিচু করে চোখ বন্ধ করল আলমানযো–বাবা প্রার্থনা করছে। ক্রিসমাস ডে বলে প্রার্থনাটাও দীর্ঘ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত থামতেই হলো বাবাকে। চোখ মেলে টেবিলের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত দেখল আলমানযো।

আরি সর্বনাশ! মুখে আপেল নিয়ে বসে আছে রোস্ট করা ছোট্ট শুয়োরটা মস্ত নীল প্লেটের উপর। রাজহাঁসের রোস্টটাও লোভনীয় ভঙ্গিতে বসে আছে একটা ডিশে। ছুরিটা ধার করে নিচ্ছে বাবা পাথরে ঘষে।

ক্র্যানবেরি জেলি আর ম্যাশ্‌ড্ পটেটোর পাহাড়ের গা থেকে গলতে গলতে নামা মাখনের দিকে চাইল আলমানযো। শালগমের ভর্তার পাহাড়টার দিকে তাকাল ও, তারপর দেখল ভাজা গাজরগুলোর দিকে।

ঢোক গিলে মনস্থির করল ও, আর কোনদিকে তাকাবে না। কিন্তু পেঁয়াজ দিয়ে ভাজা আপেল আর গাজরের হালুয়ার দিকে না তাকিয়ে পারল না। তা ছাড়া হাতের কাছেই রয়েছে নানান জাতের পিঠে, না তাকিয়ে পারাও তো যাচ্ছে না।

বড়দের দেওয়া হবে সবার আগে। ছোট হয়ে আসছে রাজহাঁস আর শুয়োরের রোস্ট। ঘ্যাঁচাঘ্যাঁচ কাটছে আর মেহমানদের প্লেটে তুলে দিচ্ছে বাবা সব। আলু ভর্তা আর ক্র্যানবেরি জেলির পাহাড় ছোট হয়ে যাচ্ছে বিপজ্জনক হারে।

ছোট বলে অপেক্ষা করতে হলো আলমানযোকে, সবার শেষে ওর প্লেটে

দেওয়া হলো খাবার। তবে তৃপ্তির সঙ্গে খেল ও। ফ্রুট কেকের দ্বিতীয় টুকরোটা আলগোছে পকেটে ফেলে বাইরে চলে গেল খেলতে।

তুষার-দুর্গ খেলা হবে এবার। রয়াল আর জেম্‌স্, দল গড়ছে। ফ্র্যাঙ্ক গেল রয়ালের দলে, আলমানযোকে নিল জেম্‌স্। তুষারের বল বানিয়ে ওটাকে গভীর তুষারের উপর গড়িয়ে গড়িয়ে মস্ত কয়েকটা বল তৈরি করল দুই পক্ষ মিলে, তারপর সেগুলোকে একটা দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে, আরও তুষার দিয়ে ফাঁক-ফোকর ঠেসে বন্ধ করে দুর্গ বানিয়ে ফেলল ওরা। তারপর একেক দল কয়েক ডজন করে তুষারের শক্ত গোলা তৈরি করে ফেলল। তুষারের উপর নিঃশ্বাস ফেলে দুই হাতে চাপ দিলেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে গোলা। যুদ্ধ শুরু হবে একটু পরেই। একটা ছড়ি আকাশে ছুঁড়ে দিল রয়াল, ওটা নেমে আসতেই ধরল খপ্ করে। রয়াল যেখানটায় ধরে আছে তার উপরের অংশে ছড়িটা ধরল জেম্‌স্, তারপর ছড়িটা ছেড়ে দিয়ে রয়াল আবার ধরল জেম্‌স্ যেখানটা ধরে আছে তার উপরের অংশ। এইভাবে ছড়িটার শেষ মাথা পর্যন্ত চলল। দেখা গেল জেম্‌স্ ধরেছে ছড়ির সর্বশেষ অংশ, কাজেই দুর্গটা জেম্‌সের দলের।

শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। সাঁই-সাঁই ছুটছে গোলা। গোলার আঘাত থেকে বাঁচবার জন্য কখনও একপাশে সরছে, কখনও নিচু হচ্ছে আলমানযো, হাঁক ছাড়ছে কোমাঞ্চিদের মত, ছুঁড়ছে গোলা। দেয়ালের উপর দিয়ে দলবল নিয়ে আক্রমণ করে বসল রয়াল। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে ফ্র্যাঙ্ককে টেনে নামাল আলমানযো নীচে। গড়াগড়ি করতে করতে গভীর তুষারের মধ্যে চলে এল ওরা, দুই হাত চালাচ্ছে দুজন দুজনের বিরুদ্ধে গায়ের জোরে।

নাকে-মুখে তুষার ঢুকে গেল আলমানযোর, তবু ও ছাড়ছে না ফ্র্যাঙ্ককে। ফ্র্যাঙ্ক ওকে ফেলে দিল নীচে, কিন্তু কিলবিল করে ওর নীচ থেকে বেরিয়ে গেল আলমানযো। উঠে বসতে গিয়ে ফ্র্যাঙ্কের মাথা ঠুকে গেল আলমানযোর নাকে। রক্ত পড়ছে, কিন্তু পরোয়া না করে ল্যাঙ মেরে ফেলে দিল ও ফ্র্যাঙ্ককে, তারপর ওর উপর চড়ে বসে বৃষ্টির মত ঘুসি চালাল। চিৎকার করে বলছেঃ হার মানো! হার মানো!

আলমানযোর নীচ থেকে বেরোবার চেষ্টা করছে ফ্র্যাঙ্ক, ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে ওকে। কিন্তু পাথরের মত জমে বসে থাকল আলমানযো ওর বুকের উপর, মুখটা ঠেসে দাবিয়ে দিচ্ছে তুষারের গভীরে। বিপদ বুঝে হার মানল ফ্র্যাঙ্ক, চিঁচি করে বললঃ মানছি, মানছি! ছাড়ো!

মা এসে দাঁড়াল দরজায়, চেঁচিয়ে বলল, 'যথেষ্ট খেলা হয়েছে, এবার ঘরে চলে এসো তোমরা সবাই।'

ঘরে এসে আপেল খেল ওরা, গ্লাসে ঢেলে নিল সাইডার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মহিলারা ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হলো, বড় ছেলেমেয়েদের তাড়া লাগাল, শাল দিয়ে জড়িয়ে নিল কচি বাচ্চাদের, যে-যার স্লেতে উঠে কোলে টেনে নিল ল্যাপ-রোব। সবার কণ্ঠে তখন, 'গুড-বাই! গুড বাই!'

টুং-টাং ঘণ্টাধ্বনি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূরে। ফুরিয়ে গেল ক্রিসমাস।

একুশ

জানুয়ারির প্রথম দুই সপ্তাহ গেল জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনতে। শীতকালীন স্কুলে ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে, কিন্তু আলমানযোকে যেতে হলো না।

বাবা যেমন দুজন সহকারী সঙ্গে করে বড় বড় গাছের কাণ্ড বব-স্লেডে তুলে নিয়ে আসছে, আলমানযোও তেমনি ওর দুই সহকারী পিয়েখ আর লুইকে নিয়ে গাছের অপেক্ষাকৃত হালকা অংশ ওর ছোট্ট বব-স্লেডে তুলে বাড়ি নিয়ে আসছে।

প্রথম প্রথম স্টার আর ব্রাইটকে বাগে আনতে কষ্ট হলো। গত শীতের শিক্ষা ওরা প্রায় ভুলেই গেছে। তা ছাড়া গোটা গ্রীষ্মকাল মাঠে-ময়দানে চরে, ইচ্ছেমত ঘাস-পাতা খেয়ে আরাম করে শুয়ে বসে থেকে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে ওদের—এখন কাজ পছন্দ হচ্ছে না। খুবই ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে ধীরে ধীরে ওদের আবার নিজের বশে নিয়ে এল আলমানযো, কখনও ফুসলিয়ে, কখনও গাজর ঘুষ দিয়ে, কখনও ওদের কানের পাশে চাবুক ফুটিয়ে।

পনেরো ফুট লম্বা করে কাটা হয়েছে বিশাল লম্বা গাছগুলো কদিন আগেই, এখন অর্ধেক ঢাকা পড়েছে তুষারে। কোনও কোনও কাণ্ডের ব্যাস দুই ফুটের কম নয়। শক্ত লাঠি দিয়ে চাড় দিয়ে ওগুলোকে গড়িয়ে নিয়ে তুলতে হচ্ছে বব-স্লেডে। ছোটখাট দু'একটা দুর্ঘটনা যে ঘটল না, তা নয়, দু'বার গর্তে পড়ল স্টার আর ব্রাইট বব-স্লেড সহ, একবার ব্যথা পেল আলমানযো গাছের কাণ্ডের বাড়ি খেয়ে—বাবা বলল, 'এভাবেই শিখতে হয়, বাপ, তারপর সাবধানে চলতে হয়।'

বছরের চাহিদামত কাঠ সংগ্রহ হয়ে গেলে মা বলল, এবার আলমানযোর স্কুলে যাওয়া উচিত; আর দেরি করলে এবছর আর কিছু শেখা হবে না।

আলমানযো বোঝাল, এখনও অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে—গম, যব, জই মাড়াই করা; তারপর নতুন বাছুর দুটোকে ট্রেনিং দেওয়া, কত কাজ! 'তা ছাড়া,' বলল ও, 'স্কুলে যাব আমি কী করতে? পড়তেও পারি, বানান করে লিখতেও পারি—আমি তো আর স্কুল-টীচার বা স্টোর-কীপার হতে চাই না।'

'পড়তে পারো, লিখতে পারো, বানান জানো,' শান্ত গলায় বলল বাবা, 'কিন্তু অঙ্ক পারো?'

'পারি,' জবাব দিল আলমানযো। 'অঙ্কও পারি, কিছু-কিছু।'

'ভাল একজন কৃষককে অনেক হিসাব জানতে হয়। কিছু-কিছুতে কাজ হবে না, বাপ, ভাল অঙ্ক শিখতে হবে।'

কিছু বলল না আলমানযো, সকালে উঠে টিফিন-বাটি নিয়ে রওনা হয়ে গেল স্কুলের পথে। এ-বছর কিছুটা পিছনে সীট পেল ও, বই আর স্লেট রাখবার সুবিধে হলো ডেস্কে। মন দিয়ে অঙ্ক শিখল আলমানযো, কারণ অঙ্ক শিখে নিতে পারলে

আর স্কুলে যেতে হবে না ওকে।

বাবা বলল, 'এবার খড় অনেক বেশি হয়ে গেছে। ভাবছি, কিছু বেচে দিয়ে আসব শহরে গিয়ে।'

পরদিন মিস্টার উইড এল খড় বেইল করবার যন্ত্রপাতি নিয়ে, কাজটা শিখবে বলে স্কুলে না গিয়ে ঘরেই থেকে গেল আলমানযো। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলল খড় বেইল করবার কাজ। প্রতিটা বেইলের ওজন হলো দুশো পঞ্চাশ পাউন্ড।

রাতে খেতে বসে বিড় বিড় করে আনমনে হিসাব করছে আলমানযো, 'এক গাড়িতে তিরিশ বেইল, প্রতি বেল দুই ডলার করে হলে প্রতি গাড়িতে আসবে ষাট...'

'আয়-হায়! ঈশ্বর! শোনো, কী বলে ছোকরা!' চোখ বড় বড় করে বাবার দিকে চাইল মা।

হাসল বাবা। 'মনে হচ্ছে, মন দিয়ে অঙ্ক শিখছ, বাপ? ভাল। তো কাল চলো না, তুমিই বিক্রি করো প্রথম তিরিশ বেল, আমি দেখব। যাবে? না কি স্কুল...'

'যাব, বাবা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল আলমানযো।

পরদিন স্কুলে না গিয়ে খড়ের বেইলগুলোর উপর উঠে শুয়ে পড়ল ও উপুড় হয়ে। নীচে বাবার হ্যাট আর ঘোড়া দুটোর মোটাসোটা পশ্চাৎদেশ দেখা যাচ্ছে। ওর মনে হচ্ছে যেন গাছে উঠেছে। ঝাঁকিতে সামান্য দুলছে বেইলগুলো; চাকা থেকে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ আসছে। নীল আকাশ। মাঠ-ঘাট তুষারে ছাওয়া, রোদ লেগে ঝকঝক্ করছে।

ট্রাউট রিভারের ব্রিজের কাছে রাস্তার পাশে আলমানযোর চোখে পড়ল কালো মত ছোট্ট কী যেন পড়ে আছে। কাছে গিয়ে ঝুঁকে মনে হলো ওটা একটা পকেটবুক। গাড়ি থামাতে বলল ও বাবাকে, নেমে গিয়ে তুলে নিল জিনিসটা। মোটাসোটা একটা মানিব্যাগ।

আবার আলমানযো উপরে উঠে যেতেই চলতে শুরু করল ঘোড়াগুলো। মানিব্যাগটা খুলে ও দেখল অনেকগুলো বড় অঙ্কের নোট ঠাসা রয়েছে ওতে—কিন্তু কোথাও কিছু লেখা নেই যা দেখে চেনা যাবে মালিককে।

হাত বাড়িয়ে বাবাকে দিল আলমানযো ব্যাগটা। ওর হাতে ঘোড়ার রাশ ধরিয়ে দিয়ে মানিব্যাগ খুলল বাবা।

'মোট আছে পনেরোশো ডলার,' বলল বাবা। 'কার হতে পারে? ব্যাঙ্ককে ভয় পায় লোকটা, নইলে এত টাকা সঙ্গে নিয়ে ঘুরত না। নোটগুলোর ভাঁজ দেখে বোঝা যায়, বেশ অনেকদিন ধরেই আছে ওগুলো এই মানিব্যাগের ভিতর। একসঙ্গে ভাঁজ করা এত বড় অঙ্কের নোট দেখে মনে হয় টাকাগুলো একসঙ্গে পেয়েছে লোকটা। সন্দেহপ্রবণ কোনও লোক, দামী কিছু বিক্রি করেছে...কে হতে পারে লোকটা?'

কথাগুলো আপন মনেই বলল বাবা, তারপর সিদ্ধান্তে পৌঁছল, 'থম্পসন! খুব সম্ভব ও-ই। কয়েক মাস আগে জমি বেচেছে লোকটা। ব্যাঙ্ককে বিশ্বাস করে না,

খুবই সন্দেহপ্রবণ মানুষ, তেমনি অসম্ভব কৃপণ–ছোটমনের লোক। থম্পসন না হয়ে যায় না!'

মানিব্যাগটা পকেটে রেখে আলমানযোর হাত থেকে রাশ নিল বাবা, 'মনে হয় শহরেই পেয়ে যাব ওকে।'

প্রথমেই ফীড স্টেবলে গেল বাবা ওয়্যাগন নিয়ে। বিক্রির দায়িত্ব ছেড়ে দিল আলমানযোর উপর। চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনল দোকানিকে ও কীভাবে কী বোঝায়। দশ বছরের এক বিক্রেতার মুখে খড়ের প্রশংসা শুনে হাসল দোকানি, জিজ্ঞেস করল, 'কত চাও?'

'প্রতি বেইলের জন্যে সোয়া দুই ডলার,' দাম হাঁকল আলমানযো।

'বেশি চাইছ,' মাথা নাড়ল দোকানি, 'এর এত দাম হয় না।'

'কত হলে ঠিক হয়?' জিজ্ঞেস করল আলমানযো।

'দুই ডলারের বেশি এক পেনিও না,' বলল দোকানি।

'ঠিক আছে,' চট্ করে বলল আলমানযো। 'ওই দামেই বেচব আমি।'

বাবার দিকে অবাক হয়ে তাকাল দোকানি, তারপর হ্যাটটা পিছনে ঠেলে দিয়ে আলমানযোকে জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে সোয়া দু'ডলার করে চাইলে কেন প্রথমে?'

'দুই ডলার করে কিনবেন আপনি?' পাল্টা প্রশ্ন করল আলমানযো।

'কিনব।'

'আমি যদি দুই ডলার করে চাইতাম, আপনি এক ডলার পঁচাত্তর সেন্টের বেশি বলতেন?'

হেসে উঠল দোকানি, বাবাকে বলল, 'আপনার ছেলেটা চালাক আছে।'

'বড় হোক আগে,' বলল বাবা। 'বড় হয়ে কী হয়, সেটাই আসল কথা।'

টাকাগুলো আলমানযোকে গুনে নিতে বলল বাবা। ষাট ডলার গুনে বুঝে নিল আলমানযো।

এবার মিস্টার কেসের স্টোরে গেল ওরা। এই স্টোরে সব জিনিসের দাম কম বলে সব সময়ে ভিড়। বাবা এখান থেকেই বাজার করে। মিস্টার কেসের নীতি হচ্ছে: লাভ কম নেব, বেচব বেশি।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। সবার সঙ্গেই মধুর, বন্ধু সুলভ ব্যবহার মিস্টার কেসের; ছোট-বড়তে কোন ভেদাভেদ নেই, কারণ, সবাই তার কাস্টোমার। বাবাও সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, কিন্তু সবাইকে সমান বন্ধু বলে মনে করে না।

খানিক পরেই পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে আলমানযোর হাতে দিল বাবা, বলল, 'যাও, মিস্টার থম্পসনকে খুঁজে বের করো তুমি। এখানে দেরি হবে মনে হচ্ছে। তুমি ওদিকটা সেরে আসো–সন্ধের আগেই বাড়ি ফিরতে হবে।'

রাস্তায় ছোট ছেলে আর কেউ নেই–সবাই স্কুলে। অত টাকা পকেটে নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে খুব ভাল লাগল আলমানযোর। ভাবল, টাকাগুলো ফেরত পেয়ে কত না জানি খুশি হবে মিস্টার থম্পসন, বার বার ধন্যবাদ জানাবে ওকে।

দোকানে দোকানে খুঁজল ও, নাপিতের দোকান দেখল, ব্যাঙ্ক দেখল–নেই।

আর একটু এগিয়েই মিস্টার প্যাডকের ওয়্যাগন-শপের সামনে রাস্তার ধারে দেখতে পেল ও মিস্টার থম্পসনের গাড়ি। দরজা খুলে দোকানের ভিতরে ঢুকল আলমানযো।

মিস্টার প্যাডক আর মিস্টার থম্পসন স্টোভের পাশে দাঁড়িয়ে একটা হিকরি কাঠ দেখছেন আর কথা বলছেন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল আলমানযো, কারণ বড়দের কথার মাঝখানে কথা বলা বেয়াদবি।

স্টোভের কারণে গরম হয়ে রয়েছে ঘরটা, কাঠ, চামড়া আর পেইন্টের সুগন্ধ। স্টোভের ওপাশে দুজন কর্মচারী ওয়্যাগন তৈরি করছে, আরেকজন চকচকে নতুন একটা কালো বাগির চাকায় লাল দাগ টানছে। রাঁদা করা কোঁকড়ানো কাঠের ছিলকা স্তূপ হয়ে রয়েছে একপাশে। কর্মচারীরা শিস দিচ্ছে, মাপ-জোখ করে দাগ টানছে কাঠে, রাঁদা করছে বা করাত দিয়ে কাঠ চিরছে। গোটা পরিবেশটা চমৎকার লাগল আলমানযোর কাছে।

মিস্টার থম্পসন নতুন একটা ওয়্যাগন তৈরি করাবেন, তাই দাম-দস্তুর করছেন, তর্ক করছেন। কী করে যেন টের পেয়ে গেল আলমানযো, ওয়্যাগন বিক্রির আগ্রহ রয়েছে বটে, কিন্তু মিস্টার প্যাডক লোকটাকে মোটেও পছন্দ করতে পারছেন না। একটা পেন্সিল দিয়ে খরচগুলো লিখে যোগ দিয়ে দেখালেন, চেষ্টা করছেন মিস্টার থম্পসনকে সন্তুষ্ট করতে।

'দেখুন, এর কমে আর পারি না,' বললেন মিস্টার প্যাডক। 'এর নীচে আমার লোকদের বেতন ওঠাতে পারব না আমি। ওয়্যাগন দেখলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন, এটুকু গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। সন্তুষ্ট না হলে না হয় নেবেন না।'

'দেখি, আর কেউ যদি এর কমে না পারে, তা হলে হয়তো আমি আপনার কাছেই ফিরে আসব,' বললেন মিস্টার থম্পসন। কণ্ঠস্বরে সন্দেহ আর অবিশ্বাস।

'বেশ তো, দেখুন বাজার ঘুরে। দামে যদি পোষায়, আসবেন। আমি খুব খুশি হব আপনার কাজটা করে দেয়ার সুযোগ পেলে।' কথাটা বলেই আলমানযোর উপর চোখ পড়ল মিস্টার প্যাডকের। 'আরে! তুমি এখানে! তোমার ছোট্ট লুসি কেমন আছে?'

মোটাসোটা, দৈত্যের মত দেখতে এই ভাল লোকটাকে আলমানযোর খুব পছন্দ, দেখা হলেই শুয়োর-ছানাটার কথা জিজ্ঞেস করেন সব সময়।

'ছোট্ট নেই আর এখন, সার,' বলল আলমানযো, 'একশো পঞ্চাশ পাউন্ডের মত হবে ওর ওজন।' ফিরল মিস্টার থম্পসনের দিকে, 'আচ্ছা, আপনি কি একটা মানিব্যাগ হারিয়েছেন?'

কথাটা শোনা মাত্র আঁৎকে উঠলেন মিস্টার থম্পসন। পাগলের মত চাপড় মারছেন পকেটগুলোয়, হাত ঢুকাচ্ছেন, খুঁজছেন।

'হায়, হায়! তাই তো! গেল কোথায়? পনেরোশো ডলার ছিল ওতে! সর্বনাশ! হারিয়ে গেছে! তুমি কী করে জানলে?'

'এটাই?' হাসিমুখে জানতে চাইল আলমানযো।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, এটাই! কিছু হাতাওনি তো আবার?' বলেই ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন তিনি মানিব্যাগটা। চট্ করে খুলে ব্যস্ত হাতে গুনতে শুরু

করলেন টাকাগুলো। দুইবার গুনে সন্তুষ্ট হলেন, বিরাট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ছোঁড়াটা কিছুই চুরি করেনি দেখছি!'

রাগে চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল আলমানযোর। ভাবল, একটা চড় লাগানো যায় না বদ লোকটার গালে?

প্যান্টের পকেট হাতড়ে কয়েকটা পয়সা বের করলেন মিস্টার থম্পসন, তার থেকে বেছে একটা নিকেল নিয়ে গুঁজে দিলেন ওর হাতে, 'ধর্, ছোঁড়া, নে। যা, ভাগ্ এখন!'

চোখে অন্ধকার দেখছে এখন আলমানযো। ঘৃণায় রি-রি করছে অন্তরটা। কোনওভাবে লোকটাকে আঘাত করবার জন্য ছট্‌ফট করছে ওর মন। কিন্তু সামলে নিল। শান্তভাবে পয়সাটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'ধরুন, আপনার মহামূল্যবান নিকেল আপনিই রাখুন। ফকিরকে দেবেন।'

মিস্টার থম্পসনের নিষ্ঠুর চেহারাটা লাল হয়ে উঠল রাগে। একজন কর্মচারী বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠতেই আরও রেগে এক-পা এগোলেন তিনি আলমানযোর দিকে—মনে হচ্ছে মারবেন। কিন্তু বাধা দিলেন মিস্টার প্যাডক।

'অতি নীচ লোক দেখছি আপনি, থম্পসন! একে চোর বলছেন, এমন আচরণ করছেন যেন ও রাস্তার ফকির। কী মনে করেন আপনি নিজেকে? অ্যাঁ? হারানো পনেরোশো ডলার যে ছেলে ফিরিয়ে এনে দিল, তার সঙ্গে এই হচ্ছে আপনার ব্যবহার? নিকেল ধরিয়ে দিচ্ছেন ওর হাতে! জানেন ও কে? চেনেন ওকে?'

একপা পিছিয়ে গেলেন মিস্টার থম্পসন, কিন্তু বিশাল ধড় নিয়ে এগিয়ে এলেন মিস্টার প্যাডক, মস্ত একটা মুঠি তুলে ঝাঁকালেন তাঁর নাকের কাছে।

'কৃপণের বাচ্চা কৃপণ, রক্ত-চোষা উকুন কোথাকার!' রাগে কাঁপছেন মিস্টার প্যাডক। 'এতবড় অন্যায়! আমার সামনে, আমারই দোকানে?' চোখমুখ পাকিয়ে ভয়ঙ্কর করে তুললেন তিনি, 'এর মত একটা সৎ, ভদ্র, ভাল ছেলেকে এমন অপমান···অ্যাই, ব্যাটা! বের কর্ একশো ডলার···না, দুইশো ডলার দিবি! বের কর্ এক্ষুণি, নইলে দেখবি তোর কী করি!'

মিস্টার থম্পসন কিছু বলবার চেষ্টা করলেন, আলমানযোও—কিন্তু কে শোনে কার কথা! বিকট এক হুঙ্কার দিয়ে আরও এক পা এগোলেন তিনি লোকটার দিকে, 'দুইশো! দিবি তুই, নাকি দেখবি কী করি?'

ভয়ে কুঁকড়ে গেলেন মিস্টার থম্পসন, জিভ দিয়ে আঙুল ভিজিয়ে নিয়ে ঝটপট গুনে আলাদা করলেন কয়েকটা নোট, এগিয়ে দিলেন আলমানযোর দিকে। আলমানযো বলল, 'মিস্টার প্যাডক, প্লীজ···'

'বেরো এবার, দূর হ এখান থেকে, গেট আউট!'

চোখের পলকে ছিটকে দরজার কাছে চলে গেলেন মিস্টার থম্পসন, বাইরে বেরিয়ে দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিলেন।

নোটগুলো হাতে নিয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল আলমানযো। ঘটনার আকস্মিকতায় এতই উত্তেজিত যে কথা বলতে গিয়ে তোতলাতে শুরু করল। বলল, বাবা ওর টাকা নেওয়াটা পছন্দ করবে না।

মিস্টার প্যাডক শার্টের গুটানো হাতা নামিয়ে কোট গায়ে চড়ালেন, 'চলো,

আমি বুঝিয়ে বলব ওঁকে। কোথায় উনি?'

সদাই সেরে প্যাকেটগুলো ওয়্যাগনে তুলছিল বাবা, আলমানযোকে নিয়ে ঝড়ের বেগে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মিস্টার প্যাডক, খুলে বললেন সব ঘটনা।

'ওর নাকটা ভেঙে দিতে পারলে খুশি হতাম আমি,' বললেন মিস্টার প্যাডক। 'কিন্তু বুঝলাম, তার চেয়েও বেশি ব্যথা পাবে ও কিছু টাকা খসে গেলে। তা ছাড়া এটা তোমার ছেলের প্রাপ্য।'

'সততার জন্যে কারও কিছু প্রাপ্য হয় বলে আমার মনে হয় না,' বলল বাবা। 'তবে তুমি যেভাবে অসম্মান থেকে আমার ছেলেটাকে রক্ষা করেছ, সেজন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, প্যাডক।'

'আমিও বলছি না যে ধন্যবাদের চেয়ে বেশি কিছু ওর প্রাপ্য ছিল,' বললেন মিস্টার প্যাডক। 'কিন্তু ওই ব্যবহার? ওরকম অপমান সে করতে পারে এতটুকু একটা বাচ্চাকে? ভেবে দেখো, উপকারের প্রতিদানে লোকটা যা করেছে তাতে আমি বলব, ক্ষতিপূরণ হিসেবে দুশো ডলার আলমানযোর প্রাপ্যই হয়।'

'তোমার যুক্তিটা উড়িয়ে দেয়া যায় না···' কিছুক্ষণ চিন্তা করে বাবা বলল, 'ঠিক আছে, বাপ, টাকাগুলো তুমি রাখতে পারো।'

নোটগুলোর দিকে চাইল আলমানযো। দু-ই-শো ডলার! চার বছর বয়সী একটা কোল্টের দাম!

'তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, প্যাডক,' বাবা বলল। 'আমার ছেলের হয়ে তুমি যা করেছ, সেজন্যে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। একজন খদ্দের হারালে···'

'আরে না, না,' বললেন মিস্টার প্যাডক, 'ও রকম এক-আধজন খদ্দের হারালে কিছুই এসে যায় না আমার। তা, আলমানযো, এত টাকা দিয়ে কী করবে ভাবছ?'

বাবার দিকে চাইল আলমানযো। 'টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখা যায় না?'

'ওটাই তো টাকা রাখার জায়গা,' বলল বাবা। 'দুইশো ডলার! কম না! তোমার দ্বিগুণ বয়সেও এত টাকা ছিল না আমার।'

'আমারও না,' বললেন মিস্টার প্যাডক।

বাবার সঙ্গে ব্যাঙ্কে ঢুকল আলমানযো। উঁচু কাউন্টারের ওপাশে লম্বা টুলে বসা ক্যাশিয়ারের মাথাটা শুধু দেখতে পাচ্ছে ও। কানে গোঁজা কলমটা হাতে নিল ক্যাশিয়ার, গলা বাড়িয়ে আলমানযোকে দেখে নিয়ে বলল, 'টাকাগুলো আপনার অ্যাকাউন্টে রাখলেই ভাল হত না, সার?'

'না,' বাবা বলল, 'টাকাটা ওর। ওর নামেই জমা থাক।'

দুই বার দু'জায়গায় নাম সই করতে হলো আলমানযোকে। টাকাগুলো গুনে ড্রয়ারে রেখে দিল ক্যাশিয়ার। ছোট্ট একটা বইয়ের উপর আলমানযোর নাম লিখে, ভিতরে দুশো ডলার অঙ্কে লিখে ওর হাতে ধরিয়ে দিল বইটা।

বাইরে বেরিয়ে আলমানযো জিজ্ঞেস করল, 'টাকাটা তুলতে হলে কী করতে হবে আমাকে?'

'তুমি চাইলেই ওরা দিয়ে দেবে। তবে একটা কথা খেয়াল রেখো, যতক্ষণ

টাকাগুলো ব্যাঙ্কে থাকবে, ততক্ষণ ওগুলো বাড়তে থাকবে। প্রতিটা ডলার একবছর পর বেড়ে গিয়ে এক ডলার চার সেন্ট হয়ে যাবে। তার মানে এই দুশো ডলার ঠিক একবছর পর বেড়ে হয়ে যাবে দুশো আট ডলার। বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ, বাবা,' বলল আলমানযো। কিন্তু মনে মনে ভাবছে, এখন যে-কোন সময় ইচ্ছে করলেই ও একটা কোল্টের মালিক হতে পারে, নিজে ট্রেনিং দিয়ে ওটাকে মনের মত করে গড়ে নিতে পারে।

সত্যিই, আজকের দিনটা ওর জীবনের একটা চমৎকার স্মরণীয় দিন।

বাইশ

কিন্তু দিনটা ফুরাবার আগে আরও কিছু স্মরণীয় ঘটনা ঘটে গেল।

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়েই দেখা গেল মিস্টার প্যাডক অপেক্ষা করছেন ওদের জন্য। বাবাকে বললেন, কিছু কথা আছে।

'বেশ কয়েকদিন ধরেই বলব বলব করছি,' বললেন তিনি, 'তোমার এই ছেলেটা সম্পর্কেই কিছু কথা।'

অবাক হলো আলমানযো।

'আচ্ছা, ওকে গাড়ি তৈরির কারবারে দেয়ার কথা কখনও ভেবে দেখেছ, ওয়াইল্ডার?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার প্যাডক।

'কই, না তো,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল বাবা, 'কখনও ভাবিনি। কেন?'

'এ নিয়ে একটু ভেবে-চিন্তে দেখতে পার,' বললেন মিস্টার প্যাডক। 'ব্যবসাটা দ্রুত বাড়ছে, ওয়াইল্ডার। দেশটা বড় হচ্ছে, লোক বাড়ছে, ক্রমেই চাহিদা বাড়ছে ওয়্যাগন আর বাগির। মানুষের চলাচল বাড়ছে, আমাদের ওপর খরিদ্দারের চাপ বাড়ছে। একটা বুদ্ধিমান ছেলের জন্যে এটা কিন্তু খুব ভাল একটা লাইন।'

'হ্যাঁ,' বলল বাবা।

'আমার তো নিজের কোনও ছেলে নেই, তুমি জানো। তোমার আছে দুই ছেলে,' বললেন মিস্টার প্যাডক। 'কিছুদিনের মধ্যেই তোমার ভাবতে হবে ওকে কোন্ লাইনে দেয়া যায়। আমার কাছে দিয়ে দাও না। আমি ওকে কাজ শেখাই, ব্যবসা শেখাই। ওর যদি লাইনটা পছন্দ হয়, এক সময় এ-ব্যবসাটা ওর হবে। পঞ্চাশ-ষাট জন লোক কাজ করবে ওর অধীনে, শহরের একজন গণ্যমান্য ধনী লোক হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। প্রস্তাবটা ভেবে দেখার মত নয়?'

'হ্যাঁ,' শান্ত গলায় বলল বাবা। 'হ্যাঁ, অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখার মত। তোমাকে ধন্যবাদ, প্যাডক।'

বাড়ি ফেরবার পথে আর একটি কথা বলল না বাবা। আলমানযোও চুপচাপ থাকল।

এত ঘটনা ঘটেছে আজ যে সব জড়িয়ে পেঁচিয়ে যাচ্ছে ওর মাথার মধ্যে। অনেকগুলো ছবি ঘুরছে ওর চোখের সামনে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ক্যাশিয়ারের কালিমাখা আঙুল, মিস্টার থম্পসনের ঠোঁটের দুই কোনা নীচে নামানো সরু মুখটা, মিস্টার প্যাডকের মুঠি পাকানো হাত, ব্যস্ত, গরম ওয়্যাগন কারখানার হাসিখুশি পরিবেশ। ভাবছে, মিস্টার প্যাডকের শিক্ষানবীশ হলে ওর আর স্কুলে যেতে হবে না।

মিস্টার প্যাডকের কারখানার কাজ ওর খুবই পছন্দ। রাঁদার ফাঁক গলে বেরিয়ে আসছে চিকন, কোঁকড়ানো কাঠের ছিলকা, কী সুন্দর গন্ধ। কাঠের উপর হাত বুলিয়ে দেখছে লোকগুলো কোথাও অসমান রয়ে গেছে কি না। চওড়া ব্রাশ দিয়ে রঙ করা হচ্ছে গাড়িগুলো, চিকন ব্রাশ দিয়ে টানা হচ্ছে সরু সরল রেখা।

হিকরি বা ওক কাঠের তৈরি সদ্য পেইন্ট করা চকচকে বাগি বা ওয়্যাগন কর্মচারীদের গর্বের বস্তু।

পকেটের শক্ত, ছোট্ট ব্যাঙ্ক-বইটা ছুঁয়ে দেখল আলমানযো একবার। স্টারলাইটের মত একটা কোল্টের চেহারা ভেসে উঠল চোখের সামনে। সরু পা, বড়বড়, শান্ত, কৌতূহলী চোখ–আহা! স্টার আর ব্রাইটকে যেভাবে শিখিয়েছে, ঠিক তেমনি প্রথম থেকে সব কিছু শিখিয়ে নিতে চায় ও সেই কোল্টটাকে।

চুপচাপ বাড়ি ফিরল দুজন, চুপচাপ গোলাঘরের কাজ শেষ করল।

রাতে খেতে বসেও দুজনে চুপচাপ। অস্বস্তি বোধ করছে মা। গল্প করবার চেষ্টা করল, শহরে কী কী ঘটল জানবার চেষ্টা করল–কিন্তু প্রশ্নের জবাব ছাড়া আর কিছু সাড়া পেল না বাবার কাছ থেকে। শেষ-মেষ সোজা-সাপটা প্রশ্ন করল, 'জেম্‌স্, কী চলছে তোমার মনে, বলো তো!'

বাবা বলল, আলমানযোকে মনে ধরেছে, শিক্ষানবীশ হিসেবে নিতে চায় মিস্টার প্যাডক।

শুনেই ফাঁৎ করে জ্বলে উঠল মা, লাল হয়ে উঠল গাল দুটো। কাঁটা আর ছুরি নামিয়ে রাখল প্লেটে।

'আয়-হায়! এ আবার কী রকম কথা!' বলল মা। 'যত তাড়াতাড়ি চিন্তাটা মিস্টার প্যাডকের মাথা থেকে বেরিয়ে যায় ততই ভাল! তুমি নিশ্চয়ই দু-কথা শুনিয়ে দিয়েছ? আমি তো বুঝি না, কেন শহরে গিয়ে মানুষকে তোয়াজ করতে চাইবে আলমানযো।'

'অনেক টাকা কামায় প্যাডক,' বলল বাবা। 'আমার ধারণা, আমার চেয়ে অনেক বেশি টাকা জমায় ও ব্যাঙ্কে প্রতি বছর। ওর মনে হয়েছে, ছেলেটার জন্যে এটা মস্ত একটা সুযোগ। বলছে, ওর সবই এক সময় আলমানযোর হবে।'

'বাহ্, বেশ!' তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল মা। আসলে ঘাবড়ে গেছে। 'একটা চমৎকার খামার ছেড়ে কেউ শহরে গিয়ে গাড়ি তৈরির ব্যবসা করলে দারুণ উন্নতি করবে, এটা যে ভাবে···আচ্ছা, মিস্টার প্যাডকের টাকাটা আসে কাদের কাছ থেকে? এই আমাদের মত কৃষকের কাছ থেকে না? আমাদের পছন্দসই ওয়্যাগন বানাতে না পারলে তার আর করে-কম্মে খেতে হোত না। আমাদের খুশি করেই

তো ওর পয়সা!'

'কথাটা সত্যি,' বলল বাবা, 'কিন্তু...'

'কোনও কিন্তু নেই এর মধ্যে।' জোর দিয়ে বলল মা। 'এই যে রয়াল, দুদিন অ্যাকাডেমিতে কাটিয়ে এসেই জানাচ্ছে, স্টোর-কীপার হবে। হতে পারে দোকানদারী করে টাকা কামাবে মেলা, কিন্তু তোমার মত সত্যিকার একজন মানুষ হতে পারবে কোনদিন? মানুষকে খুশি করতে করতেই যাবে জীবনটা, তোয়াজ করতে হবে ওর প্রতিটা খদ্দেরকে। এটা কি একটা জীবন হলো?'

আলমানযোর মনে হলো এখুনি বুঝি কেঁদে ফেলবে মা।

'থাক, থাক,' বলল বাবা, 'এ-নিয়ে মন খারাপ কোরো না। যা হচ্ছে, হয়তো ভালর জন্যেই হচ্ছে।'

'আমি আলমানযোকে এভাবে ভেসে যেতে দেব না!' বলল মা, 'কিছুতেই না। শুনছ কী বলছি?'

'তোমার যেমন লাগছে, আমারও ঠিক তেমনি লাগছে,' বলল বাবা। 'কিন্তু সিদ্ধান্তটা আসলে নিতে হবে আলমানযোকে। ওকে জোর করে এই খামারে ধরে রাখতে পারি আমরা। কিন্তু কতদিন? একুশ বছর বয়স পর্যন্ত। কিন্তু ও যদি যেতে চায়, আমরা ধরে রাখলে ওর ক্ষতি হবে। আলমানযো যদি রয়ালের মত শহরেই যেতে চায়, তা হলে ছোট থাকতেই প্যাডকের শিক্ষানবীশ হওয়া ভাল।'

খেয়ে চলেছে আলমানযো। শুনছে সব, কিন্তু মুখ থামাচ্ছে না। এক ঢোক দুধ খেয়ে নিয়ে কুমড়োর পাইয়ের দিকে মন দিল।

'আয়-হায়! ও কী সিদ্ধান্ত নেবে?' আপত্তি জানাল মা। 'কীই বা বয়েস ওর!'

আরেক কামড় বসাল আলমানযো, অর্ধেকের বেশি গায়েব হয়ে গেল কুমড়োর পিঠে। বড়রা প্রশ্ন না করলে কিছু বলবার উপায় নেই, কিন্তু ও জানে, এটুকু বোঝবার বয়স ওর হয়েছে যে ও বাবার মত হতে চায়, আর কারও মত নয়। মিস্টার প্যাডককে ও শ্রদ্ধা করে, কিন্তু তার মত হওয়ার কোনও ইচ্ছে ওর নেই। মিস্টার থম্পসনের মত নীচ লোককেও খুশি করবার চেষ্টা করতে হয় মিস্টার প্যাডককে, তা নইলে একটা ওয়্যাগন কম বিক্রি হবে। বাবার মত স্বাধীন আর কে আছে? বাবা যদি কাউকে পছন্দ করে, কেবল তাকেই খুশি করবে, বাধ্য হয়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাউকে খুশি করবে না।

হঠাৎ খেয়াল করল, বাবা কী যেন বলছে ওকে। ঢোক গিলল ও, তারপর বলল। 'হ্যাঁ, বাবা।'

গুরু-গম্ভীর দেখাচ্ছে বাবাকে। বলল, 'প্যাডক তোমাকে শিক্ষানবীশ হিসেবে নিতে চায়, তুমি শুনেছ?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'তুমি কী বলো?'

কিছুই বলতে পারল না আলমানযো। ও শুধু জানে, বাবা যা বলবে তাই করবে ও।

'ভাল করে ভেবে দেখো, বাপ,' বলল বাবা। 'আমি চাই তুমি নিজেই তোমার মন স্থির করো। প্যাডকের সঙ্গে গেলে সহজ একটা জীবন পাবে। এখানকার মত

সব ঋতুতেই বাইরে বেরিয়ে কষ্ট করতে হবে না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আরাম করে শুয়ে থাকতে পারবে নিজের ঘরে, ভাবতে হবে না ঠাণ্ডায় গরুগুলো জমে যাচ্ছে কি না। বৃষ্টি হোক আর রোদ হোক, ঝড় হোক বা তুষার পড়ুক, তুমি থাকবে ছাদের নীচে, নিরাপদ। প্রচুর খেতে পাবে, দামী-দামী জামাকাপড় পরবে, টাকা জমাবে ব্যাঙ্কে।'

'জেমস!' আঁৎকে উঠল মা।

'এটাই সত্য। সত্যিকার ছবিটাই তুলে ধরা উচিত,' বলল বাবা। 'কিন্তু এর আবার অন্যদিকও আছে, আলমানযো। শহরে অন্যের উপর নির্ভর করতে হবে তোমাকে, বাপ। তুমি যা কিছু পাবে, সবই হবে অন্যের দান।

'কৃষক নির্ভর করে নিজের ওপর, জমির ওপর, আবহাওয়ার ওপর। নিজের খাবার নিজে ফলায় চাষী, নিজের পোশাক তৈরি করে নেয় নিজে, নিজের গাছ কেটে ঘর গরম করে নিজের। হ্যাঁ, পরিশ্রম আছে, তবে নিজের ইচ্ছেয় কাজ করবে তুমি, কারও হুকুমে নয়। এখানে তুমি স্বাধীন।'

ওর দিকে চেয়ে আছে বাবা-মা দুজনেই। অস্বস্তি বোধ করছে আলমানযো। ও জানে, ঘরের মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকবার লোক ও নয়, মানুষকে খুশি করে পয়সা কামাবার কোনও ইচ্ছে ওর নেই। এমন জীবন ও কল্পনাও করতে পারে না, যেখানে ঘোড়া-গরু-প্রান্তর নেই। ঠিক বাবার মত হতে চায় ও, একদম বাবার মত, কিন্তু বলতে চায় না সে-কথা।

'সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে ভেবে দেখো, বাপ,' বলল বাবা। 'কী চাও, মনস্থির করো।'

'বাবা!' বলল আলমানযো।

'বলো, বাপ?'

'আমি সত্যিই কী চাই, বলব?'

'বলো, বাপ।'

'আমি একটা কোল্ট চাই,' বলল আলমানযো। 'আমার নিজের জন্যে একটা কোল্ট কিনতে চাইলে তুমি অনুমতি দেবে? দুশো ডলারে নিশ্চয়ই একটা পাব? আমি নিজে ট্রেনিং দেব ওটাকে...'

ধীরে ধীরে ফাঁক হলো বাবার দাড়ি। বোঝা গেল, বাবা হাসছে। ন্যাপকিন নামিয়ে রেখে চেয়ারের পিছনে হেলান দিল বাবা, ঝিকমিকে চোখে তাকাল মা'র দিকে। তারপর আলমানযোর দিকে ফিরে বলল, 'টাকাটা ব্যাঙ্কে যেমন আছে থাক।'

সবকিছু আঁধার হয়ে আসছে বলে মনে হলো আলমানযোর। পরমুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সবকিছু আবার। বাবা বলছে, 'কোল্ট যদি তোমার এতই পছন্দ, ঠিক আছে, স্টারলাইটকে তুমি নিয়ে নাও।'

'সত্যিই, বাবা?' প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল আলমানযো, 'আমার? নিজের?'

'হ্যাঁ, বাপ। তুমিই পোষ মানাবে, ট্রেনিং দেবে, চড়বে, চালাবে—যা খুশি। চার বছর বয়স হলে ওকে বেচতে পারবে, কিংবা নিজের জন্য রেখে দিতে পারবে—তোমার যা ইচ্ছে। কাল সকাল থেকেই ওকে তুমি ট্রেনিং দেয়া শুরু করতে পারো।'

***

লিটল হাউস ইন দ্য বিগ উড্‌স্‌

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

এক

প্রায় শোয়া-শো বছর আগের কথা। আমেরিকার উইস্‌কন্‌সিন্‌ অঞ্চলে বিগ উড্‌স্‌ নামে এক মস্ত গহীন জঙ্গলে গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ছোট্ট একটা বাড়িতে বাস করত ছোট্ট মেয়ে লরা।

বাড়িটার চারদিকে শুধু গাছ আর গাছ। যেদিকে তাকাও সেদিকেই গাছ। উত্তর দিকে সারা দিন, বা সারা সপ্তাহ, কিংবা সারা মাস যদি হাঁটো, তবু শেষ হবে না জঙ্গল। বাড়িটার আশপাশে আর কোনও বাড়িঘর নেই, মানুষজন নেই, নেই রাস্তাঘাট–শুধু হরেক রকম গাছ আর বন্য জানোয়ারের মেলা।

নেকড়ে, ভালুক আর মস্ত বড় বড় প্যানথার আছে এ জঙ্গলে। ঝর্নাগুলোয় রয়েছে খাটাশ, বেজি আর ভোঁদড়। পাহাড়ের আনাচে-কানাচে থাকে শেয়ালের দল, হরিণ চরে বেড়ায় যত্রতত্র।

বাড়িটির ডানে-বাঁয়ে কয়েক মাইল দূরে দূরে জঙ্গলের ধার ঘেঁষে শুধু অল্প কয়েকটি ঘর–লরাদের আত্মীয়স্বজনরাই থাকে সেখানে।

বাবা, মা, বড়বোন মেরি, ছোট্ট বোন ক্যারি, একটা বিড়াল ব্ল্যাক সুসান আর একটা বুলডগ জ্যাক–এই নিয়ে লরাদের সংসার।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেলে কান পেতে শোনে লরা গাছের ফিসফাস কথাবার্তা। মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে আসে নেকড়ে বাঘের টানা, লম্বা ডাক। তারপর অনেক কাছে এসে আবার ডেকে ওঠে ওটা।

ডাকটা ভয় ধরিয়ে দেয় ছোট্ট লরার মনে। ও জানে, নেকড়েরা ছোট মেয়ে পেলে ধরে খেয়ে ফেলে। নেকড়ের ডাক শুনে বুক কাঁপে ওর, যদিও জানে বাড়ির ভিতর ঢুকবার উপায় নেই কোনও নেকড়ের। দরজার উপর দেয়ালে ঝুলানো রয়েছে বাবার বন্দুকটা। আর দরজার এ-পাশে পাহারা দিচ্ছে ওদের বিশ্বস্ত বুলডগ, জ্যাক।

'ঘুমিয়ে পড়ো, লরা,' বাবা বলে ওপাশ থেকে। 'জ্যাককে ডিঙিয়ে কোনও নেকড়ের সাধ্য নেই যে ভেতরে ঢোকে।'

গুটিসুটি মেরে চাদরটা আরেকটু টেনে নেয় লরা, মেরির গা ঘেঁষে ঘুমিয়ে পড়ে আবার।

একরাতে ও ভয় পাচ্ছে দেখে বাবা ওকে কোলে নিয়ে জানালার পাশে দাঁড়াল। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল লরা, দুটো নেকড়ে বাঘ বসে আছে বাড়ির সামনে। বড়-সড় রোমশ কুকুরের মত দেখতে। উজ্জ্বল চাঁদের দিকে নাক তুলে লম্বা ডাক ছাড়ল ওরা।

দরজার সামনে পায়চারি করছে জ্যাক, নিচু গলায় চাপা গর্জন ছেড়ে ধমক দিচ্ছে ওদের। পিঠের রোম দাঁড়িয়ে গেছে জ্যাকের, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে রাগে।

বাড়ির চারপাশে কয়েক পাক ঘুরল নেকড়ে দুটো, হাঁক ছাড়ল, কিন্তু ভিতরে ঢুকবার পথ না পেয়ে শেষকালে চলে গেল অন্যদিকে। লরাকে বিছানায় পৌঁছে দিয়ে বাবা চলে গেল শুতে।

গাছের গুঁড়ি সাজিয়ে তৈরি করা লগ-হাউসটা যেমন মজবুত, তেমনি আরামপ্রদও। বর্ষাকালে পানি বা শীতকালে তুষার ঢুকতে পারে না ভিতরে। উপরতলায় চমৎকার একটা প্রশস্ত চিলেকোঠাও আছে, বৃষ্টির দিনে ওখানে ছাতের উপর টাপুর-টুপুর আওয়াজের মধ্যে বসে খেলতে খুব মজা। নীচতলায় ছোট একটা বেডরুম আর বড়সড় একটা লিভিংরুম রয়েছে। শোবার ঘরে কাঠের খড়খড়ি লাগানো একটা জানালা, আর বড় ঘরটায় কাঁচ বসানো দুটো জানালা রয়েছে। ও ঘরে দরজাও দুটো—একটা সামনের দিকে, অপরটা পিছন দিকে। বাড়িটা চারপাশ থেকে শক্ত বেড়া দিয়ে ঘেরা, যাতে ভালুক বা হরিণ এদিকে আসতে না পারে।

সামনের প্রাঙ্গণে বিশাল দুটো ওক গাছ আছে। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জানালা দিয়ে চেয়ে লরা দেখল দুই গাছের দুটো ডাল থেকে ঝুলছে একটা করে হরিণ। গতরাতে বাবা বন্দুক দিয়ে শিকার করেছে ওগুলো, গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে যাতে নেকড়েরা খেয়ে ফেলতে না পারে। ঘুমিয়ে ছিল বলে কিছুই জানে না লরা।

সেদিন দুপুরে হরিণের তাজা মাংস দিয়ে মজা করে ডিনার খেল বাবা, মা, মেরি আর লরা। কিন্তু বেশিরভাগ মাংসই লবণ মাখিয়ে ধোঁয়ায় সেঁকে রেখে দেওয়া হলো শীতকালে খাওয়া হবে বলে। শীতে শিকার বলতে গেলে মেলেই না। অসম্ভব তুষার পড়ে এ-অঞ্চলে, বাড়িটা প্রায় চাপা পড়ে যায় তুষারে, লেক আর ঝর্নাগুলো ঢাকা পড়ে বরফে। ভালুকগুলো নিজেদের আস্তানায় পড়ে পড়ে ঘুমায় গোটা শীতকাল। কাঠবেড়ালিগুলো নিজ নিজ লেজে নাক গুঁজে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকে গাছের খোঁড়লে, ওদের বাসায়। যা দু'চারটে হরিণ বা খরগোশ দেখা যায়, সেগুলো খাবারের অভাবে এতই হাড়-জিরজিরে হয়ে থাকে যে বাবা কিছুতেই মারে না ওদের। সারাদিন ঘুরে ফিরে শিকার না পেয়ে প্রায়ই খালিহাতে ফিরে আসে বাবা শীতকালে, তাই শীতের আগেই ওরা যত বেশি সম্ভব খাবার সংগ্রহ করে জমিয়ে রাখে।

একদিন আঁধার থাকতে ঘুম থেকে উঠে ওয়্যাগনে ঘোড়া জুতে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাবা, ফিরল সেই সন্ধ্যার পর। দেখা গেল এক গাড়ি ভর্তি মাছ ধরে এনেছে লেক পেপিন থেকে। কোন-কোনটা লরার সমান লম্বা। পরদিন তাজা মাছ ভাজা দিয়ে মজা করে ডিনার খেল ওরা। বাকি সব মাছ কেটে লবণ দিয়ে ব্যারেলে ঠেসে রাখা হলো শীতকালে খাওয়ার জন্য।

বাবার শুয়োরটা এতদিন ছাড়া ছিল জঙ্গলে, ওকগাছের ফুল, বাদাম আর শিকড়-বাকড় খেয়ে খুব মোটাতাজা হয়েছে ওটা। এবার ওটাকে ধরে খাঁচায় পুরে রাখল বাবা, আর একটু শীত পড়লে কেটে ওটার মাংস বরফে জমিয়ে রাখা হবে।

একদিন গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল লরার শুয়োরের চেঁচামেচিতে। একলাফে বিছানা থেকে নেমে দরজার উপর থেকে বন্দুকটা নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে

গেল বাবা। একটু পরেই গুলির শব্দ শুনল লরা; একবার, দুবার।

বাবা ফিরে আসতেই শোনা গেল গল্পটা। বাবা বেরিয়েই দেখে মস্ত কালো এক ভালুক দাঁড়িয়ে রয়েছে শুয়োরের খাঁচার কাছে, ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে ধরবার চেষ্টা করছে ওটাকে। আর প্রাণভয়ে চিৎকার আর ছুটোছুটি করছে শুয়োরটা। বন্দুক তুলেই গুলি করল বাবা, কিন্তু তারার আলোয় ভাল মত লক্ষ্য স্থির করতে পারেনি। এক দৌড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেছে ভালুকটা, দ্বিতীয় গুলিটাও ওটার ধার-কাছ দিয়ে যায়নি।

লরা খুব দুঃখ করল ভালুকটা মারা না পড়ায়। ভালুকের মাংস ওর খুবই প্রিয়।

'যাক, শুয়োরের মাংসটা তো রক্ষা করা গেছে!' বলল বাবা মুচকি হেসে।

বাড়ির পিছনের তরকারি-বাগানে প্রায় রাতেই হামলা চালায় হরিণের দল। লাফিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকে পড়ে ওরা, কিন্তু জ্যাকের তাড়া খেয়ে তরি-তরকারি নষ্ট করবার আগেই আবার লাফ দিয়ে বেরিয়ে যেতে হয় ওদের। সকালে উঠে ছোট-ছোট খুরের দাগ দেখা যায় গাজর আর বাঁধাকপির বাগানে।

তুষারপাত শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগেই আলু, গাজর, বীট, শালগম আর বাঁধাকপি তুলে ভরে ফেলা হলো তলকুঠুরি। পেঁয়াজ আর পাকা মরিচ ঝুলিয়ে রাখা হলো চিলেকোঠায়। লাউ আর কুমড়োগুলোকেও গাদা করে রাখা হলো চিলেকোঠার এক কোণে।

ভাঁড়ার ঘরে লবণ দেওয়া মাছের ব্যারেল আর হলুদ পনির রাখা আছে থরে থরে।

একদিন শুয়োর জবাইয়ে সাহায্য করতে এল আঙ্কেল হেনরি। মস্ত একটা কড়াইয়ে পানি যখন ফুটতে আরম্ভ করল, তখন বাবা আর কাকাকে শুয়োরের খাঁচার দিকে এগোতে দেখেই দৌড়ে নিজের বিছানায় গিয়ে পড়ল লরা, দুই কান ঢেকে রেখেছে দুই হাতে। শুয়োরটার মরণ-চিৎকার আর কাতরানি কিছুতেই শুনতে চায় না ও।

শুয়োরটা কেটেকুটে দিয়ে ডিনার খেয়ে চলে গেল আঙ্কেল হেনরি। বাবা গেল জঙ্গলে ফাঁদ পাততে।

শীত এসে গেছে। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। তাই মেরি আর লরাকে ঘরেই খেলতে হচ্ছে। বাইরে সব গাছ থেকে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে হলুদ পাতা। খেলার জন্য চিলেকোঠাটাই ওদের সবচেয়ে বেশি পছন্দ। মস্ত কুমড়োগুলো চেয়ার-টেবিল হিসেবে চমৎকার। পেঁয়াজ, মরিচ আর গরম মশলার ধুলোটে, ঝাল-ঝাল গন্ধ ম-ম করে ওখানে।

মেরি লরার চেয়ে বড়, নেটি নামে একটা কাপড়ের পুতুল আছে ওর। লরার আছে রুমালে জড়ানো একটা দানা ছাড়ানো ভুট্টার খোসা। ও ওটার নাম রেখেছে সুসান। ও যে শুধুই একটা ভুট্টার খোসা, এজন্য কোনও অবস্থাতেই সুসানকে দোষ দেওয়া যায় না। তাই আদর ভালবাসা নেটির চেয়ে কম পায় না সুসান। মেরি মাঝে মাঝে লরার কোলে দেয় নেটিকে, কিন্তু লরা শুধু তখনই ওকে কোলে নেয়, যখন সুসান অন্যদিকে তাকিয়ে আছে।

সন্ধ্যাটা চমৎকার কাটে ওদের। ট্র্যাপগুলো শেড থেকে চুলোর কাছে নিয়ে আসে বাবা, আগুনের ধারে বসে কব্জাগুলোয় গ্রিজ দেয়, ঘষে-মেজে পরিষ্কার করে। ছোট, মাঝারি, বড় সব রকম ফাঁদই পাতে বাবা জঙ্গলে। ভালুক ধরবার ফাঁদে পা পড়লে যে-কোন মানুষের হাড় ভেঙে যাবে পায়ের। ট্র্যাপগুলোয় তেলপানি দিতে দিতে নানান রকম মজার মজার গল্প বলে বাবা লরা আর মেরিকে। কাজ শেষ হয়ে গেলে বেহালাটায় সুর বাঁধে, তারপর অপূর্ব সুন্দর সব গান শোনায়। দারুণ গলা বাবার।

দরজা, জানালা আর চৌকাঠের ফাঁক-ফোকর কাপড় ঠেসে এমনভাবে বন্ধ করা হয়েছে যে সামান্যতম ঠাণ্ডাও আর ভিতরে ঢুকতে পারে না। কিন্তু ব্ল্যাক সুসান, মানে ওদের বেড়ালটা, যখন খুশি ঢুকতে বা বেরোতে পারে। সামনের দরজার নীচের দিকে ওর জন্য ক্যাট-হোল তৈরি করা আছে; ও ঢুকলে বা বেরোলে আপনিই বন্ধ হয়ে যায় ক্যাট হোলের দরজাটা।

দুই

দেখতে দেখতে তীব্র শীত এসে গেল। রোজ সকালে বন্দুক আর জানোয়ার ধরবার ফাঁদগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাবা। ডেরায় আশ্রয় নেওয়ার আগেই একটা মোটা-তাজা ভালুক মারতে চায় বাবা।

এক সকালে বেরোনোর কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল বাবা, স্লেডে ঘোড়া জুতে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে চলে গেল আবার। যখন ফিরে এল, দূর থেকে দেখা গেল মস্ত এক ভালুক মেরে এনেছে। লাফালাফি শুরু হয়ে গেল মেরি আর লরার। লাফাচ্ছে, হাত তালি দিচ্ছে আর তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

কাছে আসতে সবাই দেখল শুধু ভালুক না, একটা মোটাসোটা শুয়োরও আছে সঙ্গে।

হাতে বেয়ার-ট্র্যাপ আর কাঁধে বন্দুক নিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটছিল বাবা। হঠাৎ তুষারে ছাওয়া বড় একটা পাইন গাছের পিছনে দেখতে পেল ভালুকটাকে। সবে শুয়োরটাকে মেরে দুই হাতে তুলছে মুখের কাছে খাবে বলে। এক মুহূর্ত দেরি না করে গুলি করল বাবা।

'শুয়োরটা কার বা কোত্থেকে এসেছে জানার উপায় নেই। তাই নিয়ে এলাম,' গল্প শেষ করল বাবা।

মাংসের আর অভাব হবে না বহুদিন পর্যন্ত।

সন্ধ্যার দিকে সব কাজ শেষ হলে মা বসে যায় দুই মেয়ের জন্য কাগজের পুতুল তৈরি করতে। দুপাশ থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দেখে ওরা দুজন। শক্ত সাদা কাগজ কেটে পুতুলের আকৃতি বের করে মা প্রথমে, তারপর পেনসিল দিয়ে নাক-চোখ-ঠোঁট আঁকে। রঙিন কাগজ থেকে এরপর কেটে বের করে জামা-টুপি-লেস-

ফিতা। এগুলো জায়গা মত সাঁটিয়ে যার-যার পুতুল সুন্দর করে সাজাবার দায়িত্ব মেরি আর লরার।

এইসব মজার খেলা নিয়ে মেতে থাকে ওরা সন্ধ্যার সময়, কিন্তু আসল মজা হয় রাতে বাবা বাড়ি ফিরলে।

ঘরে ফিরে প্রথমেই বাবা দরজার উপর দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে বন্দুক; কোট, টুপি আর দস্তানা খুলে হাঁক ছাড়ে, 'আমার আধ-বোতল, মিষ্টি সাইডারটা কই রে!'

লরা বেশি ছোট বলে ওকে এই নামে ডাকে বাবা।

দৌড়ে এসে কে কার আগে বাবার হাঁটুতে চড়ে বসবে তার প্রতিযোগিতা লেগে যায় দুই বোনের মধ্যে। বাবা যতক্ষণ চুলোর ধারে গা গরম করে ততক্ষণ নামে না ওরা হাঁটু থেকে। খানিক পর আবার কোট, টুপি, দস্তানা পরে বাবা যায় গরু আর ঘোড়াকে খাওয়াতে, দুধ দোয়াতে; ফিরে আসে এক বোঝা কাঠ নিয়ে—সারারাত ঘর গরম রাখবে এই কাঠ।

যেদিন ফাঁদে কোনও শিকার পড়ে না, কিংবা আগেভাগেই শিকার পেয়ে যায়, সেদিন যত শীঘ্রি পারে ফিরে আসে বাবা মেরি আর লরার সঙ্গে খেলা করবে বলে।

'পাগলা-কুকুর' খেলাটা ওদের ভারি পছন্দ। দুই হাতের সবকটা আঙুল ঘন তামাটে চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে চুলগুলো খাড়া করে তোলে বাবা, তারপর চাপা, রাগী গর্জন ছেড়ে চার হাত-পায়ে তাড়া করে মেয়েদের। সারা ঘরময় তাড়িয়ে বেড়ায় লরা আর মেরিকে, কোণঠাসা করবার চেষ্টা করে।

ওরাও উল্লসিত চিৎকার ছেড়ে বাউলি কেটে সরে যায় নাগালের বাইরে। একবার চুলোর পিছনে কাঠ রাখবার বাক্সটার কাছে আটকে ফেলল বাবা ওদের দুজনকে, পালাবার আর উপায় নেই। এইবার দেখবার মত হলো বাবার তর্জন-গর্জন আর আস্ফালন। চোখ গরম করে এমনই লাফালাফি শুরু করল যে মনে হলো সত্যিই বুঝি কামড়ে দেবে। ভয়ে কাঠ হয়ে গেল মেরি, নড়তে পারছে না; কিন্তু বাবা লরার দিকে এগোতেই তীক্ষ্ণ এক চিৎকার দিয়ে মেরিকে টেনে নিয়ে একলাফে পেরিয়ে গেল সে কাঠের বাক্সটা।

মুহূর্তে বাবাতে পরিণত হলো পাগলা কুকুরটা, জ্বলজ্বল করছে নীল চোখ, অবাক হয়ে দেখছে লরাকে। 'আশ্চর্য! আধ-বোতল সাইডারের এত শক্তি! তোমার গায়ে দেখছি ফরাসী ঘোড়ার জোর!'

'ওদের এত ভয় দেখাও কেন, চার্লস্?' মা বলল, 'চোখগুলো দেখো, যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।' মাথা ঝাঁকিয়ে তাক থেকে বেহালাটা পেড়ে নিল বাবা। বাজনার সঙ্গে গান ধরল:

'ইয়াঙ্কি ডুড্‌ল্ ওয়েন্ট টু টাউন,
হি উওর হিয স্ট্রাইপড্ ট্রাউযিস্,
হি সুওর হি কুড্‌ন্‌ট্ সী দ্য টাউন,
দেয়ার উঅয সো মেনি হাউযেস্।'

পাগলা কুকুরের কথা ওরা ভুলে গেছে ততক্ষণে।

বিশাল অরণ্যে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোট্ট বাড়িটা। বাইরে প্রচণ্ড শীত, কিন্তু বাড়ির ভিতরটা গরম হয়ে রয়েছে আগুনের আঁচে। সুখী ওরা। বাবা, মা, মেরি, লরা আর ছোট্ট ক্যারির এ-মুহূর্তে সুখের সীমা নেই।

চুলোয় গনগনে আগুন, শীত আর হিংস্র জন্তুরা বাইরে, জ্যাক আর ব্ল্যাক সুসান চোখ মিটমিট করছে আলোর দিকে চেয়ে। মা তার রকিং চেয়ারে দোল খেতে খেতে সেলাই করছে। ঝকঝকে ল্যাম্প ছড়াচ্ছে উজ্জ্বল আলো। ল্যাম্পের নীচের পাত্রে কেরোসিনের সঙ্গে লবণ মেশানো হয়েছে, যাতে কোনভাবেই বিস্ফোরণ না ঘটে।

এমনি সময়ে গল্প শোনায় বাবা। তার আগে মেরি আর লরাকে হাঁটুর উপর তুলে নিয়ে লম্বা দাড়ি দিয়ে ওদের গলায় সুড়সুড়ি দেয়। ওরা হেসে উঠলে বলে, 'আজ কীসের গল্প শুনবে? প্যানথার?'

'বলো, বলো!' চেঁচিয়ে ওঠে দুবোন।

'তোমরা জানো, প্যানথার আসলে বিরাট এক বুনো বিড়াল?'

'ব্ল্যাক সুসানের মত?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওর চেয়ে বহু-বহুগুণ বড়। তেমনি ভয়ঙ্কর হিংস্র। এবার শুরু করা যাক এক প্যানথার আর তোমাদের দাদার গল্প।'

দাদাকে চেনে লরা। এই জঙ্গলেই অনেক দূরে থাকে দাদা মস্ত বড় এক কাঠের বাড়িতে। নড়েচড়ে আরাম করে বসল সে বাবার হাঁটুর উপর।

'শহরে গিয়েছিল তোমাদের দাদা, ওখান থেকে রওনা হতে দেরি করে ফেলেছে। খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়েও জঙ্গল পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। পথ ভাল করে দেখা যায় না। এমনি সময় কাছেই প্যানথারের ডাক শুনে ভড়কে গেল—সঙ্গে বন্দুক নেই।'

'প্যানথার ডাকে কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল লরা।

'শুনলে মনে হবে কোনও মেয়েমানুষের আর্ত চিৎকার,' বলল বাবা। 'ঠিক এই রকম,' বলেই প্যানথারের ডাক নকল করে এমনই এক চিৎকার দিল বাবা যে চমকে লাফিয়ে উঠল মা।

'হায়, খোদা! করো কী!'

ভয়ে বাবার বুকের সঙ্গে সেঁটে গেছে লরা আর মেরি। কিন্তু এরকম ভয় পেতে ভালবাসে ওরা।

'এদিকে দাদাকে পিঠে নিয়ে জোর কদমে ছুটল ঘোড়া, কারণ ওটাও ভয় পেয়েছে। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে প্যানথারের সঙ্গে দৌড়ে পারবে কেন? এক গাছের ডাল থেকে আর এক গাছের ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে আসছে ওটা। বোঝা গেল খুবই ক্ষুধার্ত প্যানথারটা, ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্রমে এগিয়ে আসছে। একবার রাস্তার এপাশ থেকে ডাক দেয়, একবার ওপাশ থেকে।

'ঘোড়াটাকে আরও জোরে ছোটানোর চেষ্টা করল দাদা, সামনে ঝুঁকে বসল, কিন্তু প্রাণপণে দৌড়েও প্যানথারটাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারল না ঘোড়া। ওটার ডাক এগিয়ে আসছে আরও।

'এমনি সময় ওপরে চোখ যেতেই দাদা দেখতে পেল ওটাকে। বিশাল এক

কালো প্যানথার। একবার যদি ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে পারে, কয়েক সেকেন্ডেই নখ আর দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফালাফালা করে ফেলবে।

'জান-প্রাণ নিয়ে ছুটছে ঘোড়া। যেন বিড়ালের ভয়ে পালাচ্ছে ইঁদুর। এখন আর ডাক ছাড়ছে না প্যানথার, দেখাও যাচ্ছে না ওটাকে; কিন্তু কোনও সন্দেহ নেই, আসছে ওটা। বাড়ির কাছে এসে পড়ল ঘোড়াটা। হঠাৎ একপাশে তাকিয়ে দেখল দাদা লাফ দিতে যাচ্ছে প্যানথারটা। দেখে নিজেও একলাফে ঘোড়া থেকে নেমে দৌড়ে দরজার কাছে পৌঁছে গেল, এক ধাক্কায় দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেই দড়াম করে লাগিয়ে দিল ওটা। দরজা বন্ধ হওয়ার আগ মুহূর্তে পরিষ্কার দেখতে পেল, ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে পড়েছে প্যানথারটা—একটু আগে ঠিক যেখানে বসে ছিল তোমাদের দাদা।

'ভয়ানক এক আর্ত চিৎকার ছেড়ে দৌড় দিল ঘোড়াটা। জঙ্গলের দিকে ছুটছে ঘোড়া, আর ওর পিঠে চড়ে বসে চার-পায়ের নখ দিয়ে প্যানথারটা চিরে ফালাফালা করছে ওর শরীর। চট্ করে বন্দুকটা তুলে নিয়ে জানালা দিয়ে গুলি করল দাদা। ধড়াস করে মাটিতে পড়ল প্যানথার। মরা।

'সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করল তোমাদের দাদা, জীবনে আর কোনদিন বন্দুক না নিয়ে জঙ্গলে যাবে না।'

গল্প শুনে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে মেরি আর লরার, কাঁপছে ছোট্ট বুক—যদিও জানে, দুই হাতে দুজনকে জড়িয়ে ধরে আছে বাবা, কোনও ভয় নেই।

তিন

প্রতি রাতে গল্প শুরু করবার আগে পরদিন শিকারের জন্য বুলেট বানায় বাবা। লরা আর মেরি তার হেলপার। সীসার বাক্স, লম্বা হাতলওয়ালা চামচ আর বুলেট তৈরির মোল্ড নিয়ে আসে ওরা, তারপর, বাবার দু'পাশে বসে কাজ দেখে।

প্রথমে চামচের মধ্যে সীসের টুকরো ফেলে আগুনে দিয়ে গলায় বাবা ওগুলোকে, তারপর সাবধানে ঢালে বুলেট-মোল্ডে, এক মিনিট অপেক্ষা করে মোল্ডটা খুললেই টুপ করে চকচকে একটা বুলেট পড়ে মেঝেতে।

ওরা জানে এখন ওটা ছোঁয়া উচিত নয়, খুব গরম; কিন্তু মাঝে মাঝে লোভ সামলাতে না পেরে ছুঁয়ে ফেলে। গরম ছ্যাঁকা লেগে হাত পুড়ে গেলেও ওরা উচ্চবাচ্য করে না। কারণ বাবা ওদের পই-পই করে নিষেধ করেছে সদ্য তৈরি বুলেট যেন না ছোঁয়। এখন আঙুল যদি পোড়ে, ওরা জানে দোষ ওদেরই; চট্ করে মুখে পুরে ঠাণ্ডা করে ওটা।

যথেষ্ট পরিমাণে বুলেট তৈরি হয়ে গেলে ছুরি দিয়ে চেঁছে বুলেটের সামান্য এবড়োখেবড়ো জায়গাগুলো সমান করে বাবা, তারপর ভরে রাখে একটা বাকস্কিনের তৈরি ব্যাগে।

এবার বন্দুকটা ভালমত পরিষ্কার করে তেলটেল দিয়ে ঝক্‌ঝকে করে তোলে বাবা। তারপর লরা আর মেরিকে বলে, 'এবার লোড করব বন্দুকটা। তোমরা দুজন খেয়াল রেখো তো, কোথাও আবার ভুল না হয়ে যায় আমার।'

দুই বোন কড়া নজর রেখেও বাবার কোনও ভুল বের করতে পারে না।

লরার হাত থেকে গরুর শিঙে ভরা গানপাউডার নিয়ে ধাতুর তৈরি ঢাকনিতে ঢালে বাবা বারুদ, তারপর সেগুলো ঢালে নলের ভিতর। বন্দুকটা ঝাঁকিয়ে আর নলে টোকা দিয়ে বারুদগুলো পাঠিয়ে দেয় একেবারে নীচে।

'আমার প্যাচ-বক্সটা গেল কই?' বললেই মেরি এগিয়ে দেয় ওটা। ছোট্ট একটা টিনের বাক্সে থরে থরে সাজানো আছে চর্বি মাখানো কাপড়ের টুকরো। একটা টুকরো বন্দুকের মুখে বসিয়ে তার উপর একটা নতুন বুলেট রেখে র‍্যামরড দিয়ে ঠেলে ওগুলোকে একেবারে নীচে পাঠিয়ে দেয়। তারপর র‍্যামরড দিয়ে ঠুকে ঠুকে শক্ত করে বসিয়ে দেয় বুলেট আর কাপড়টাকে বারুদের উপর। তারপর ব্যারেলের নীচে র‍্যামরডটা আটকে পকেট থেকে বের করে ক্যাপের বাক্স। হ্যামারটা টেনে উপরে তুলে পিনের নীচে একটা ক্যাপ বসিয়ে আস্তে করে সাবধানে নামিয়ে দেয় হ্যামার। হাত ফস্‌কে হ্যামারটা জোরে নেমে এলেই 'বুম' করে বেরিয়ে যাবে গুলি।

বন্দুক লোড করা হয়ে গেলে ওটাকে দরজার মাথায় দেয়ালের গায়ে বসানো দুটো হুকের উপর আলগোছে রেখে দেওয়া হয়, প্রয়োজনের মুহূর্তে যেন তৈরি পাওয়া যায় ওটাকে।

জঙ্গলে বেরোবার আগে পাঁচটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নেয় বাবা সব সময়। বুলেট-পাউচে যথেষ্ট বুলেট আছে কি না, টিনের প্যাচ-বক্সে টুকরো কাপড় আর ক্যাপ বক্সে ক্যাপ আছে কি না, পাউডার হর্নে যথেষ্ট বারুদ আছে কি না, আর বেল্টে ঝুলানো ছোট কুঠারটা সঙ্গে আছে কি না। সবশেষে লোড করা বন্দুকটা কাঁধে ফেলে নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে চলে যায় বাবা গহীন অরণ্যে। একটা গুলি করবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম কাজ হচ্ছে বন্দুক রিলোড করা, এটা কখনও ভোলে না বাবা। নইলে হিংস্র কোনও জন্তুর সামনে পড়ে গেলে বিপদ হতে পারে।

বন্দুকের পরিচর্যা শেষ হলেই শুরু হয় গল্পের আসর।

'বাবা, ওই গল্পটা বলো না,' লরা আবদার ধরে, 'ওই যে জঙ্গলে গলার স্বর।'

'না, না!' বাবা ভুরু কোঁচকায়। 'আমার ছোট বেলার দুষ্টামির কথা আর কতবার শুনবে?'

'শুনব, শুনব···আর একবার, প্লীজ, বাবা!' সমস্বরে অনুরোধ আসে। কাজেই শুরু করতেই হয় সে-গল্প।

'আমি যখন ছোট ছিলাম, এই ধরো মেরির সমান, প্রত্যেকদিন বিকেলে জঙ্গলে গিয়ে গরুগুলো তাড়িয়ে আনতে হোত আমাকে। আমার বাবা বলে দিয়েছিল, পথে যেন খেলতে লেগে না যাই, কারণ ভালুক, নেকড়ে আর প্যানথারের ভয় আছে; সন্ধের আগেই গরু নিয়ে ফিরতে হবে আমার বাড়িতে।

'একদিন একটু আগে আগেই রওনা হয়ে ভাবলাম আজ আর তাড়াহুড়ো করতে হবে না। দেখলাম, গাছের ডালে ছুটে বেড়াচ্ছে কাঠবেড়ালি, খরগোশ

খেলা করছে খোলা জায়গায়। আমিও খেলায় মেতে উঠলাম। যেন আমি বিরাট এক শিকারী, বুনো জানোয়ার আর ইন্ডিয়ানদের পেছনে এগোচ্ছি পা টিপে। তারপর যখন যুদ্ধ শুরু হলো, বীরের মত লড়াই করলাম, হাজার হাজার ইন্ডিয়ান মারা পড়ল আমার হাতে। লাফ-ঝাঁপ দিয়ে চারদিকে তলোয়ার চালাচ্ছি, হঠাৎ খেয়াল হলো, পাখিদের কিচিরমিচির বন্ধ হয়ে গেছে, আবছা দেখাচ্ছে রাস্তাটা, জঙ্গলে ঘন অন্ধকার!

'হায় হায়! এখন কী করি! এক্ষুণি ওগুলোকে খুঁজে না পেলে গোলাবাড়িতে ফিরতে আঁধার রাত হয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় গরুগুলো?

'কান পেতে ওদের গলার ঘণ্টা শোনার চেষ্টা করলাম, নাম ধরে ধরে ডাকলাম, কিন্তু একটা গরুও এল না। এদিকে ভয় লাগতে শুরু করেছে, অন্ধকারের ভয়, বুনো জন্তুর ভয়। কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভয় পাচ্ছি গরু না নিয়ে ঘরে ফিরতে। দৌড়াতে শুরু করলাম দিশেহারার মত, চিৎকার করে ডাকছি ওদের, খুঁজছি এদিক-ওদিক-সেদিক। ক্রমে আরও ঘনিয়ে আসছে আঁধার, দুর্ভেদ্য মনে হচ্ছে জঙ্গলটা, ঝোপ-ঝাড়-গাছ সব অন্যরকম দেখাচ্ছে।

'কোথাও খুঁজে পেলাম না গরুগুলোকে। পাহাড়ে উঠে ডাকলাম, অন্ধকার খাদে নেমে ডাকলাম, থেমে দাঁড়িয়ে কান পাতলাম, কিন্তু পাতার মর্মর ছাড়া আর কোনও সাড়াশব্দ নেই।

'হঠাৎ জোর ফোঁসফোঁস শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ পেয়েই মনে হলো নিশ্চয় কোনও প্যানথার এসে দাঁড়িয়েছে পিছনের অন্ধকারে। পর-মুহূর্তে বুঝলাম, ওটা আমার নিজেরই শ্বাসের শব্দ। হাঁপাচ্ছি।

'পা দুটো ছড়ে গেছে ঝোপঝাড়ের চোখা ডাল লেগে, কিন্তু থামলাম না, দৌড়াচ্ছি আর গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছি, "সুকি! সুকি!"

'ঠিক মাথার উপর থেকে কে যেন জিজ্ঞেস করল, "হু (কে)?"

'মুহূর্তে খাড়া হয়ে গেল আমার মাথার সব চুল।

'বিরক্ত কণ্ঠে উপর থেকে প্রশ্ন এল, "হু? হু?"

'আহ্, কী দৌড় যে দিলাম! গরুর চিন্তা দূর হয়ে গেছে মাথা থেকে, কোনমতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বাড়ি পৌঁছতে পারলে বাঁচি। প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটছি। ছুটছি তো না, যেন উড়ে চলেছি।

'কিন্তু সেই অশরীরী কণ্ঠস্বরটাও আসছে পিছন পিছন, থেকে থেকেই প্রশ্ন করছে, "হু?"

'দম বন্ধ করে ছুটছি। মনে হলো কেউ যেন পা ধরে টান দিল। হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম মাটিতে, কিন্তু এক গড়ান দিয়ে উঠে পড়লাম আবার। এমন জোরে ছুটলাম যে নেকড়ে বাঘও সেদিন পারত না আমার সঙ্গে দৌড়ে।

'শেষ পর্যন্ত জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পৌঁছে গেলাম গোলাবাড়ির সামনে। দেখি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবকটা গরু গেট খুলবার অপেক্ষায়। ওদের ভেতরে ঢুকিয়ে এক ছুটে বাড়ি চলে এলাম।

'আমার বাবা চোখ তুলে তাকাল, বলল, "এই যে, ভদ্রলোক, এত দেরি হলো কেন? খেলা করছিলে?"

'নিজের পায়ের দিকে নেমে গেল দৃষ্টি। দেখলাম এক পায়ের বুড়ো আঙুলের আস্ত নখটাই গায়েব। এতই ভয় পেয়েছিলাম যে এতক্ষণ পর্যন্ত একটু ব্যথাও লাগেনি।'

এ-গল্পটার এই পর্যন্ত এসেই থেমে যায় বাবা সব সময়, যতক্ষণ না অস্থির হয়ে লরা বলে ওঠে, 'কী হলো তারপর, বাবা? থামলে কেন, বলো না!'

'ও, হ্যাঁ,' বাবা শুরু করে আবার। 'তারপর তোমাদের দাদা আঙিনার গাছ থেকে একটা ডাল কেটে আনল। এনে আচ্ছামত পিট্টি দিল তোমাদের বাবাকে, যেন আর কোনদিন তার নির্দেশ ভুলে না যাই।

'"ছি, লজ্জা হওয়া উচিত! নয় বছরের বুড়ো ধাড়ির **কথা** মনে থাকে না! তোমাকে যখন যা করতে বলা হয়, তার উপযুক্ত কারণ থাকে, বুঝলে? কথা মত চললে বিপদে পড়বে না ভবিষ্যতে। বুঝেছ?"'

'হ্যাঁ, বললে তুমি,' লরা বলে উঠল, 'তারপর কী বলল দাদা?'

'বলল, "আমার কথা শুনলে রাত পর্যন্ত জঙ্গলে থাকতে না, আর তা হলে এমন ভয়ও পেতে হত না সাধারণ এক কাল-পেঁচার ডাক শুনে!"'

চার

ক্রিসমাসে লরাদের বাড়িতে বেড়াতে এল আঙ্কেল পিটার আর আন্ট ইলাইযা তিন ছেলেমেয়ে–পিটার, অ্যালিস আর এলাকে নিয়ে। সারাদিন মনের আনন্দে খেলল ওরা পাঁচজন, বড়রা নানান গল্প করল সুখ-দুঃখের।

সব বাচ্চাই বড়দিনের উপহার পেল সকালে ঘুম থেকে উঠে, সবাই খুশি; কিন্তু লরার আনন্দের কোন সীমা নেই। সুন্দর একটা কাপড়ের পুতুল পেয়েছে ও। পেনসিল দিয়ে আঁকা ভুরুর নীচে একজোড়া কালো বোতামের চোখ, গালে আর ঠোঁটে লাল রঙ, মাথায় কালো সুতোর কোঁকড়া চুল। এত সুন্দর পুতুল পেয়ে প্রথমে জবান বন্ধ হয়ে গেল ওর। কোলে নিয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকল ওটার দিকে অনেকক্ষণ, তারপর ভাষা ফিরে পেয়েই ওটার নাম রেখে দিল শার্লোট।

দিন যায়। একদিন, দুদিন করে বয়স বাড়ে লরার। হঠাৎ একদিন জানা গেল পাঁচ পূর্ণ হয়ে ছয় বছরে পা দিয়েছে ও। জন্মদিনে বাবা ওকে কাঠের একটা ছেলে-পুতুল বানিয়ে দিল, মা দিল পাঁচটা ছোট ছোট কেক, আর শার্লোটের জন্য নতুন জামা বানিয়ে দিল বড় বোন মেরি।

কী মজা! দিনগুলো যেন হাওয়ায় ভেসে উড়ে যাচ্ছে লরার।

দেখতে দেখতে এসে গেল বসন্তকাল। জমাট তুষার গলে যাচ্ছে। বাবা বলল, গোটা শীতে শিকার করা সমস্ত পশুর চামড়া এখনই শহরে নিয়ে গিয়ে বেচে আসা দরকার, নইলে পরে আর ভাল দাম পাওয়া যাবে না। এক সন্ধ্যায় মস্ত এক বোঁচকা বেঁধে ফেলল বাবা, এতই বেশি চামড়া হয়েছে এবার যে শক্ত করে বাঁধবার

পরও দেখা গেল ওটা বাবার সমান লম্বা হয়ে গেছে।

পরদিন খুব ভোরে উঠে বোঁচকাটা কাঁধে নিয়ে শহরের উদ্দেশে হাঁটা ধরল বাবা। ওজন এত বেশি হয়ে গেছে যে সঙ্গে বন্দুকটা নেওয়া গেল না। মাকে দুশ্চিন্তা করতে দেখে বাবা বোঝাল, এত ভোরে রওনা দিচ্ছে, খুব জোরে হাঁটতে পারলে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসা যাবে।

সবচেয়ে কাছের শহরটাও অনেক দূর। লরা বা মেরি কোনদিন শহর দেখেনি। পাশাপাশি দাঁড়ানো দুটো বাড়িও দেখেনি ওরা আজ পর্যন্ত। শুধু শুনেছে, শহরে অনেক বাড়ি আছে, স্টোর ভর্তি নানা রকম মিষ্টি আর সুন্দর সুন্দর কাপড় আছে; আরও আছে বারুদ, বুলেট, লবণ আর সাদা চিনি।

ওরা জানে, এইসব বন্যজন্তুর ছাল আর পশমের বদলে প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়াও অনেক সুন্দর সুন্দর উপহার নিয়ে আসবে বাবা ওদের জন্য; তাই গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে ওরা বেলা পড়ে আসতেই।

সূর্য ডুবে গেল, আঁধার হয়ে আসছে জঙ্গলের ভিতর, কিন্তু এল না বাবা। মা রাতের খাবার তৈরি করে টেবিল সাজাল, কিন্তু এল না বাবা। গোলাঘরের কাজগুলো সারবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এল না বাবা।

মা বলল, দুধ দোয়াতে যাবে, ইচ্ছে করলে লরা বাতি ধরবার জন্য সঙ্গে যেতে পারে।

কোট গায়ে চড়াল লরা, বোতাম লাগিয়ে দিল মা। গত ক্রিসমাসে পাওয়া লাল দস্তানাটা পরে নিল ও হাতে। লণ্ঠনের ভিতর মোমবাতিটা জ্বেলে দিল মা।

মার কাজে সাহায্য করতে যাচ্ছে বলে গর্ব হলো লরার, লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে মায়ের পিছু পিছু। জঙ্গলটা আঁধার, কিন্তু এদিকটায় অতটা অন্ধকার নেই। আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে পথ। কয়েকটা তারা ফুটেছে আকাশে।

গোলাবাড়ির গেটের কাছে সুকিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হলো লরা। মাও অবাক হয়েছে। সুকির তো এই সময় ঘরের বাইরে থাকবার কথা নয়। যাই হোক, হয়তো গরম এসে গেছে বলে ওর স্টলের দরজাটা খুলে রেখে গেছে বাবা। সেজন্য বেরিয়ে এসে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

গেটটা ঠেলা দিয়ে খুলবার চেষ্টা করল মা, কিন্তু সুকি দাঁড়িয়ে আছে বলে পুরোপুরি খোলা যাচ্ছে না।

'সুকি, সরে যা!' হাত বাড়িয়ে সুকির কাঁধে চাপড় দিল মা।

ঠিক সেই সময় লণ্ঠনের আলোয় লরা দেখল খয়েরী রঙের সুকির গায়ে লম্বা লম্বা কালো পশম দেখা যাচ্ছে, জ্বলজ্বল করছে ছোট ছোট দুটো চোখ। অথচ সুকির চোখ দুটো বড় বড়, শান্ত।

মা বলল, 'লরা, ঘরের দিকে ফিরে চলো।'

সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল লরা। মা আসছে ওর পিছন পিছন। কিছু দূর এসেই লণ্ঠন সহ ওকে কোলে তুলে নিয়ে দৌড় দিল মা। এক দৌড়ে ঘরে ঢুকে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা।

এবার লরা জিজ্ঞেস করল, 'মা, ভালুক ছিল না ওটা?'

'হ্যাঁ,' বলল মা। 'মস্ত এক ভালুক!'

মাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল লরা। 'মা, সুকিকে খেয়ে ফেলবে ওটা?'

'না, না,' বলল মা। 'গোলা ঘরে নিরাপদে আছে ও। ভেবে দেখো, অত শক্ত দেয়াল বা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকা কোনও ভালুকের পক্ষে সম্ভব? না। ঢুকতেই পারবে না, খাবে কী করে?'

'আমাদেরকে খেতে পারত, তাই না, মা?'

'হয়তো পারত, কিন্তু কই, খেয়েছে?' ওর পিঠ চাপড়ে দিল মা। 'লক্ষ্মী মেয়ের মত কোনও প্রশ্ন না করে যা বলেছি তাই করেছ তুমি, লরা; চট্ করে ঘুরেই হাঁটা ধরেছ।'

লরা লক্ষ করল, কাঁপছে মা। তারই মধ্যে হাসল একটু। 'একটা ভালুকের গায়ে চাপড় দিয়েছি! ভাবো একবার!'

বাবা এল না। লরা আর মেরি সাপার খেয়ে জামা-টামা খুলে প্রার্থনা সেরে শুয়ে পড়ল।

মা শুধু জেগে বসে আছে। বাতির ধারে বাবার একটা শার্টে তালি দিচ্ছে। বাবাকে ছাড়া গোটা বাড়িটা কেমন ঠাণ্ডা, চুপচাপ আর অদ্ভুত লাগছে।

বাতাস বইছে বিগ উড্‌সে, কান পেতে শুনছে লরা। কে জানে কোথায় আছে বাবা! কেমন যেন ভয়-ভয় একটা ভাব বাড়ির চারপাশে।

সেলাই শেষ করে শার্টটা ভাঁজ করল মা। হাত দিয়ে চেপে মসৃণ করল, তারপর দরজার কাছে গিয়ে ল্যাচ-স্ট্রিংটা গর্ত দিয়ে টেনে ভিতরে নিয়ে এল। বাইরে থেকে কেউ আর এখন দরজা খুলতে পারবে না, যতক্ষণ না ভিতর থেকে কেউ হুড়কো না তোলে। এবার ঘুমন্ত ক্যারিকে কোলে তুলে রকিং চেয়ারে গিয়ে বসল মা। লরা আর মেরি জেগে আছে টের পেয়ে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়ো। সব ঠিক আছে। কাল সকালে আসবে বাবা।'

মায়ের সঙ্গে লরা আর মেরিও জেগে থাকবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, ঘুমে ঢলে পড়ল এক সময়। সকালে উঠে দেখল রাতেই কখন যেন ফিরে এসেছে বাবা। ওদের জন্য মিষ্টি তো এনেইছে, দুজনের জন্য দুটো ক্যালিকো এনেছে—জামা তৈরি হবে ওগুলো দিয়ে। মায়ের জন্যও সুন্দর কাপড় কিনে এনেছে বাবা।

সবাই খুশি, ভাল দাম পাওয়া গেছে পশুর চামড়ার। সবাই খুশি, ফিরে এসেছে বাবা।

সকালে উঠে ভালুকের পায়ের ছাপ দেখল সবাই। গোলাঘরের দেয়ালে ওর নখের দাগও দেখা গেল। ঢুকতে পারেনি, ঘোড়াগুলো আর সুকি নিরাপদেই ছিল।

রাতে সাপার খেয়ে লরা আর মেরিকে দুই হাঁটুর উপর বসিয়ে বাবা বলল, নতুন একটা গল্প আছে, ওরা যদি শুনতে চায় তা হলে বলা যেতে পারে।

খুশিতে হৈ-হৈ করে উঠল ওরা, মা-ও কান খাড়া করল শুনবে বলে।

'গতকাল শহরের দিকে রওনা হয়ে দেখি নরম তুষারের উপর দিয়ে হাঁটতে খুব অসুবিধে হচ্ছে, এগোনো যাচ্ছে না। অনেক বেশি সময় লেগে গেল আমার শহরে পৌঁছতে। ততক্ষণে আরও অনেক লোক তাদের পশমের গাঁটরি নিয়ে

পৌঁছে গেছে। ওদের সঙ্গে দরদামে ব্যস্ত স্টোরকীপার, তাই ওখানেও অপেক্ষা করতে হলো অনেকক্ষণ।

'তারপর দরদামে কেটে গেল আরও অনেক সময়, সবশেষে আমি যা-যা কিনব সেসব জিনিস পছন্দ করা···এসব করতে করতেই সন্ধে হয়ে এল প্রায়।

'খুব জোরে হাঁটতে শুরু করলাম। কিন্তু একে কাদাটে হয়ে রয়েছে তুষার, তার উপর সারাদিনের ধকলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; কিছু পথ আসতে না আসতেই রাত হয়ে গেল। ভাবো একবার, বিগ উড্‌সের গভীর জঙ্গলে অন্ধকারে হাঁটছি আমি একা, সাথে বন্দুক নেই।

'যত জোরে পারা যায় হাঁটছি, কিন্তু ছয় মাইল হাঁটতে হবে আরও। বন্দুকটার জন্যে বড়ো আপসোস হলো, কারণ সকালে শহরের দিকে যাওয়ার সময় তুষারের ওপর ভালুকের পায়ের ছাপ দেখেই বুঝেছি শীতের ডেরা ছেড়ে বেশ কিছু ভালুক বেরিয়ে পড়েছে খিদের জ্বালায়। এখন ওদের একটার সামনে পড়লে মহা বিপদ হবে।

'আরও জোরে হাঁটার চেষ্টা করছি। খোলা জায়গায় তারার আলোয় আবছা দেখা যায়, কিন্তু জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটার সময় একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিচ্ছু দেখা যায় না। হাঁটছি, কিন্তু চোখ-কান সজাগ, যেন অসতর্ক অবস্থায় ক্ষুধার্ত ভালুকের সামনে পড়ে না যাই।

'ভাবতে ভাবতেই পড়ে গেলাম একটা ভালুকের সামনে। জঙ্গল থেকে একটা ফাঁকা জায়গায় বেরিয়েই দেখলাম সামনে রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে মস্ত এক ভালুক। পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে সোজা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তারার আলোয় জ্বলজ্বলে দুটো চোখ দেখলাম, শুয়োরের মত লম্বা নাক-মুখ দেখলাম, একহাতের থাবাও দেখলাম পরিষ্কার।

'থমকে দাঁড়ালাম। অনুভব করলাম সড়-সড় করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে মাথার চুল। ভালুকটা কিন্তু এগিয়ে এল না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছে আমাকে।

'বুঝতে পারলাম, একপাশ দিয়ে ঘুরে এগোবার চেষ্টা করে লাভ নেই। ও তখন অন্ধকার জঙ্গলে পিছু নেবে। আমার চেয়ে অনেক ভাল দেখতে পাবে ও জঙ্গলের ভিতর। অন্ধকারে একটা ক্ষুধার্ত ভালুকের সঙ্গে লাগতে যাওয়া নেহায়েত বোকামি হবে। ইশ্‌শ্! ভাবছি, বন্দুকটা যদি থাকত সাথে!

'বাড়ি ফিরতে হলে ভালুকটাকে ডিঙিয়েই যেতে হবে আমাকে। ভাবলাম, যদি ওটাকে ভয় দেখাতে পারি, ও হয়তো পথ ছেড়ে সরে যাবে। লম্বা করে দম নিয়ে প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে উঠে দৌড় দিলাম ওর দিকে, দুপাশে দু'হাত নাড়ছি।

'সরল না ওটা।

'আমিও চট্ করে থেমে গেলাম। বেশি কাছে গিয়ে মরব নাকি? আবার হুঙ্কার ছেড়ে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করলাম। চুপচাপ তাকিয়ে থাকল শুধু, ব্যাটা নড়ল না এক কদম।

'এই অবস্থায় পালাবার কথা ভাবলাম না। এর হাত থেকে পালিয়ে যদি যেতে পারিও, অন্য ভালুকের হাতে পড়ব না, তার কোনও ঠিক আছে? তারচেয়ে একটাকে মোকাবিলা করতে পারলে হয়তো অন্যগুলোকেও সামাল দিতে পারব।

তা ছাড়া পালাব কেন–তোমাদের মা আর তোমরা অপেক্ষা করছ আমার জন্যে।

'এদিক ওদিক খুঁজে একটা মোটাসোটা শক্ত ডাল পেয়ে গেলাম, তুষারের ভারে ভেঙে পড়েছে গাছ থেকে। দুই হাতে ওটা মাথার উপর তুলে প্রচণ্ড হাঁক ছেড়ে ছুটে গেলাম ভালুকটার দিকে। কাছে গিয়েই ধাঁই করে গায়ের জোরে মেরে দিলাম ওর চাঁদি লক্ষ্য করে।

'ও-মা! চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ওটা! কোথায় ভালুক, দেখলাম, ওটা কালো একটা পোড়া গাছের গুঁড়ি!

'যাওয়ার সময় ওটার পাশ দিয়েই গিয়েছি সকালে। মনের মধ্যে ভালুকের ভয়, তাই অন্ধকারে ওটাকেই ভালুক মনে করে লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছিলাম এতক্ষণ।'

'আসলে ভালুক ছিল না ওটা?' জিজ্ঞেস করল মেরি।

'না, মেরি। এতক্ষণ একটা গাছের গুঁড়িকে ভয় দেখাচ্ছিলাম।'

'আমাদেরটা কিন্তু সত্যিকার ভালুক ছিল,' বলল লরা। 'তবে ওকে সুকি মনে করে একটুও ভয় পাইনি আমরা।'

কিছু না বলে ওকে বুকের সঙ্গে আরেকটু চেপে ধরল বাবা।

'বাবা-রে! মাকে আর আমাকে ধরে খেয়ে ফেলতে পারত ভালুকটা! মা ওর গায়ে চাপড় দিতেও কিছু করেনি ও। কেন, বাবা? ও আক্রমণ করল না কেন?'

'আমার ধারণা, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিল ভালুকটা,' বলল বাবা। 'লণ্ঠনের আলো দেখে ভয়ও পেয়েছিল হয়তো। তোমার মা যখন ওর গায়ে থাবড়া দিয়েছে, ও বুঝে নিয়েছে মোটেও ভয় পাচ্ছে না ওকে তোমার মা।'

'তবে তুমিও খুব সাহসের কাজ করেছ, বাবা,' বলল লরা। 'ওটা পোড়া গাছের গুঁড়ি না হয়ে সত্যিকারের ভালুকও তো হতে পারত। তুমি তো ভালুক মনে করেই ওর মাথায় মেরেছিলে, তাই না, বাবা?'

'হ্যাঁ, লরা,' বলল বাবা, 'না মেরে উপায় ছিল না। আমাকে ফিরতেই তো হবে তোমাদের কাছে!'

অনেক রাত হয়ে গেছে বলে ওদের বিছানায় পাঠিয়ে দিল মা। নিজে সেলাই নিয়ে বসল আলোর পাশে। আর বাবা বসল চুলোর ধারে, জুতো জোড়ায় চর্বি মাখাবে বলে। গুনগুন করে গান গাইছে বাবা:

'পাখিরা গাইছিল সকালে সেদিন,
আইভির ফুলগুলো ফুটেছে তখন,
পাহাড় পেরিয়ে ভোর আসছিল সবে,
শুইয়ে দিলাম ওকে কবরে যখন।'

গান শুনতে শুনতে লরার দুচোখ ভেঙে এসে গেল ঘুম।

পাঁচ

বসন্তকালে দম ফেলবার ফুরসত নেই। গত বছর জঙ্গল কেটে যে জমি বের করা হয়েছে তাতে লাঙল টেনে বীজ বুনতে খুবই ব্যস্ত বাবা, কিন্তু তারই মধ্যে লরা আর মেরির জন্য একটা দোলনা ঝুলিয়ে দিয়েছে বাড়ির সামনে একটা গাছের ডালে।

সুকি আর রোজিকে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে জঙ্গলে। ঠিক সন্ধ্যার সময় গোলাবাড়িতে ফিরে আসে ওরা ওদের বাছুরগুলোর টানে।

এক সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফিরে লরাকে জিজ্ঞেস করল বাবা, 'আজ কী দেখেছি বলো তো?'

বলতে পারল না লরা।

'সকালে মাঠে কাজ করছি, হঠাৎ চোখ তুলে দেখি জঙ্গলের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা হরিণ। মেয়ে-হরিণ। ওর সঙ্গে কী ছিল তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না!'

'একটা বাচ্চা-হরিণ।' একযোগে চেঁচিয়ে উঠল লরা আর মেরি।

'হ্যাঁ। ঠিক ধরেছ। সঙ্গে বাচ্চাটা। বড়বড় গভীর কালো চোখ, ছোট্ট পা, নরম নাক। জঙ্গলের কিনারে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছিল ওটা আমাকে; হয়তো ভাবছিল: এটা আবার কে! একটুও ভয় পায়নি বাচ্চাটা আমাকে দেখে।'

'বাচ্চা হরিণকে তো তুমি গুলি করবে না,' জানতে চাইল লরা, 'করবে, বাবা?'

'কখ্খনো না! ওর মাকেও না, বাবাকেও না!' বলল বাবা। 'বাচ্চাগুলো বড় না হওয়া পর্যন্ত সব রকমের শিকার বন্ধ।'

এরপর বাবা জানাল, বীজ বোনা হয়ে গেলেই সবাইকে নিয়ে শহরে যাবে।

পরদিন থেকে শহরে যাওয়ার খেলা শুরু হয়ে গেল মেরি আর লরার। কিন্তু এ-খেলা তেমন জমল না, কারণ কেউ ওরা কোনদিন শহরে যায়নি, শহর কেমন হয় জানে না। তবে মুশকিল হলো নেটি আর শার্লোটকে নিয়ে—রোজই ওরা জিজ্ঞেস করে ওরাও সঙ্গে যেতে পারবে কি না। লরা আর মেরি কিছুতেই রাজি হয় না, বলে, 'না, লক্ষ্মী, এ-বছর তোমাদের নেয়া যাবে না। হয়তো আগামী বছর যেতে পারবে, যদি এখন থেকে ভাল হয়ে চলো।'

কয়েকদিন পরেই সেজেগুজে সবাই মিলে চলল ওরা শহরে। ওয়্যাগন বক্সটা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিয়েছে বাবা আগেই, ঘোড়াগুলোকেও ঘষে-মেজে চকচকে করা হয়েছে।

সাত মাইল দূরের এই শহরের নাম পেপিন। লেক পেপিনের তীরে গড়ে উঠেছে শহরটা।

'ওই দেখো শহর!' আঙুল তুলে দেখাল বাবা। তারপর উঁচু করে তুলে দেখাল লরা আর মেরিকে। এত বাড়িঘর দেখে দম বন্ধ হয়ে এল লরার। সেই ইয়াঙ্কি ডুড্‌লের অবস্থা—বাড়িঘরের জ্বালায় যে-বেচারা শহরই দেখতে পায়নি।

অসংখ্য বাড়ি। তবে ওগুলো গাছের গুঁড়ি সাজিয়ে তৈরি করা নয়, কাঠের তক্তা বসিয়ে বানানো। স্টোর হাউসটারও চারদিকে তক্তার বেড়া। বাড়িঘরের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখে বোঝা গেল ওখানে মানুষ বাস করে। একদল ছেলেমেয়ে খেলছে রাস্তায়। লেকের ধারে গাড়ি রেখে হেঁটে এগোল ওরা স্টোরের দিকে।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই স্টোর। বুক কাঁপছে লরার। তা হলে এই স্টোরেই পশুর ছাল বিক্রি করতে আসে বাবা! বাবাকে দেখেই কাউন্টারের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল স্টোর কীপার, স্বাগত জানাল বাবা-মাকে। মেরি মিষ্টি হেসে বলল, 'হাউ ডু ইউ ডু?' লরা ভিতর ভিতর এতই উত্তেজিত যে কোন কথাই বলতে পারল না।

মেরিকে চিবুকে হাত দিয়ে আদর করল দোকানদার, মা-বাবাকে বলল, 'চমৎকার ফুটফুটে মেয়েটি আপনাদের!' মেরির সোনালী চুলেরও প্রশংসা করল, কিন্তু লরা সম্পর্কে একটি কথাও বলল না। বোধহয় ওর তামাটে রঙের চুল তার পছন্দ হয়নি।

হরেক রকম মালামাল সাজানো রয়েছে দোকানে। একদিকের দেয়ালে তাকে সাজানো শুধু হরেক রঙের প্লেইন ও ছাপা কাপড়—লাল, নীল, সবুজ, গোলাপী, বেগুনী। কাউন্টারের একপাশে মেঝেতে রয়েছে বাক্সভরা পেরেক, গুলি, সীসার তাল আর লজেন্স। একপাশে বস্তাভরা গম, ভুট্টার দানা, লবণ, চিনি। এক পাশে ঝকঝকে নতুন একটা লাঙল দেখা গেল। তারই কাছাকাছি রয়েছে স্টীলের কুঠার, হাতুড়ির মাথা, করাত আর নানান জাতের ছোট-বড় ছুরি। একপাশে সাজানো নানান সাইজের জুতো, বুট। উপরে সিলিঙের সঙ্গে ঝুলানো রয়েছে ঘর-সংসারের অসংখ্য জিনিস: বালতি, বদনা, কেতলি, হাঁড়ি, প্যান—এত জিনিস যে লরার মনে হলো এক সপ্তাহ ধরে দেখলেও দেখা শেষ করতে পারবে না। আসলে এত জিনিস যে পৃথিবীতে আছে তা-ই ওর জানা ছিল না।

অনেকক্ষণ দরদাম করল বাবা-মা, অনেকগুলো কাপড়ের থান খুলিয়ে রঙ পছন্দ করল।

বাবার শার্টের জন্য দু-রকমের দুই পিস কাপড় আর জাম্পারের জন্য এক পিস ডেনিম পছন্দ করল মা। সেই সঙ্গে কিছু সাদা কাপড় নিল চাদর আর আন্ডারওয়্যার বানাবে বলে।

মা-র নতুন অ্যাপ্রনের জন্য ক্যালিকো কিনল বাবা, নিজের জন্য একজোড়া গাম-বুট আর কিছু পাইপের তামাক। মা নিল এক পাউন্ড চা, কিছু সাদা চিনি।

সব কেনা-কাটা শেষ হলে মেরি আর লরাকে দুটো লজেন্স দিল স্টোরকীপার। এতই আশ্চর্য আর খুশি হলো ওরা যে হাঁ করে চেয়ে রইল লজেন্সের দিকে। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় মেরি বলল, 'ধন্যবাদ।'

মুখ দিয়ে কথা সরছে না লরার। সবাই অপেক্ষা করছে। শেষে মা জিজ্ঞেস

করল, 'তুমি কিছু বলবে না লরা?'

কিছু বলবার জন্য মুখ খুলল লরা, তারপর ঢোক গিলল, শেষে ফিসফিস করে বলল, 'ধন্যবাদ!'

দুটো লজেন্সই হৃৎপিণ্ড আকৃতির। মেরিরটায় লেখা একটা পদ্য:

গোলাপ হলো লাল,
আর ভায়োলেট নীল,
চিনি হলো মিষ্টি,
তোমার সাথে মিল।

লরারটায় শুধু লেখা:

মিষ্টি মেয়ের জন্য।

গরম বালির উপর দিয়ে হেঁটে ওরা ফিরে এল ওয়্যাগনের কাছে। ওয়্যাগন বক্সের নীচে ঘোড়াদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছে বাবা। ওদের খাওয়ানো হয়ে গেলে পিকনিক বক্স খুলল মা।

সবাই গোল হয়ে বসে মাখন দিয়ে পাউরুটি, পনির, সেদ্ধ ডিম আর বিস্কুট খেল। বিশাল লেক পেপিনের ঢেউ এসে ভাঙছে ওদের পায়ের কাছে, ফিরে গিয়ে আবার আসছে। এত বড় আকাশ, এত খোলা জায়গা জীবনে দেখেনি লরা। নিজেকে খুবই ছোট মনে হলো ওর এই বিশাল জগতের তুলনায়।

ডিনার শেষ করে বাবা ফিরে গেল স্টোরে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে। ক্যারি না ঘুমানো পর্যন্ত ওকে কোলে নিয়ে দোল দিল মা। লরা আর মেরি লেকের পারে দৌড়ে দৌড়ে সুন্দর সুন্দর নুড়ি কুড়াল। এমন সুন্দর পাথর ওরা বিগ উড্‌সে দেখেনি কোনদিন।

বাবা ডাক দিতেই এক দৌড়ে ফিরে এল ওরা। ঘোড়া জুতে তৈরি হয়ে গেছে বাবা বাড়ি ফেরবার জন্য। লরাকে ওয়্যাগনে তুলে দিল বাবা, এই সময় ফড়াৎ করে পকেট ছিঁড়ে হড়-হড় করে পড়ে গেল সব পাথর। ভাল ড্রেসটার জন্য মনের দুঃখে কাঁদতে শুরু করল লরা।

বাবার কোলে ক্যারিকে দিয়ে মা এসে পরীক্ষা করল জামাটা। তারপর হাসল। 'কিছু হয়নি জামার। কান্না থামাও লরা, সেলাই খুলে গেছে শুধু পকেটের। বাড়ি গিয়েই ঠিক করে দিতে পারব। এরপর আর কোনদিন লোভীর মত বেশি বেশি পাথর কুড়িয়ে পকেটে ভরতে যেয়ো না।'

পাথরগুলো কুড়িয়ে কোঁচড়ে নিল লরা। বাবা ঠাট্টা করল ওকে, হাসল বেশি পাথর কুড়ানোর জন্য, কিন্তু ও তেমন কিছু মনে করল না।

এরকম বিপদ কখনও হয় না মেরির। সব সময় ভাল হয়ে চলে মেরি, সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। আচার-ব্যবহারে ভদ্রতা বজায় রাখে। সোনালী চুল আছে ওর, লজেন্সের গায়েও ওর জন্য সুন্দর পদ্য লেখা থাকে। লরার মনে হলো, এসব মস্ত অন্যায়; তার প্রতি এগুলো মস্ত বড় অবিচার।

বিগ উড্‌স্-এ এসে ঢুকল ওয়্যাগন। সূর্য ডুবে গেল এ-সময়, জঙ্গলের ভিতর ঘনিয়ে এল অন্ধকার। কিন্তু গোধূলির আলো মিলিয়ে যাওয়ার আগেই মস্ত একটা

চাঁদ উঠল আকাশে। কী সুন্দর যে লাগছে চাঁদটাকে! কোনও ভয় নেই ওদের, বাবার সঙ্গে বন্দুক আছে আজ।

নরম চাঁদের আলো এসে পড়ছে জঙ্গলের ভিতর পাতার ফাঁক গলে। ক্লপ্-ক্লপ্ আওয়াজ আসছে ঘোড়ার খুর থেকে। নরম গলায় গান ধরেছে বাবা:

আরাম, আয়েশ, সুখের খোঁজে যতই ঘুরি,
সকলের সেরা মানতেই হয়, নিজের বাড়ি।

ছয়

রোজ বিকেলে লরা আর মেরিকে ছোট ছোট কাঠের চিলতে সংগ্রহ করতে হয় সকালে চুলো ধরাবার জন্য। কাঠ কাটবার সময় কুড়ালের কোপে চল্টা উঠে ছিট্‌কে পড়ে এদিক ওদিক। সেগুলো দিয়ে চুলো ধরানো সুবিধে। কাজটা ওদের দুজনের খুবই অপছন্দ।

একদিন এই চিলতে সংগ্রহের সময় হঠাৎ ঝগড়া লেগে গেল দুই বোনে। সেদিন বেড়াতে এসেছিল লোটি আন্টি। সারাদিন মায়ের ফাই-ফরমাশ খাটতে খাটতে মেজাজ খারাপ ছিল দুজনেরই।

লরা বড়সড় একটা কাঠের চিলতে পেয়ে চট্ করে মেরির আগেই তুলে নিল ওটা। মেরি রেগে গিয়ে বলল, 'তাতে কী? আমার চুল পছন্দ করেছে লোটি আন্টি। তামাটে চুলের চেয়ে সোনালী চুল কত সুন্দর!'

গলা বুজে এল লরার, কথা বলতে পারল না। ও জানে সোনালী চুল তামাটে চুলের চেয়ে সুন্দর। কোনও জবাব দিতে না পেরে আচমকা ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল ও মেরির গালে।

পরমুহূর্তে বাবার গলা ভেসে এল। 'এটা কী হলো? লরা, এদিকে এসো!'

মাটিতে পা ঘষে অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে এগোল লরা। দরজার ওপাশেই বসে ছিল বাবা, দেখে ফেলেছে ব্যাপারটা।

'তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে,' বলল বাবা, 'আমি তোমাদের বলে দিয়েছি, কেউ কারও গায়ে হাত তুলবে না?'

লরা শুরু করল, 'কিন্তু মেরি আমাকে বলেছে...'

'মেরি কী বলেছে আমি শুনতে চাই না,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল বাবা, 'আমি কী বলেছি সেইটা মনে রাখতে হবে তোমাদের।'

দেয়ালে ঝোলানো ছিল চওড়া ফিতের মত এক ফালি চামড়া, সেটা পেড়ে নিয়ে বেশ কয়েক ঘা লাগাল বাবা আচ্ছামত।

ঘরের কোণে একটা চেয়ারে বসে বহুক্ষণ ধরে ফোঁপাল লরা, কান্না থামলেও গোমড়া মুখে বসে থাকল একই জায়গায়। একটাই সান্ত্বনা, মেরিকে একাই আজ সব চিলতে কুড়িয়ে ঝুড়ি ভরতে হয়েছে।

যখন সন্ধ্যা হয়-হয়, তখন ডাকল বাবা, 'এদিকে এসো, লরা।' গলাটা নরম। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ওকে দুইহাতে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিল বাবা। বাবার কাঁধে মাথা রাখল লরা, দাড়িতে ঢাকা পড়েছে একটা চোখ। ব্যস, সব ঠিক হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

মন দিয়ে শুনল বাবা ওর সব দুঃখের কথা। সব কিছু বলে ফেলে মনটা হালকা হয়ে গেল লরার। শেষে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তোমার তো তামাটে চুলের চেয়ে সোনালী চুল বেশি ভাল লাগে না, তাই না, বাবা?'

ওর পিঠে চাপড় দিয়ে সান্ত্বনা দিল বাবা, মৃদু হেসে বলল, 'আমার চুলের কী রঙ, লরা?'

আরে, তাই তো? বাবার চুল-দাড়ি সবই তো তামাটে। অথচ কী সুন্দর! বুকের উপর থেকে যেন পাষাণ নেমে গেল লরার। খুশি মনে ভাবল, বেশ হয়েছে, কাঠের টুকরো সব তুলতে হয়েছে মেরিকে। মারলে কী হবে, আদরও তো করেছে বাবা!

গ্রীষ্মকালে আত্মীয়-স্বজন আর প্রতিবেশীরা বেড়াতে আসে বটে, কিন্তু খোঁজ-খবর নিয়েই যে-যার কাজে ফিরে যায়। সবারই কাজের খুব চাপ। সারাদিন খেটে এতই ক্লান্ত থাকে বাবা যে গল্প বলা বা বেহালা বাজিয়ে গান গাওয়া, কিছুই সম্ভব হয় না।

এদিকে মাও খুব ব্যস্ত। লরা আর মেরিও মার সঙ্গে সব্‌জি-বাগানের আগাছা পরিষ্কার করে, মুরগি আর বাছুরগুলোকে দানাপানি দেয়, মুরগির কট্-কট্ আওয়াজ পেলেই খুঁজে-পেতে ডিম নিয়ে আসে, পনির বানানোর কাজে সাহায্য করে মাকে।

আঙ্কেল হেনরির কাছ থেকে একটা যন্ত্র ধার করে আনবে বলে একদিন খুব সকাল-সকাল বেরোল বাবা, কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এসে তাড়াহুড়ো করে ঘোড়া জুততে শুরু করল ওয়্যাগনে। তারপর বাড়িতে যেখানে যত বাটি, বালতি আর কাঠের বাকেট আছে সব তুলতে শুরু করল ওয়্যাগনে, দুটো ওয়াশ টাবের সঙ্গে ওয়াশ বয়লারও তুলল গাড়িতে, একটা কুড়ালও সঙ্গে নিল।

'এতকিছু লাগবে কি না জানি না, ক্যারোলিন,' বলল বাবা, 'কিন্তু নিয়ে যাচ্ছি যদি লাগে তাই ভেবে; নইলে পরে আফসোসের সীমা থাকবে না।'

'কী হয়েছে, বাবা, কোথায় চললে?' উত্তেজনায় উপর-নীচে লাফাচ্ছে লরা।

'একটা গাছের খোঁড়লে মৌচাকের খোঁজ পেয়েছে তোমার বাবা,' বলল মা। 'মধু পাওয়া যেতে পারে ওখানে।'

দুপুরের দিকে ফিরল বাবা ওয়্যাগন নিয়ে। ছুটে গেল লরা গাড়ির পাশে, কিন্তু ভিতরে কী আছে দেখতে পেল না।

বাবা হাঁক ছাড়ল, 'ক্যারোলিন, মধুর বাটিটা নিলে আমি ঘোড়াগুলো খুলতে পারি।'

হতাশ হয়েছে মা, তবু বলল, 'এক বাটিও কম না, চার্লস, বাচ্চারা খুশি হবে।' ওয়্যাগনের ভিতর চোখ পড়তেই দুই হাত আকাশে ছুঁড়ল মা, 'আরি সর্বনাশ!' হেসে উঠল বাবা।

প্রত্যেকটা বাটি, বালতি, বাকেট, এমন কী ওয়াশটাব আর ওয়াশ বয়লার ভর্তি হয়ে আছে মধু ভরা মৌচাকে। বাবা-মা দুজন মিলে একটা একটা করে সবগুলো পাত্র বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখল।

একটা প্লেটে উঁচু করে চাকের অনেকগুলো টুকরো তুলে টেবিলে রাখল মা, বাকি সব পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখল।

দুপুরে ডিনারে বসে তৃপ্তির সঙ্গে টাটকা চাকভাঙা মধু খেল ওরা সবাই যার যত খুশি। তারপর শোনাল বাবা গল্পটা।

'সঙ্গে বন্দুক নিইনি, কারণ, শিকারে নয়, যাচ্ছি কাজে। আর জানি প্যানথার আর ভালুকগুলো এসময়টায় খেয়েদেয়ে এতই মোটাতাজা থাকে যে নেহায়েত বিপদে না পড়লে কাউকে আক্রমণ করে না। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে শর্টকাট করতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে গেলাম একটা ভালুকের সামনে। একটা ঝোপকে পাশ কাটিয়েই দেখি কয়েক হাত সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইয়াবড় এক ভালুক।

'ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল একবার ভালুকটা। খুব সম্ভব বন্দুক নেই টের পেয়ে আমার পেছনে আর সময় নষ্ট না করে নিজের কাজে মন দিল।

'দেখি বিশাল মোটা একটা ফাঁপা গাছের খোঁড়লে হাত ভরছে ওটা, ওর চারপাশে পাগলের মত ভন ভন করে উড়ছে অসংখ্য মৌমাছি। ঘন, লম্বা পশমের জন্য হুল ফুটাতে পারছে না ওর গায়ে, নাকে-মুখে যেই দু-চারটা বসতে যাচ্ছে, অমনি এক হাতের থাবা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে।

'খোঁড়ল থেকে একটা থাবা বের করতেই দেখি সোনালী মধু ঝরছে ওটা থেকে। চেটেপুটে মধুটুকু খেয়ে আবার ঢুকাল থাবা গর্তের মধ্যে। চারপাশে তাকাতেই একটা মোটাসোটা লাকড়ি পেয়ে গেলাম। ভাগাতে হবে ব্যাটাকে এখান থেকে–ওই মধু আমার চাই।

'এমনই শোরগোল তুললাম, লাকড়ি দিয়ে খটাখট্ মারলাম একটা গাছের গায়ে যে মহা বিরক্ত হয়ে থাবা থেকে মধুটুকু চেটে নিয়ে ওটা চারপায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল একদিকে। আমিও পিছু পিছু তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম ওকে বেশ কিছুদূর, তারপর একছুটে চলে এলাম এখানে ওয়্যাগনটা নিতে।

'তারপর তো দেখতেই পাচ্ছ।'

সাত

বাবা আর আঙ্কেল হেনরি সবসময় একে অপরের কাজে সাহায্য করে। বাবার ফসল কাটবার সময় হলে পলি আন্টি আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে আসে আঙ্কেল হেনরি; সবাই সারাদিন গল্প-গুজব করে কাজ সেরে সন্ধ্যায় ফিরে যায় বাড়িতে। আঙ্কেল হেনরির ফসল পাকলে সবাইকে নিয়ে বাবা যায় তার ওখানে। সারাদিন বাচ্চারা মহানন্দে খেলাধুলা করে, মা আর আন্টি খাবারের বন্দোবস্ত করে, বাবা

আর আঙ্কেল ফসল কাটে।

আঙ্কেল হেনরির ছেলে চার্লির বয়স এখন এগারো চলছে। বেশি বেশি আদর পেয়ে চার্লি একটু বেয়াড়া মত হয়ে গেছে। বাচ্চাদের খেলায় বাগড়া দিয়ে বিরক্ত করে, বড়দের কাজেও কোন সাহায্য করে না।

সবাইকে আঙ্কেল হেনরির বাড়িতে রেখে বাবা গেছে ফসল কাটতে।

মাঠে প্রচণ্ড খাটুনি খাটতে হচ্ছে বাবা আর আঙ্কেল হেনরিকে। যত দ্রুত সম্ভব কাজ সারবার চেষ্টা করছে দুজন, নইলে বৃষ্টি এসে সব নষ্ট করে দেবে, আঙ্কেল হেনরির সারা বছরের ফসল আর ঘরে তোলা হবে না। বাতাসের ভারী ভারী ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে বৃষ্টির আর দেরি নেই।

দুপুরে বাড়ি ফিরে সামান্য কিছু নাকে-মুখে গুঁজে উঠে পড়ল দুজন, মাঠে যেতে হবে। আঙ্কেল হেনরি ডাকল চার্লিকে, 'চলো, তুমিও চলো। আমাদের কাজে অনেক সাহায্য হবে তুমি থাকলে।'

বাড়িতে মেহমান না থাকলে সাফ মানা করে দিত চার্লি, কিন্তু সবার সামনে কিছু বলতে পারল না, বড়দের সঙ্গে চলে গেল মাঠে অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

সেদিন রাতে বাড়ি ফেরবার পথে বাবার মুখে শোনা গেল চার্লির কীর্তি।

মাঠে গিয়ে সাহায্য করা তো দূরে থাক যত ভাবে পেরেছে কাজে ডিসটার্ব করেছে বেয়াড়া ছেলেটা। বোঝা এখান থেকে ওখানে নিতে পারবে না, আঁটি বাঁধতে পারবে না, কাস্তে ধার দিতে পারবে না, পানির জগটা এগিয়ে দিতে পারবে না–কিছুই সে পারবে না। আঙ্কেল হেনরির ধমক খেয়ে কিছুক্ষণ মুখ হাঁড়ি করে রেখে জানাল গরম লাগছে রোদে। কাস্তে ধার করবার পাথরটা পাওয়া গেল না জায়গা মত, অনেক খুঁজে বের করতে হলো লুকানো জায়গা থেকে।

পিছন পিছন ঘুরছে আর ঘ্যান-ঘ্যান করছে দেখে শেষ পর্যন্ত ওকে খেদিয়ে দিল আঙ্কেল হেনরি, 'যাও, দূর হও এখান থেকে। ওই গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে থাকো!'

মুচকি হেসে কিছুদূর গিয়েই তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল চার্লি। যে-যার বোঝা ফেলে বাবা আর আঙ্কেল হেনরি ছুটল কোনাকুনি মাঠের উপর দিয়ে চার্লির দিকে। সাপ আছে জই খেতে।

চার্লির কাছে গিয়ে দেখা গেল কিছুই হয়নি। হাসছে ও। 'এই একটু ধোঁকা দিলাম তোমাদের!'

দুঃখের হাসি হাসল বাবা। বলল, 'আমি যদি হেনরি হতাম, তক্ষুণি চাবুকে ওর পিঠের চামড়া তুলে নিতাম। অথচ হেনরি কিছুই বলল না।'

যাক, পানি খেয়ে আবার কাজে মন দিল ওরা। কিন্তু আরও তিন-তিনবার চার্লির কাছে দৌড়ে যেতে বাধ্য হলো বাবা আর আঙ্কেল হেনরি–এমনই মরণ চিৎকার দিল সে। ব্যাপারটাকে মজার রসিকতা ধরে নিয়েছে ও, হাসছে চোখ মটকে। তাও, চড় কষাচ্ছে না আঙ্কেল হেনরি। ফিরে গিয়ে মন দিচ্ছে কাজে। গজর গজর করছে।

এর পরেরবারে আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল চার্লি। চোখ তুলে দেখল বাবা আর আঙ্কেল হেনরি, লাফাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে চার্লি। একবার তাকিয়েই যে-যার

নিজের কাজে মন দিল ওরা—চেঁচাক, বারবার কাজ ফেলে ডেঁপো ছোঁড়ার পেছনে ছোটা যায় না।

এদিকে চার্লির চিৎকার তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হচ্ছে, ধেই-ধেই করে নাচছে সে, হাত-পা ছুঁড়ছে পাগলের মত। বাবা কিছুই বলল না, কিন্তু আঙ্কেল হেনরি বলল, 'মরুক চেঁচিয়ে—গেলেই দেখা যাবে কিছু হয়নি।'

আরও কিছুক্ষণ কাজ করবার পর আর থাকা গেল না। ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে আর অর্ধেক জবাই করা মোরগের মত লাফাচ্ছে চার্লি মাঠের উপর, থামছে না। 'চলো তো দেখি,' অবশেষে বলল আঙ্কেল হেনরি, 'এবার হয়তো সত্যিই কিছু হয়েছে।' বোঝা নামিয়ে রেখে মাঠ পেরিয়ে চলল ওরা চার্লির দিকে।

দেখা গেল ভীমরুলের চাকের উপর নাচছিল এতক্ষণ চার্লি!

ছোট এক জাতের ভীমরুল বাসা বানিয়েছে মাটিতে। রসিকতা করতে গিয়ে সেই চাকের উপর পা দিয়ে ফেলেছে চার্লি। ফলে ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে এসেছে উজ্জ্বল হলুদ জ্যাকেট পরা সৈনিক ভীমরুল, চারদিক থেকে ঘিরে ধরে বিষাক্ত হুল ফুটাচ্ছে ওর শরীরে যত্রতত্র। নাক-মুখ-হাত-গলা-ঘাড় কোথাও বাদ নেই, কিছু প্যান্টের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে হুল বিঁধাচ্ছে, কিছু কলারের ফাঁক দিয়ে ঢুকে নামছে নীচের দিকে। যতই চেঁচায়, যতই লাফায় ততই ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসে ভীমরুল।

দুজন ওর দুই হাত ধরে ওকে শূন্যে তুলে দৌড়ে সরে গেল ভীমরুলের বাসার কাছ থেকে, তারপর একজন ওর জামাকাপড় খুলে ভিতরে ঢুকে পড়া ভীমরুলগুলো ঝেড়ে দূর করল, অন্যজন ওর গা থেকে টেনে তুলে মারল এখনও যেগুলো হুল ফুটাচ্ছে সেগুলোকে।

জামা-কাপড় পরিয়ে বাড়ির দিকে ঠেলে দিল ওকে আঙ্কেল হেনরি। 'আর কোনও মস্করা না—সোজা বাড়ি চলে যাও। তোমাকে আনাই ভুল হয়েছে আমার।'

আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল ও বাড়ির দিকে।

এর পরেরটুকু লরা জানে।

ওকে দেখে খেলা ফেলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ছোটরা সবাই। চেহারা চেনা যাচ্ছে না।

ভীমরুলের কথা শুনে পলি আন্টি আর মা এক বালতি কাদা গুলে ওর সারা গায়ে মাখিয়ে দিল, তারপর কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে এমন ভাবে বাঁধল ওর সারা শরীর যে ফোলা নাকটা ছাড়া আর কিছুই থাকল না বাইরে।

অনেক রাত করে ফিরল বাবা আর আঙ্কেল হেনরি। সমস্ত জই কাটা হয়ে গেছে, এখন যত খুশি বৃষ্টি হোক, কোন ক্ষতি নেই।

সাপারের জন্য অপেক্ষা করে সময় নষ্ট করতে চাইল না বাবা। গরুগুলোকে দোয়াতে হবে বাড়ি ফিরে। নইলে দুধ কমে যাবে। খুব তাড়াতাড়ি ওয়্যাগনে ঘোড়া জুতে রওনা হয়ে গেল ওরা বাড়ির পথে।

অনেক রাতে ঝুপঝুপিয়ে নামল বৃষ্টি।

আট

হেমন্ত এসে গেছে। গরুগুলোকে গোলাবাড়িতে নিয়ে আসা হলো। গাছের সবুজ পাতাগুলো হলুদ হয়ে আসছে। আর বৃষ্টি! পড়ছে তো পড়ছেই।

বাইরে খেলা যাচ্ছে না। তবে তাতে অসুবিধেও নেই, বৃষ্টির দিনে বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে বাড়িতে। সন্ধ্যার পর মধুর সুরে বেহালা বাজায় বাবা, গান গায়।

বৃষ্টি থামল। ঠাণ্ডা হয়ে এল আবহাওয়া। সারাক্ষণই এখন আগুন জ্বলে চুলোয়, ঘর গরম রাখতে। শীতের আর দেরি নেই। চিলেকোঠা আর তলকুঠুরিতে জমা হয়েছে শীতের সঞ্চয়।

একদিন গোলাবাড়ির কাজকর্ম সেরে বাবা এসে বলল রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর হরিণ-শিকারে বেরোবে। এতদিনে বাচ্চারা বড় হয়ে গেছে, কাজেই হরিণ-শিকারে আর কোন অসুবিধে নেই। তাজা মাংস পায়নি ওরা বসন্তকালের পর থেকে।

ফাঁকা কিছুটা জমিতে লবণ ছড়িয়ে বহুদিনের চেষ্টায় একটা 'ডিয়ার-লিক' তৈরি করেছে বাবা। হরিণ এসে লবণের প্রয়োজনে ওই মাটি চাটে। এখন সেই জমির আশেপাশে গাছে উঠে অপেক্ষা করবে বাবা।

সাপার সেরেই বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে গেল বাবা। আজ আর গান বা গল্প শোনা হলো না লরা আর মেরির। ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই দৌড়ে গেল ওরা জানালার ধারে। কিন্তু গাছের ডাল থেকে কোনও হরিণ ঝুলতে দেখল না। এমন তো হয় না। শিকারে বেরিয়ে খালি হাতে ফেরে বাবা কমই।

ব্যাপার কী জিজ্ঞেস করবার জন্য সারাদিন আর বাবাকে পাওয়া গেল না। ব্যস্ত বাবা। গোলাঘর আর বাড়ির সব ফাঁক-ফোকর বন্ধ করছে শীত ঠেকাবার জন্য।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর লরাকে কোলে বসিয়ে বাবা বলল, 'এবার শোনো, তাজা মাংস পেলে না কেন তোমরা আজ।'

মেরি বসেছে ওর ছোট্ট চেয়ারে, মা তার দোলনা-চেয়ারে। গল্প শুনবার জন্য কান খাড়া।

'ডিয়ার-লিকের কাছেই একটা বড়সড় ওক গাছে উঠে বসে আছি,' শুরু করল বাবা। 'অপেক্ষা করছি কখন চাঁদ ওঠে। সারাদিন কাঠ কেটে বেশ ক্লান্ত ছিলাম, কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। যখন ঘুম ভাঙল, দেখলাম মস্ত, গোল চাঁদ উঠে পড়েছে, ফাঁকা জায়গাটা ভেসে যাচ্ছে আলোর বন্যায়।

'সেই আলোয় দেখলাম লবণ চাটতে এসেছে বড়সড় একটা হরিণ। বিরাট শিং তার মাথায়। এখন গুলি করলেই ফেলে দেওয়া যায়, কিন্তু পারলাম না। মুক্ত, স্বাধীন, শক্তিশালী একটা বুনো জানোয়ার—মারতে ইচ্ছে হলো না। মনের সুখে লবণ চেটে সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল ওটা গভীর জঙ্গলে।

'তখন আমার মনে পড়ল, আমার বাচ্চারা আর তাদের মা অপেক্ষা করছে বাড়িতে, আমি তাজা মাংস নিয়ে ফিরব বলে। ঠিক করলাম, আবার একটা এলে ঠিকই গুলি করব।

'এবার এল মস্ত এক ভালুক। গোটা গ্রীষ্মে এত খেয়েছে যে একাই দুটো ভালুকের সমান হয়ে গেছে ব্যাটা। এপাশ-ওপাশ মাথা দুলিয়ে চারপায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল ওটা একটা পচা কাঠের গুঁড়ির কাছে। ওটাকে খানিকক্ষণ শুঁকে নখ দিয়ে চিরে সাদা অংশটা চিবাল কিছুক্ষণ।

'তারপর পিছনের দুপায়ে উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল ওটা। মনে হলো যেন কিছু একটা সন্দেহ এসেছে ওর মনে, যেন বুঝতে পেরেছে, কোথাও গোলমাল আছে কিছু।

'এত সুন্দর টার্গেট আর হয় না। কিন্তু গুলি করার কথা তখন মনেই নেই আমার। চাঁদের আলোয় জঙ্গলটা এত সুন্দর লাগছে যে ভুলেই গিয়েছি আমি বন্দুকের কথা। ভালুকটা গভীর জঙ্গলে অদৃশ্য হওয়ার আগে শিকারের কথা আমার মনে এল না।

'এভাবে তো চলবে না!–নিজেকেই বললাম নিজে। এইভাবে তো একটুকরো মাংসও নিতে পারব না বাড়িতে। নড়েচড়ে বসে অপেক্ষায় থাকলাম, এবার যা-ই আসুক, গুলি করব।

'আরও ওপরে উঠে পড়েছে চাঁদ। ফাঁকা জায়গাটার সবকিছু দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার, যদিও জঙ্গলের ভিতর তেমনি গাঢ় অন্ধকার।

'অনেক-অনেকক্ষণ পর অন্ধকার থেকে আলোয় এসে দাঁড়াল একটা মেয়ে হরিণ, সঙ্গে তার এক বছরের বাচ্চা। একটুও ভয় পাচ্ছে না, সোজা গিয়ে দাঁড়াল যেখানে লবণ ছিটিয়েছিলাম, জিভ দিয়ে চেটে তুলল কিছুটা।

'তারপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে দুজন দেখল দুজনকে। বাচ্চা সরে গিয়ে মায়ের পাশে দাঁড়াল। জঙ্গল দেখছে ওরা, আলো দেখছে চাঁদের–আয়ত চোখে কোমল দৃষ্টি, আলো লেগে চকচক করছে চোখ দুটো মাঝে মাঝে।

'হাঁ করে বসেই থাকলাম, ধীর পায়ে হেঁটে ওরা চলে গেল জঙ্গলের ভেতর। আমিও গাছ থেকে নেমে ফিরে এলাম ঘরে।'

'গুলি করোনি বলে আমার খুব ভাল লাগছে, বাবা!' ফিস্‌ফিস্ করে বলল লরা। 'খুব ভাল লাগছে!'

মেরি বলল, 'হ্যাঁ। রুটি-মাখনই তো যথেষ্ট।'

মেরিকেও কোলে তুলে নিল বাবা। দুহাতে দুই মেয়েকে জড়িয়ে ধরল বুকের সঙ্গে।

'তোমরা লক্ষ্মী মেয়ে আমার,' নামিয়ে দিল কোল থেকে। 'যাও, এবার শুয়ে পড়ো গিয়ে।'

বেহালাটা বের করে সুর বেঁধে নিল বাবা। তারপর মিষ্টি, করুণ একটা গান ধরল। লরার মনে হলো সুরের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে ও মেঘের রাজ্যে। কখন যে ঘুম এসে গেছে জানে না।

***

লিট্‌ল্ হাউস অন দ্য প্রেয়ারি

প্রকাশ কাল: ১৯৯৯

এক

গোটা শীতকাল ধরে মাকে বোঝাল বাবা, 'নাহ্, বিগ উড্‌সে আর থাকা যাবে না। চারদিক থেকে মানুষ এসে ভিড় করছে এখানে। কান পাতলেই শোনা যায়, কেউ না কেউ গাছ কাটছে ফসলের জমি বের করবে বলে। চলো, আমরা পশ্চিমে গিয়ে বাসা বাঁধি।'

এই নির্জন জঙ্গলটা বাবার পছন্দ ছিল, কিন্তু অনেক লোক এসে পড়ায় বন্যপ্রাণীরা ভয় পেয়ে সরে যাচ্ছে দূরে, শিকার পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত মনে করছে বাবা।

কাজেই একদিন তৈরি হলো বাবা, মা, মেরি, লরা আর ছোট্ট ক্যারি, ওয়্যাগনে চেপে রওনা হয়ে যাবে বুনো পশ্চিমের পথে, ইন্ডিয়ানদের দেশে। এত শীতে সুন্দর, ছোট্ট, ছিমছাম, গরম বাড়িটা ছেড়ে খোলা আকাশের নীচে পথ চলা···মা একটু আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু বাবা বোঝাল, 'যদি যেতে হয় এখনই রওনা হওয়ার সময়। বসন্ত এসে গেলে মিসিসিপির বরফ গলে যাবে, তখন আর নদী পার হওয়া যাবে না। তা ছাড়া এখন এই বাড়ির যা দাম পাব, পরে আর তা পাব না।'

বাড়িটা বেচে দিয়েছে বাবা, সেই সঙ্গে গরু আর বাছুরটাও। ওয়্যাগনটায় হিকরি কাঠ দিয়ে সুন্দর ফ্রেম বানিয়ে তার উপর সাদা ক্যানভাস মুড়ে ছাদ তৈরি করেছে। তারপর একদিন খুব ভোরে বিদায় জানাতে আসা আত্মীয়স্বজন সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে রওনা হয়ে গেল দীর্ঘ যাত্রায়।

খাট-তোশক আর টেবিল চেয়ারগুলো ছাড়া সবই তুলে নিয়েছে ওরা ওয়্যাগনে। বন্দুকটা বাবা এমন জায়গায় ঝুলিয়েছে যেন হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। দুটো বালিশের মাঝখানে রেখেছে তার বেহালার বাক্স, যেন ঝাঁকিতে কোনও ক্ষতি না হয়।

আঙ্কেলরা ঘোড়া জুতে দিল ওয়্যাগনে। লরা আর মেরিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে বাবা সাহায্য করল মাকে উঠতে। দাদী এগিয়ে এসে ক্যারিকে তুলে দিল মার কোলে, তারপর সবাই গাড়ির দু'পাশে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে বলল, 'গুড বাই! গুড বাই!'

ছোট্ট বাড়িটার পাশ দিয়ে চলে গেল ওরা, জানালায় শাটার লাগানো বলে বাড়িটা দেখতে পেল না ওদের যাওয়া। বাড়িটাকে ওই ওদের শেষ দেখা। পেপিন শহরে পৌঁছে আজ অন্যরকম লাগল লরার। তুষার জমে আছে সবখানে, সবকটা বাড়ির দরজা বন্ধ। স্টোরের দরজাও, কিন্তু বাবা এগিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। বুনো জানোয়ারের ছাল বিক্রি করে দীর্ঘ যাত্রায় যা-যা প্রয়োজন হবে সব কিনে নিল বাবা। ওয়্যাগনে বসেই রুটি আর চিটাগুড় দিয়ে নাস্তা সেরে নিল

ওয়া। তারপর বিশাল পেপিন লেকের মধ্য দিয়ে গাড়ি হাঁকাল। পুরু বরফ জমে আছে লেকের উপর শক্ত হয়ে। আরও অনেক চাকার দাগ রয়েছে বরফে, সেই পথেই চলল ওয়্যাগন। পিছু পিছু আসছে ওদের বুলডগ জ্যাক।

আদিগন্ত বিস্তৃত লেক পেরোতে অনেক সময় লাগল। তারপর আবার ডাঙায় উঠে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলল ওয়্যাগন। বেশ কিছুদূর গিয়ে ছোট্ট একটা বাড়ি দেখে আগুন জ্বেলে নিয়ে ওতেই রাত কাটাবে বলে থামল ওরা। এই বাড়িতে কেউ থাকে না, প্রয়োজনে আশ্রয় নেয় মুসাফির।

রাতে কামান দাগার মত গুরু-গম্ভীর আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল লরার। বিছানায় উঠে বসতে যাচ্ছিল, মা বলল, 'ও কিছু না, লরা, বরফ ফাটছে।'

রাতে বাবা ওয়্যাগন পাহারা দেওয়ার জন্য বাইরেই ঘুমিয়েছে, সকালে নাস্তা খেতে এসে মাকে বলল, 'বড় বাঁচা বেঁচে গেছি, ক্যারোলিন। রাতে শুনেছ, বরফ ফাটার আওয়াজ? আমরা লেকের মাঝখানে থাকতেই যদি ভাঙতে শুরু করত!'

কথাটা শুনেই চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল লরার। তাই তো! যদি আমরা সবাই ওই পেপিন লেকের হিম-শীতল পানিতে ডুবে যেতাম!

'তুমি কিন্তু একজনের আত্মা চমকে দিচ্ছ, চার্লস্!' মৃদু হেসে বলল মা।

পাশ ফিরে লরার অবস্থা দেখেই ওকে বুকে তুলে নিল বাবা। 'ভাবো একবার, মিসিসিপি পার হয়ে এসেছি আমরা! কেমন লাগছে তোমার, আধ বোতল মিষ্টি সাইডার?'

'ভাল লাগছে, বাবা। ইন্ডিয়ানদের এলাকায় এসে পড়েছি আমরা?'

'না, এটা মিনেসোটা। আরও অনেক পথ বাকি।'

দীর্ঘ যাত্রা, পথ আর ফুরোয় না। সারাদিন ছোটে ঘোড়াগুলো, যতদূর সাধ্য এগিয়ে গিয়ে থামে, বাবা-মা ওয়্যাগন থেকে নেমে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে। সকালে উঠে নাস্তা সেরেই আবার পথ চলা। কখনও বৃষ্টির কারণে নালা বা খাল পানিতে ভরে গেলে একই জায়গায় অপেক্ষা করতে হয় ওদের পরপর কয়েকদিন। অবশ্য বেশিরভাগ খাঁড়ির উপর দিয়েই কাঠের ব্রিজ আছে।

মিসৌরি নদীর তীরে আর কোন ব্রিজ পাওয়া গেল না। ভেলায় চেপে পার হলো ওয়্যাগন। জমি কখনও সমতল, কখনও উঁচু-নিচু পাহাড়ী। কখনও কাদায় আটকে যায় গাড়ির চাকা, কখনও প্রবল বৃষ্টিতে খাল পেরোনো যায় না, এক জায়গায় ঠায় বসে থাকতে হয় আট-দশদিন। তবু এগিয়ে চলেছে ওরা। পথেই বাদামী রঙের ঘোড়াদুটো বদলে একজন লোকের কাছ থেকে দুটো ওয়েস্টার্ন মাসট্যাং নিল বাবা–মেরি আর লরা নাম রেখে দিল ওদের 'পেট' আর 'প্যাটি'।

উইস্কন্‌সিনের বিগ উড্‌স্ থেকে মিনেসোটা, তারপর আইওয়া হয়ে মিসৌরিতে এসেছে ওরা; এখন চলেছে কানসাসের দিকে–এই দীর্ঘপথ দিনে গাড়ির পিছু পিছু দৌড়ে এসেছে জ্যাক, রাতে পাহারা দিয়েছে, চোর-ডাকাত-বন্য জন্তু যেন মনিরের কোনও ক্ষতি না করতে পারে।

বিশাল কানসাসের সমতল জমিতে প্রবল হাওয়ায় দোলে শুধু লম্বা ঘাস, চতুর্দিকে দিগন্ত পর্যন্ত কোথাও আর কিচ্ছু নেই । যেন বিরাট এক বৃত্তের ঠিক মাঝখানটায় রয়েছে ওরা। পেট আর প্যাটি সারাদিন ছুটেও বেরোতে পারে না

বৃত্তের মাঝখান থেকে। পশ্চিমের আকাশ লাল হয়ে যায় সূর্য ডুবলে, ছোট্ট ক্যাম্পফায়ার বিশাল বিস্তৃতির তুলনায় মনে হয় অকিঞ্চিতকর। ক্রমে কালো হয়ে আসে সবকিছু, ঘাসের কানে কানে উদাস শিস দিয়ে যায় দমকা হাওয়া, আকাশ ভরে যায় জ্বলজ্বলে তারায়–মনে হয় এত কাছে যে হাত বাড়ালে ছোঁয়া যাবে।

দুই

অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে চওড়া একটা খালের ধারে এসে থামল ওয়্যাগন। বোঝা যাচ্ছে না কতটা গভীর। ঘোড়া দুটো পানি খেয়ে নিল, নাকে নাক ঠেকিয়ে লেজ নাড়ল।

ওয়্যাগনের ক্যানভাস টেনে নামিয়ে ভাল করে বেঁধে নিল বাবা। বিড়বিড় করে বলল, 'বেশি গভীর না হলেই বাঁচা যায়!'

ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মেরির মুখ, গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল। নিজের সিটে বসে বাবা বলল, 'মাঝে কিছুটা জায়গা হয়তো ওদেরকে সাঁতার কাটতে হতে পারে। তুমি কিচ্ছু ভেবো না, ক্যারোলিন, আমরা ঠিকই পার হয়ে যাব।'

'জ্যাককে তুলে নিলে হত না?' জিজ্ঞেস করল লরা।

বাবা কোন জবাব দিল না, ঘোড়ার রাশ নিয়ে ব্যস্ত। মা বলল, 'ওর জন্যে চিন্তা নেই, লরা। সাঁতার কেটেই পার হতে পারবে জ্যাক।'

কাদার উপর দিয়ে গড়িয়ে পানিতে নামল ওয়্যাগন। স্রোতের তোড় টের পাওয়া যাচ্ছে চাকায়। পানির কলকল শব্দ বাড়ছে ক্রমে। চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে মেরি। স্রোতের ধাক্কায় দুলছে ওয়্যাগন। হঠাৎ মাটি ছেড়ে ভেসে উঠল ওয়্যাগনটা, হেলে-দুলে ভারসাম্য রক্ষা করছে।

চেঁচিয়ে উঠল মা, 'শুয়ে পড়ো! কেউ নড়বে না!' ঝট্ করে মেরির পাশে শুয়ে পড়ল লরা।

বিপজ্জনক ভাবে দুলছে ওয়্যাগন, মনে হচ্ছে বাঁকা হয়ে ঘুরে যাচ্ছে একদিকে।

'লাগামগুলো ধরো, ক্যারোলিন,' বাবার গলার আওয়াজ। দোল খেল ওয়্যাগন, পরমুহূর্তে ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল কী যেন।

লাফিয়ে উঠে বসল লরা, ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেছে। বাবা নেই। দুই হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে বসে আছে মা। সামনে তীর দেখা যাচ্ছে না। পানিতে পেট আর প্যাটির পাশে বাবার ভেজা মাথা। এক হাতে পেট-এর সাজ ধরে টানছে সামনের দিকে।

বাবার গলার আওয়াজ আবছা ভাবে শুনতে পেল লরা, কিন্তু কী বলছে বোঝা গেল না। শান্ত, খুশি-খুশি গলায় কী যেন বোঝাচ্ছে ঘোড়াকে। মা'র মুখটা ভয়ে ফ্যাকাসে।

'শুয়ে পড়ো, লরা,' বলল মা।

শুয়ে চোখ বন্ধ করল লরা, কিন্তু তারপরও মনে হলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে তীব্র স্রোত, বাবার তামাটে রঙের দাড়ি ডুবছে ওতে, আবার উঠছে।

অনেকক্ষণ পর চাকার তলায় মাটি ঠেকল। হেসে উঠল বাবা। উঠে বসল লরা আবার। ঝাঁকি খেতে খেতে নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে ওয়্যাগনটা উঠছে এখন ঢাল বেয়ে। বাবা দৌড়াচ্ছে পাশে পাশে, চেঁচাচ্ছে, 'এই তো, প্যাটি! আরও জোরে, পেট! একটানে উঠে যাও দেখি, লক্ষ্মী মেয়েরা!'

ঢাল বেয়ে উপরে ওঠবার পর থামল ওরা তিনজন। হাঁপাচ্ছে পাল্লা দিয়ে। খাঁড়ি থেকে উঠে পড়েছে ওয়্যাগন। আর কোনও ভয় নেই। ভিজে একেবারে চুপচুপে হয়ে গেছে বাবা। মা বলল, 'কী সাঙ্ঘাতিক, চার্লস্!'

'আর ভয় নেই, ক্যারোলিন, পেরিয়ে এসেছি নিরাপদেই। যাক, সব ভাল যার শেষ ভাল।'

'ভিজে একসা হয়ে গেছ,' বলল মা।

বাবা জবাব দেওয়ার আগেই চেঁচিয়ে উঠল লরা, 'আরে, জ্যাক কোথায়? জ্যাক কোথায় গেল?'

ভুলেই গিয়েছিল ওরা জ্যাকের কথা। খালের ওপারে রেখে এসেছে ওরা ওকে। এই তীব্র স্রোতের মধ্যে ও নিশ্চয়ই ওয়্যাগনের পিছন পিছন আসবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোথায়? কোথাও কোনও চিহ্ন নেই ওর।

ঢোক গিলে কান্না সামলানোর চেষ্টা করল লরা, কিন্তু ডুকরে কেঁদে উঠতে চাইছে ওর ভিতরটা। সেই উইস্কন্সিন্ থেকে বেচারা জ্যাক ওদের অনুসরণ করে এসেছে এতদূর, অথচ ওকে ডুবে মরবার জন্য ফেলে রেখে ওরা চলে এসেছে এপারে! বেচারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এত পথ দৌড়ে। পারে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখেছে, ওকে ফেলে চলে যাচ্ছে ওয়্যাগন–কেউ ওর জন্য কিচ্ছু ভাবল না!

বাবাও অনেক দুঃখ করল। এত গভীর খাল, আর এত স্রোত আগে জানলে জ্যাককে গাড়িতেই তুলে নিত। কিন্তু কী আর করা, এখন তো আর করবার নেই কিছুই। তবু খাঁড়ির তীর ধরে বহুদূর পর্যন্ত খুঁজল বাবা ওকে, ডাকল নাম ধরে, শিস দিল।

নাহ্, কোনও লাভ হলো না। হারিয়ে গেছে জ্যাক।

এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই আর। পেট আর প্যাটির বিশ্রাম নেওয়া হয়ে গেলে আবার লাগাম হাতে নিয়ে রওনা হয়ে গেল বাবা। ওয়্যাগনের পিছনে জ্যাকের পথ চেয়ে বসে রইল লরা, যদিও জানে, আর কোনদিনই দেখা হবে না জ্যাকের সঙ্গে। বেশ কিছুদূর পাহাড়ী এলাকা পেরিয়ে আবার প্রেয়ারিতে এসে পড়ল ওয়্যাগন। সূর্য ডুবে গেলে থেমে দাঁড়াল গাড়ি।

সবাই নেমে পড়ল মাটিতে।

'মা,' জিজ্ঞেস করল লরা, 'নিশ্চয়ই স্বর্গে গেছে ও, তাই না, মা? এত ভাল ছিল জ্যাক, ও স্বর্গেই তো যাবে, তাই না?'

মা কী বলবে ভেবে পেল না। বাবা বলল, 'হ্যাঁ, লরা। ওর একটা সুব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন খোদা।'

মনটা ভার হয়ে রয়েছে লরার। খেয়াল করল, বাবাও আজ আর মনের আনন্দে শিস দিচ্ছে না। অনেকক্ষণ পর আপন মনেই বলল বাবা, 'ওর মত এত ভাল একটা পাহারাদার ছাড়া এই বুনো এলাকায় কী করে যে চলব জানি না।'

তিন

ঘাস খাওয়ার জন্য ঘোড়া দুটোকে একটু দূরে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিল বাবা। কিন্তু প্রথমে ওরা মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি দিল, যতক্ষণ না শরীর থেকে বোঝা টানবার অনুভূতি দূর হলো ততক্ষণ এপাশ-ওপাশ ফিরে আরাম করে নিল, তারপর উঠল ঘাস খেতে।

ওয়্যাগনের পাশের খানিকটা জায়গা থেকে সব ঘাস টেনে ছিঁড়ে ফেলে গোল একটা ফাঁকা জমি বের করল বাবা। কাঁচা ঘাসের নীচে প্রচুর শুকনো মরা ঘাস রয়েছে, ওগুলোতে আগুন ধরে গেলে গোটা প্রেয়ারি অঞ্চল জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবে।

এবার ফাঁকা জায়গায় আগুন জ্বালল বাবা, বালতিতে করে পানি নিয়ে এল পাশের ঝর্না থেকে। মেরি আর লরাকে নিয়ে রান্নার আয়োজন শুরু করল মা। ঘণ্টাখানেক পর যখন ভাজা মাংস, কেক আর ফুটন্ত কফির গন্ধ ছুটল, তখন জিভে পানি এসে গেল লরার।

আগুনের ধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে সাপার সারল ওরা, পেট আর প্যাটিও তখন কচর-মচর করে ঘাস চিবাচ্ছে। আঁধার ঘনিয়ে এসেছে চার পাশে, তারায় তারায় ঝলমল করছে আকাশ, ঘাসগুলোকে নুইয়ে দিয়ে শিস কেটে বয়ে যাচ্ছে মাতাল হাওয়া।

'ভাবছি দু-একদিন থেকে যাই এখানে,' বলল বাবা। 'দু-একদিন কেন, থেকেই যাই না এখানে! চমৎকার জমি, খাঁড়ির ধারে গাছ আছে—কাঠের অভাব হবে না কখনও, মনে হচ্ছে শিকারও পাওয়া যাবে প্রচুর। আর কী চাই? তুমি কী বলো, ক্যারোলিন?'

'আরও এগোলে এর চেয়ে ভাল জায়গা নাও পেতে পারি,' উত্তর দিল মা।

'ঠিক আছে, কাল একটু ঘুরেফিরে দেখে নিই আগে,' বলল বাবা। 'বন্দুক নিয়ে যাব, হয়তো কিছু টাটকা মাংসের ব্যবস্থাও হয়ে যাবে।'

পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে পা মেলে দিয়ে আরাম করে বসল বাবা। বাসন-কোসন ছুরি-কাঁটা ধুয়ে ফেলল মা। মস্ত এক হাই তুলল মেরি, তার দেখাদেখি লরাও। হঠাৎ থমকে গেল সবাই। দূর থেকে ভেসে এসেছে কান্নার মত একটা আওয়াজ; একটানা, লম্বা। নেকড়ে বাঘ! মেরুদণ্ডের ভিতর কেমন যেন শিরশির করে ওঠে লরার এই ডাক কানে এলে।

'নেকড়ে,' বলল বাবা। 'আধমাইল দূরে। যেখানে হরিণ, সেখানেই থাকবে

নেকড়ে। ইশ্‌শ্‌, যদি…'

যদি বলেই থেমে গেল বাবা, কিন্তু লরা পরিষ্কার বুঝতে পারল, বাবা বলতে যাচ্ছিল, যদি জ্যাকটা থাকত এখন! গলার কাছে কী যেন আটকে আছে মনে হলো লরার। জ্যাকের ভরসায় বিগ উড্‌সের নেকড়েদের পরোয়া করত না লরা, জানত, জ্যাক ওর কোনও ক্ষতি হতে দেবে না। টুঁ-শব্দটি না করে চোখ টিপে দু-ফোঁটা পানি ঝরিয়ে দিল লরা। আবার ভেসে এল নেকড়ের ডাক। এবার আর একটু কাছে।

'এবার বাচ্চা মেয়েদের শুয়ে পড়ার সময় হয়েছে,' খুশি-খুশি গলায় বলল মা।

মেরি উঠে ঘুরে দাঁড়াল, মা ওর জামার বোতাম খুলছে, কিন্তু লরা উঠে দাঁড়িয়েই স্থির হয়ে গেল। আগুনের আলোয় কিছু দেখতে পেয়েছে। মনে হলো সবুজ দুটো চোখ জ্বলে উঠল।

ঘাড়ের কাছে চুল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে লরার। আবার দেখতে পেল জ্বলজ্বলে দুটো চোখ, এগিয়ে আসছে এদিকে।

'দেখো, দেখো, বাবা!' চেঁচিয়ে উঠল লরা, 'নেকড়ে!'

মুহূর্তে ওয়্যাগন থেকে বন্দুকটা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বাবা। তৈরি। থেমে গেছে চোখজোড়া। নিষ্পলক চেয়ে আছে বাবার দিকে।

'নাহ্, নেকড়ে না,' বলল বাবা। 'দেখো, নিশ্চিন্তে ঘাস খাচ্ছে ঘোড়াগুলো।'

'তবে কী, লিঙ্কস্?' জিজ্ঞেস করল মা।

'কিংবা কয়োট,' বলল বাবা। একটা লাকড়ি তুলে নিল বাবা এক হাতে। জোরে চেঁচিয়ে উঠে ছুঁড়ে মারল সেটা। চোখ দুটো মাটির কাছাকাছি চলে গেল, মনে হচ্ছে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত কোনও বুনো জানোয়ার। বাবার বন্দুক তৈরি, অপেক্ষা করছে। কিন্তু নড়ল না জন্তুটা।

'যেয়ো না, চার্লস্,' বলল মা।

ধীর পায়ে ওটার দিকে এগোচ্ছে বাবা, উজ্জ্বল চোখ দুটোও এগোচ্ছে বাবার দিকে। হঠাৎ ওটাকে চিনতে পেরে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল লরা আর বাবা।

পরমুহূর্তে লরার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জ্যাক। লাফাচ্ছে, হাঁপাচ্ছে, কিলবিল করছে লরার জড়িয়ে ধরা দুই হাতের মধ্যে, চেটে দিচ্ছে ওর গাল, হাত। লরার হাত থেকে ছুটে একলাফে বাবার কাছে চলে গেল জ্যাক, ওখান থেকে মা'র কাছে, তারপর আবার লরার কোলে।

'খুব দেখালি, ব্যাটা!' হাসতে হাসতে বলল বাবা।

'সত্যি!' বলল মা।

ঠিকই আছে জ্যাক, কিন্তু ভয়ানক ক্লান্ত। লরার পাশে শুয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ক্লান্তিতে লাল হয়ে আছে দু'চোখ। কর্নমীলের কেক খেতে দিল ওকে মা। কিন্তু খেতে পারল না বেচারা; একবার চেটে, লেজ নেড়ে ভদ্রতা প্রকাশ করল। ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ও।

'বেচারী কতক্ষণ সাঁতার কেটেছে কে জানে!' বলল বাবা। 'হয়তো স্রোতের টানে কয়েক মাইল ভাটিতে গিয়ে তারপর উঠতে পেরেছে তীরে।'

তারপর যখন এসে পৌছল, তখন ওকে নেকড়ে বলে গাল দিয়েছে লরা, বন্দুক উঁচিয়ে ভয় দেখিয়েছে বাবা। আহা-রে! 'তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ ভুল করেছি আমরা, তাই না, জ্যাক?' মাথা তুলতে পারল না জ্যাক, শুধু ছোট্ট লেজটা একটু নেড়ে জানিয়ে দিল যে সে বুঝেছে।

পেট আর প্যাটিকে গাড়ির ফীডবক্সের সঙ্গে চেইন দিয়ে বেঁধে দানা খাওয়াল বাবা। ওয়্যাগনের নীচে ক্লান্ত ভঙ্গিতে তিনবার পাক খেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল জ্যাক।

খাঁড়ির ধারে গাছে বসে কালপেঁচা ডাকছে, 'হু-উ-উ!'

বহুদূরে আকাশের দিকে নাক তুলে লম্বা ডাক ছাড়ছে প্রেয়ারির নেকড়ে বাঘ।

ওয়্যাগনের নীচে অভ্যাসবশে মৃদু গর্জন ছেড়ে শাসাচ্ছে ওদেরকে জ্যাক।

শুয়ে শুয়ে তারা দেখছে লরা। হঠাৎ মনে হলো, বড় তারাটা ওর দিকে চেয়ে চোখ টিপল।

পরমুহূর্তে চোখ মেলে দেখল সকাল হয়ে গেছে।

চার

পরদিন নাস্তার পর কুঠারটা কোমরে গুঁজে তার পাশে বারুদ ভরা শিংটা ঝুলাল বাবা, প্যাচ-বক্স আর বুলেট পাউচ রাখল পকেটে, তারপর বন্দুকটা তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

কিছুদূর মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত দেখা গেল, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল বাবা বিশাল প্রেয়ারিতে।

থালা-বাসন ধুয়ে-মুছে বাক্সে ভরে রাখল লরা আর মেরি, ওয়্যাগনে উঠে মা বিছানাগুলো ঠিক-ঠাক করল, তারপর কাপড় ধোয়ার কাজে মন দিল। লরা আর মেরি মাঠময় খেলে বেড়াল। কখনও ছোটে খরগোশের পেছনে, কখনও বাদামী ডোরা কাটা ইঁদুরের মত দেখতে গফারের পেছনে, কখনও আবার খুঁজে বের করে পাখির বাসা। দুপুরের রোদ চড়ে যেতে অনেক ফুল নিয়ে ফিরল ওয়্যাগনে। মা ওগুলো পানি ভর্তি একটা টিনের কাপে সাজিয়ে রাখল।

দুটো কর্ন-কেকে চিটাগুড় মাখিয়ে দুজনকে দিল মা। ওটাই দুপুরের ডিনার।

খেতে খেতে লরা জিজ্ঞেস করল, 'ইন্ডিয়ানদের তুমি পছন্দ করো না কেন, মা?'

'করি না, তাই করি না, কোনও কারণ নেই,' বলল মা।

'এটা তো ইন্ডিয়ানদের এলাকা, তাই না?' আবার বলল লরা। 'পছন্দই যখন করো না, তখন ওদের এলাকায় এলে কেন?'

'কে বলেছে এটা ওদের এলাকা?' বলল মা। 'যদি হয়ও, বেশিদিন থাকতে পারবে না ওরা। ওয়াশিংটনের এক লোকের সঙ্গে কথা হয়েছে তোমার

বাবার–এই অঞ্চলে খুব শীঘ্রিই সাদা মানুষকে বসতি গড়ার অনুমতি দেবে সরকার। এতদিনে হয়তো দিয়েও দিয়েছে, জানা যাচ্ছে না ওয়াশিংটন অনেক দূর বলে।'

কথা শেষ করে কাপড় ইস্তিরি করতে শুরু করল মা। ওয়্যাগনের ছায়ায় জ্যাকের কাছে শুয়ে পড়ল লরা আর মেরি। গরমে লাল জিভ বের করে হাঁফাচ্ছে জ্যাক, ঘুমে বুজে আসছে ওর চোখ। গুন-গুন করে গান গাইছে মা। চারদিকে যতদূর চোখ যায়, লম্বা ঘাস দুলছে হাওয়ায়। অনেক উপরে হালকা নীল বাতাসে ভাসছে ছোট ছোট কয়েক টুকরো সাদা মেঘ। ঘাসের মৃদু খশ্‌খশ আর খাঁড়ির ধার থেকে ভেসে আসা ঝিঁঝির ডাক–এ ছাড়া কোথাও আর কোনও শব্দ নেই। খুব ভাল লাগল লরার এ-জায়গাটা।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না লরা। চোখ খুলে দেখল উঠে দাঁড়িয়েছে জ্যাক, ছোট্ট লেজটা নাড়ছে প্রবল বেগে। উঠে বসতেই বাবাকে দেখতে পেল লরা, ফিরে আসছে। মস্ত এক খরগোশ আর দুটো মোটা-তাজা মুরগি মেরে এনেছে বাবা, হাত উঁচুতে তুলে দেখাল একে। এক দৌড়ে বাবার কাছে চলে গেল লরা।

'দেশটা শিকারে ঠাসা,' বলল বাবা। 'অন্তত পঞ্চাশটা হরিণ দেখেছি। এ ছাড়া অ্যান্টিলোপ, কাঠবিড়ালি, খরগোশ, প্রেয়ারি-মোরগ আর নানান জাতের পাখির কোনও গোনা-গুনতি নেই। আর খাঁড়ির পানিতে আছে অজস্র মাছ।' ওয়্যাগনের কাছে এসে মাকে বলল, 'যা চাই সব আছে, ক্যারোলিন। রাজার হালে থাকা যাবে এখানে।'

রাতে টাটকা মাংস খেল ওরা তৃপ্তির সঙ্গে পেট পুরে। বেহালাটা বের করে ধীর লয়ের মিষ্টি কয়েকটা গান গাইল বাবা। লরার মনে হলো অনেক নীচে নেমে এসেছে তারাগুলো, চুপচাপ কান পেতে শুনছে বাবার গান, আর মিটমিট করছে চোখ।

পাঁচ

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে আবার রওনা হলো ওরা। ঠিক দুপুর বেলায় ঘোড়াগুলোকে বলল বাবা, 'ওয়াও!' থেমে দাঁড়াল ওয়্যাগন।

'ব্যস, ক্যারোলিন!' বলল বাবা, 'এইখানেই বাড়ি তৈরি করব আমরা। তুমি কী বলো?'

'ভালই তো,' বলল মা।

ফীডবক্সের উপর দিয়ে লাফিয়ে নীচে নেমে পড়ল লরা আর মেরি। চারদিকে যতদূর দেখা যায় ঘাস আর ঘাস–একেবারে আকাশ যেখানে মাটিতে মিশেছে সেই দিগন্ত পর্যন্ত।

উত্তরদিকে, কাছেই, খালের তীর–দুপাশে ঘন হয়ে জন্মেছে বড় বড় গাছ; কিন্তু খাঁড়ির নীচে বলে উপরের পাতাগুলো শুধু দেখা যাচ্ছে। পুবদিকে অনেক দূরেও গাঢ় সবুজ গাছের আভাস।

'ওই দেখো,' আঙুল তুলে মাকে দেখাল বাবা। 'ওটা হচ্ছে ভার্জিগ্রিস নদী।'

দুজন মিলে জিনিসপত্র নামাতে শুরু করল মাটিতে। ওয়্যাগনের ছাতের ক্যানভাস খুলে ঢাকা হলো মালপত্র। তারপর ওয়্যাগন-বক্সটাও খুলে ফেলা হলো গাড়ি থেকে।

এতগুলো দিন ওয়্যাগনটাই বাড়ি ছিল ওদের। এখন চারটে চাকা ছাড়া আর কিছুই থাকল না ওটার। পেট আর প্যাটি এখনও জোতা রয়েছে সামনে। একটা বড় বালতি আর কুঠার নিয়ে ওয়্যাগনের কঙ্কালে চড়ে চলে গেল বাবা।

'কোথায় গেল বাবা?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল লরা।

'খাঁড়ির নীচ থেকে কাঠ কেটে আনতে গেল,' জবাব দিল মা।

প্রেয়ারির মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, আশেপাশে ওয়্যাগনের চিহ্নমাত্র নেই–অদ্ভুত একটা ভয়-ভয় ভাব চেপে ধরল লরাকে। বিশাল মনে হচ্ছে জমি আর আকাশ, খুব ছোট লাগছে নিজেকে। যেন কোথাও লুকাতে পারলে বাঁচে।

বাচ্চা ক্যারিকে নিয়ে ঘাসের উপর বসল মেরি। মার সঙ্গে ক্যানভাসের নীচে বিছানা পাতল লরা। বাক্স আর পোঁটলা সাজিয়ে ঘর মত বানাল জায়গাটাকে। তাঁবুর সামনে থেকে বেশ কিছুটা জায়গার ঘাস টেনে তুলে ফেলল, বাবা কাঠ নিয়ে ফিরলে ওখানে আগুন জ্বালা যাবে।

কাজ শেষ করে আশপাশে একটু ঘুরে দেখতে গিয়ে একটা সরু পথ আবিষ্কার করে ফেলল লরা। দূর থেকে দেখলে বোঝার উপায় নেই যে সুড়ঙ্গের মত একটা রাস্তা আছে ওখানে। সরু, কিন্তু সোজা একটা পথ, অনেক চলাচলের ফলে শক্ত হয়ে গেছে মাটি। ঘাসের মাঝখান দিয়ে কোথায় গেছে কে জানে।

কিছুদূর এগোল লরা ওই পথ ধরে, কিন্তু ক্রমেই কমে এল গতি, তারপর থেমে দাঁড়াল। অদ্ভুত এক রকম অনুভূতি হচ্ছে। কীসের পথ এটা? কাদের? চট্ করে ঘুরে দ্রুতপায়ে ফিরে চলল লরা। কোথাও কিছু নেই, তবু প্রায় দৌড়ে চলে এল ক্যাম্পে।

বাবা কাঠ নিয়ে ফিরে আসতেই পথটার কথা বলল লরা। বাবা বলল গতকালই শিকার করতে গিয়ে দেখেছে, কিন্তু ভাবতেও পারেনি পথটা এত লম্বা, এতদূর পর্যন্ত এসেছে। খুব সম্ভব ইন্ডিয়ানদের প্রাচীন কোন ট্রেইল হবে ওটা।

'একজনকেও তো দেখলাম না,' বলল লরা।

'ওরা নিজেরা দেখা না দিলে ওদেরকে দেখা যায় না। ছোট থাকতে নিউ ইয়র্ক স্টেটে একবার দেখেছিলাম আমি ইন্ডিয়ানদের।'

পর পর কয়েক দিন ক্রীকের ধার থেকে গাছ কেটে আনল বাবা। একধারে রাখল বাড়ি তৈরির জন্য আনা কাঠ, অন্যধারে আস্তাবলের জন্য। যথেষ্ট পরিমাণে কাঠ আনা হয়ে গেলে শুরু হলো বাড়ি তৈরির কাজ।

প্রথমে মাপ দিয়ে চারকোনা একটা জায়গা বাছাই করল বাবা। তারপর কোদাল দিয়ে ছোট্ট নালার মত করে ঘরের দু'পাশে দুটো লম্বা গর্ত খুঁড়ল। এবার

মোটা দেখে দুটো গাছ গড়িয়ে এনে শুইয়ে দিল নালা দুটোয়। এই দুটোর উপরই তৈরি হবে গোটা বাড়ি। আরও দুটো কাঠ বাছাই করে নালায় শোয়ানো গাছের দুই কিনারে তুলে দিয়ে একটা আয়তক্ষেত্র তৈরি করল। এবার সবগুলো কাঠের কিনার থেকে কিছুটা অংশ এমন ভাবে কাটল যেন ঘুরিয়ে বসালে খাপে খাপে বসে যায়। হয়ে গেল বাড়ির ভিত।

এবার শুধু গাছের গুঁড়িগুলোয় খাঁজ কেটে একের পর এক বসিয়ে যাওয়া। বাবা একাই তিনপ্রস্থ গাঁথল, তারপর থেকে মাও যোগ দিল কাজে। কিন্তু আরও দুই প্রস্থ গাছের গুঁড়ি গাঁথার পরই ভারী একখণ্ড কাঠ তুলবার সময় হাত থেকে ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যথা পেল মা পায়ে।

কয়েকদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল কাজ।

তারপর এক বিকেলে খুশি মনে ফিরে এল বাবা শিকার থেকে। দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলল, 'ভাল খবর!'

খাঁড়ির ওপারে মাত্র দু'মাইল দূরে একজন প্রতিবেশীকে পাওয়া গেছে। তার সঙ্গে চুক্তিও হয়ে গেছে, দুজন দুজনের কাজে সাহায্য করবে।

'ছেলেটা ব্যাচেলর,' বলল বাবা, 'বলল, ওর বাড়িটা পরে উঠলেও চলবে। বাচ্চা-কাচ্চা সঙ্গে আছে, তাই আগে আমাদেরটা তোলা দরকার। কাল আসবে সাহায্য করতে। তারপর ও গাছ কেটে তৈরি হলে আমি যাব ওর ওখানে।' খুশি খুশি গলায় বলল বাবা, 'কী বলো, ক্যারোলিন, ওকে আসতে বলে ভাল করেছি না?'

'খুব ভাল করেছ,' জবাব দিল মা।

পরদিন সক্কাল ভোরে এসে হাজির হলেন মিস্টার এডওয়ার্ডস্। চিকন, লম্বা–গায়ের রঙ বাদামী। খুবই আদব-তমিজের সঙ্গে মাকে বাউ করলেন। কিন্তু লরাকে বললেন, 'আমি টেনেসির বুনো বেড়াল!'

মাথায় কুনের চামড়া দিয়ে তৈরি টুপি, গায়ে ছেঁড়া-খোঁড়া জাম্পার, পায়ে উঁচু বুট পরা মানুষটা অবাক করে দিলেন লরাকে পিচিক করে তামাক চিবানো রস বহুদূরে ফেলে। শুধু তাই নয়, যেখানে ফেলতে চান সেখানেই ফেলতে পারেন। বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গে কেউ পারবে না।' সত্যিই, অনেক চেষ্টা করেও ধারে-কাছে নিতে পারল না লরা।

খুব দ্রুত কাজ করেন মিস্টার এডওয়ার্ডস্। কাজ করতে করতে মজার মজার গল্প বলেন, গান করেন। দুজন মিলে সারাদিনের চেষ্টায় তুলে ফেললেন চারদিকের দেয়াল যতটা দরকার। দেয়ালের উপর দোচালা ছাউনি দেওয়ার জন্য সরু কাঠের ফ্রেমও তৈরি হয়ে গেল। দক্ষিণের দেয়ালে দরজা কাটা হলো, আর পুব-পশ্চিমের দেয়ালে কাটা হলো দুটো জানালার গর্ত। কাটা গর্তের ধারে লম্বালম্বি ভাবে সরু তক্তা বসিয়ে পেরেক দিয়ে আটকে দিতেই তৈরি হয়ে গেল ঘর, বাকি থাকল শুধু ছাদটা।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, মিস্টার এডওয়ার্ডস্ বিদায় চাইলেন, কিন্তু বাবা-মা ছাড়ল না তাঁকে, জোর করে আটকে রাখল, সাপার খেয়ে তারপর যেতে পারবেন। তাঁরই জন্য বিশেষ ভাবে রান্না করেছে আজ মা।

তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে রান্নার প্রচুর প্রশংসা করলেন মিস্টার এডওয়ার্ডস্।

বাবা বের করল তার বেহালা।

বাজনা শুনবার জন্য মাটিতে শুয়ে পড়লেন মিস্টার এডওয়ার্ডস্। প্রথমে লরা আর মেরির প্রিয় 'আমি এক জিপ্‌সি রাজা' গাইল বাবা। বরাবরের মত হেসে গড়িয়ে পড়ল ওরা।

এবার এমন মন মাতানো ছন্দে বেহালায় সুর তুলল বাবা যে প্রথমে কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তুললেন মিস্টার এডওয়ার্ডস, তারপর উঠে বসলেন, শেষে লাফ দিয়ে উঠে নাচতে শুরু করলেন। বাজনার তালে তালে হাত তালি দিচ্ছে লরা আর মেরি, পায়ে তাল দিচ্ছে মাটিতে।

'দারুণ!' বললেন মিস্টার এডওয়ার্ডস্, 'চমৎকার বেহালা বাজাও তুমি, মি. ইঙ্গল্‌স্!'

অনেকক্ষণ গান-বাজনা-নাচের পর বিদায় নিয়ে চলে গেলেন মিস্টার এডওয়ার্ডস্ বন্দুক হাতে করে। যাওয়ার আগে বারবার করে ধন্যবাদ জানালেন সবাইকে–বড়ই ভাল লেগেছে তাঁর আজকের এই পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়ে।

ছয়

পরদিন সকালে উঠে ঘরের মেঝে থেকে কাঠের টুকরো কুড়িয়ে বাইরে ফেলবার কাজে লেগে গেল লরা আর মেরি। বাবা ওয়্যাগনের সেই সাদা ক্যানভাস দিয়ে ঢেকে দিল বাড়ির ছাদ। মা বিছানা পেতে ফেলল সুন্দর করে।

আপাতত এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, তবে মিস্টার এডওয়ার্ডসের ঘর আর ঘোড়াদের জন্য আস্তাবল তৈরি হয়ে গেলে এ-বাড়ির দিকে আবার মন দিতে পারবে বাবা। তখন ক্যানভাস খুলে কাঠের তক্তা বসিয়ে ছাদ দেওয়া হবে। ফায়ারপ্লেস তৈরি করা হবে, খাট-টেবিল-চেয়ার সবই হবে।

'আচ্ছা, এখন পর্যন্ত একটা ইন্ডিয়ানেরও দেখা পেলাম না, ব্যাপারটা কী বলো তো?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল মা।

'ঠিক বুঝছি না,' জবাব দিল বাবা। 'শিকারে গিয়ে ওদের ক্যাম্প-এলাকা দেখতে পেয়েছি। মনে হয়, অন্য কোনও দিকে শিকার করতে গেছে ওরা দল বেঁধে, ফিরে আসবে শীঘ্রি।'

কিছুদিনের মধ্যেই আবার এসে হাজির মিস্টার এডওয়ার্ডস্। দুজনের চেষ্টায় একইদিনে আস্তাবলের দেয়াল তো উঠলই, ছাদও বানানো হয়ে গেল। দরজাটা বাকি থাকল কেবল। গত কদিন যাবৎ নেকড়ের ডাক শোনা যাচ্ছে বেশি বেশি, তাই আজই পেট আর প্যাটিকে আস্তাবলে রাখবে বলে স্থির করেছে বাবা। চাঁদের আলোয় দরজার ফাঁকের দু'পাশে দুটো খুঁটি গাড়ল বাবা, তারপর পেট আর

প্যাটিকে আস্তাবলে ঢুকিয়ে দরজা ঘেঁষে একের পর এক কাঠের টুকরো সাজিয়ে বন্ধ করে দিল ফাঁকটা।

'এইবার!' বলল বাবা নেকড়েদের উদ্দেশে, 'যত খুশি চেঁচাও, হাঁক-ডাক ছাড়ো! নিশ্চিন্তে ঘুমাব আমি আজ রাতে।'

সকালে কাঠের টুকরো সরাতেই অবাক হয়ে লরা দেখল পেট-এর পাশে চারপায়ে দাঁড়িয়ে টলমল করছে একটা বাচ্চা ঘোড়া। লরা এগোতেই চোখ পাকিয়ে দাঁত বের করে ভয় দেখাল ওকে শান্তশিষ্ট পেট। কিন্তু বাবাকে ও পুরোপুরি বিশ্বাস করে, বাচ্চাটাকে আদর করতে দিল বিনা দ্বিধায়। লরা আর মেরি পরামর্শ করে ছোট্ট ঘোড়াটার নাম রাখল বানি।

পেটকে বেঁধে রাখা হলো বাইরে একটা খুঁটির সঙ্গে, বানি ওর মায়ের চারপাশে লাফ-ঝাঁপ দিল সারাদিন।

ডিনারের পর প্যাটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাবা, চারপাশে কী আছে দেখবে বলে। যথেষ্ট মাংস আছে বাড়িতে, তাই সঙ্গে বন্দুকটা নিল না। খাঁড়ির পাড় ধরে সামনের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘোড়াসহ।

সন্ধ্যা হয়ে গেল, কিন্তু ফিরল না বাবা। রাতের খাবার তৈরি করতে বসল মা চিন্তিত মনে। ঘরের ভিতর ক্যারিকে নিয়ে মেরি। লরা লক্ষ করছে জ্যাককে।

'কী হয়েছে ওর, মা?'

মা চোখ তুলে দেখল এপাশ থেকে ওপাশ পায়চারি করছে জ্যাক, বোঁচা নাকটা কুঁচকে রেখেছে, ঘাড়ের লোমগুলো বার বার খাড়া হচ্ছে, বসছে, আবার খাড়া হচ্ছে। হঠাৎ পেট জোরে পা ঠুকল মাটিতে। খুঁটিকে ঘিরে এক চক্কর দৌড়াল, যেন রশি ছিঁড়ে পালাতে চায়। তারপর থেমে দাঁড়াল, কেমন যেন 'ঘোঁৎ' আওয়াজ করল, বানি কাছ ঘেঁষে এল ওর।

'ব্যাপারটা কী, জ্যাক?' জানতে চাইল মা। চট্ করে তাকাল ও মার দিকে, কিন্তু জবাব দিতে পারল না। চারপাশে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে দেখল মা উঠে দাঁড়িয়ে। অস্বাভাবিক কিছুই দেখতে পেল না।

'মনে হয় কিছু না,' বলল মা অনিশ্চিত গলায়। রান্নায় মন দিল আবার। কিন্তু একটু পর পরই চোখ তুলে দেখছে চারপাশে। অস্থির পায়ে হাঁটছে জ্যাক, ঘাস খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে পেট, ঠায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রয়েছে উত্তর-পশ্চিম দিকে।

হঠাৎ হুড়মুড় করে দৌড়ে হাজির হলো প্যাটি, প্রাণপণে ছুটছে, সামনে ঝুঁকে প্রায় শুয়ে রয়েছে বাবা ওর পিঠে। আস্তাবল ছাড়িয়ে চলে গেল প্যাটি, থামতে পারল না। জোরে রাশ টানল বাবা, ফলে প্রায় বসে পড়ল প্যাটি। থর-থর করে কাঁপছে বেচারী, ঘামে জবজবে হয়ে আছে গা। লাফিয়ে নামল বাবা, নিজেও হাঁপাচ্ছে।

'কী হয়েছে, চার্লস?' জিজ্ঞেস করল মা।

খাঁড়ির দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে বাবা, মাও তাকাল সেদিকে, কিন্তু সব কিছু স্বাভাবিক ওদিকে।

'কী ব্যাপার, চার্লস? এভাবে ছোটালে কেন প্যাটিকে?'

এতক্ষণে হাঁফ ছাড়ল বাবা। 'যাক, সব ঠিক আছে এখানে! আমি ভয়

পাচ্ছিলাম আমার আগেই বুঝি পৌঁছে গেছে নেকড়েগুলো।'

'নেকড়ে?' চেঁচিয়ে উঠল মা, 'কোথায় নেকড়ে?'

'ভয় নেই, ক্যারোলিন,' বলল বাবা, 'একটু জিরিয়ে নিয়ে বলছি।'

দম ফিরে পেয়ে বলল, 'আমি ওকে ছোটাইনি, ও নিজেই প্রাণ ভয়ে ছুটেছে এভাবে। পঞ্চাশটা নেকড়ে, ক্যারোলিন, এত বিশাল নেকড়ে আমি আর দেখিনি! সাপারের পর বলব সব।'

'আমরা ঘরের ভেতরে গিয়ে খেতে পারি,' বলল মা।

'তার দরকার নেই,' বারণ করল বাবা। 'যথেষ্ট সময় থাকতেই আমাদের সাবধান করবে জ্যাক।'

পেট আর তার বাচ্চাকে নিয়ে এল বাবা পানি খাওয়াতে। বরাবর খাঁড়ি থেকে পানি খাইয়ে আনে, কিন্তু প্যাটিকেও আজ পানি খাওয়াল ওয়াশ-টাব থেকে। প্যাটিকে আচ্ছামত দলাইমলাই করে সব কটাকে আস্তাবলে ভরে দরজার ফাঁক বন্ধ করে দিল বাবা।

অন্ধকার হয়ে গেছে। খাওয়ার সময় আগুনের ধারে বসল লরা আর মেরি ক্যারিকে নিয়ে। লরার পাশে বসে আছে জ্যাক, খাড়া করে রেখেছে কান দুটো। মাঝে মাঝে উঠে একপাক ঘুরে এসে আবার বসছে। ঘাড়ের পশম এখন আর খাড়া হয়ে নেই, চাপা গর্জনও নেই কণ্ঠে।

সাপার খেতে খেতে বলল বাবা কী ঘটেছে।

আরও কয়েকজন প্রতিবেশী পাওয়া গেছে। খাঁড়ির দুই পাশে বসতি করছে মানুষ। তিন মাইলও হবে না, বাড়ি বানাচ্ছে একজন, সঙ্গে তার স্ত্রীও রয়েছে-মিস্টার অ্যান্ড মিসেস স্কট। চমৎকার মানুষ ওরা। ওদের ছেড়ে মাইল ছয়েক এগিয়ে আরও দুজন অবিবাহিত লোকের সন্ধান পাওয়া গেছে। ছোট্ট একটা ঘর বানিয়েছে ওরা দুজনের জমির সীমানায়, যেন অর্ধেকটা এর জমিতে পড়ে, অর্ধেকটা ওর। একই বাড়িতে থাকে ওরা যে-যার জমিতে। ঘরের মাঝখানে চুলো জ্বেলে রান্না হয়, খায় একসঙ্গে।

উশখুশ করে উঠল লরা এখনও নেকড়ের কথা আসছে না বলে।

সেই অবিবাহিত দুজনের কাছে জানা গেল, আরও মানুষ যে এ অঞ্চলে বসতি করেছে তা ওরা কল্পনাও করতে পারেনি। ইন্ডিয়ান ছাড়া আর কাউকে দেখতে পায়নি ওরা এতদিন। বাবাকে পেয়ে ওরা এতই খুশি হলো, আর এতই আদর-আপ্যায়ন করল যে ইচ্ছের বিরুদ্ধেও অনেক বেশি সময় থাকতে হলো ওখানে।

ওখান থেকে আরও কিছুদূর এগিয়ে একটা উঁচু জমি থেকে সাদা মত কিছু দেখতে পেল বাবা খাঁড়ির নীচে খালের পাড়ে। কাছে গিয়ে দেখা গেল ওটা একটা ওয়্যাগনের সাদা ঢাকনা। ভিতরে স্ত্রী আর পাঁচ বাচ্চা নিয়ে এক লোক। ওরা এসেছে আইওয়া থেকে, একটা ঘোড়া অসুস্থ হয়ে পড়ায় খালের ধারে নেমে ক্যাম্প করেছে। ঘোড়াটা ভাল হয়ে উঠেছে এখন, কিন্তু ওরা নিজেরাই জ্বরে পড়ে গেছে। বড় পাঁচজন এতই অসুস্থ যে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, ওদের পরিচর্যা করবার জন্য রয়েছে শুধু মেরি আর লরার সমান একটা ছেলে আর একটা মেয়ে।

ওদের জন্য যতটুকু করা সম্ভব করে ফিরে এল বাবা সেই ব্যাচেলর দুজনের

কাছে। তক্ষুণি ছুটল ওদের একজন পরিবারটিকে উঁচু জমিতে নিয়ে আসবার জন্য। খাল-পাড়ের বদ-হাওয়া থেকে দূরে সরে গেলে খুব তাড়াতাড়িই সেরে যাবে জ্বর।

অনেক দেরি করে ফেলেছে, তাই রাস্তা কমাবার জন্য কোনাকুনি বাড়ির দিকে রওনা হলো বাবা প্রেয়ারির মধ্য দিয়ে। প্যাটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোচ্ছিল, হঠাৎ কোত্থেকে এক দঙ্গল নেকড়ে বাঘ এসে হাজির। বাবা পড়ে গেল ওদের মাঝখানে।

'বিরাট নেকড়ের পাল, কমপক্ষে পঞ্চাশটা তো হবেই। আকারেও সাধারণ নেকড়ে বাঘের প্রায় দ্বিগুণ। খুব সম্ভব এগুলোকেই বাফেলো-উল্‌ফ্ বলে। বাপরে-বাপ! এত বড় নেকড়ে বাঘ আমি জীবনে দেখিনি—একেকটা তিনফুট উঁচু তো হবেই। সড়সড় করে মাথার সব চুল খাড়া হয়ে গেল আমার!'

'বন্দুকও তো নাওনি,' বলল মা।

'না নিয়ে বোধহয় ভালই করেছিলাম। একটা বন্দুক দিয়ে পঞ্চাশটা নেকড়েকে সামাল দেয়া সম্ভব ছিল না। আর প্যাটিও দৌড়ে পারত না ওদের সঙ্গে।'

'কী করলে তখন?'

'কিচ্ছু না,' বলল বাবা। 'দৌড় দেয়ার তালে ছিল প্যাটি, অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রাখলাম ওকে, কারণ আমি জানি, এখন দৌড় দিলেই আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সবকটা নেকড়ে। রাশ টেনে রেখে যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটতে বাধ্য করলাম আমি ওকে।'

'সর্বনাশ! তারপর?' রুদ্ধশ্বাসে বলল মা।

'ওফ্, কী বলব! লাখ টাকা সাধলেও কেউ আমাকে দিয়ে আবার এ-কাজ করাতে পারবে না। ক্যারোলিন, ও-রকম নেকড়ে আমি জীবনে দেখিনি। মস্তবড় একটা ছুটছিল পাশাপাশি, ঠিক আমার পায়ের রেকাবের পাশে। ইচ্ছে করলেই ওর পাঁজরে লাথি লাগাতে পারি—এত কাছে। আমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাল না ওরা, কোনও পাত্তাই দিল না। সম্ভবত কোথাও থেকে ভরপেট খেয়ে ফিরছিল ওরা। আমাদের চারপাশে চলছে এতগুলো নেকড়ে, নিজেদের মধ্যে খেলা করছে, লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছে—ঠিক যেন একদল পোষা কুকুর।'

'কী সাঙ্ঘাতিক!' আবার বলল মা।

হাঁ করে বাবার দিকে চেয়ে রয়েছে লরা খাওয়া ভুলে। বুকের ভিতর ধুপ-ধাপ করে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। শুনছে তো না, গিলছে যেন বাবার কথা।

'থর-থর করে কাঁপছে প্যাটি, ঘাম ছুটে গেছে সারা গা থেকে—এমন ভয় পেয়েছে! আমিও ঘামছি। কিন্তু কিছুতেই ওকে দৌড়ে পালাতে দিলাম না, নেকড়ের পালের মাঝখানে বাধ্য করলাম ওকে হাঁটতে। সিকি মাইলের মত চললাম এইভাবে, তারপর খাঁড়ির ধারে এসে হঠাৎ বামদিকে ঘুরে নীচে নেমে গেল ওদের নেতাটা, বাকিগুলোও নেমে গেল ওর পেছন পেছন। বোধহয় পানি খেতে গেল। শেষ নেকড়েটা চোখের আড়াল হতেই আমার ইশারা পেয়ে ছুট লাগাল প্যাটি। এমনই দৌড়, যে বাড়ি ফিরেও থামতে পারছিল না।

'সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে ছিলাম, খালের তীর ঘেঁষে দৌড়ে ওরা যদি সোজা এদিকে এসে থাকে! একটু ভরসা পাচ্ছিলাম যে বন্দুক রয়েছে তোমার কাছে, ঘরে ঢুকতে পারত না নেকড়ে; কিন্তু পেট আর বানি ছিল বাইরে।'

'ওদের রক্ষা করার ব্যবস্থাও করতে পারতাম,' বলল মা। 'জ্যাকই আগাম জানিয়ে দিত বিপদের কথা।'

'তা ঠিক। কিন্তু আমি তখন যুক্তি-বুদ্ধির বাইরে। ওরা তোমাদের কোনও ক্ষতি করত না, কারণ পেট ভরা ছিল ওদের। ক্ষুধার্ত থাকলে তো আমাকেই···'

'ওই দেখো, কত বড় চোখ···' লরার দিকে ভুরুর ইঙ্গিত করে দেখাল মা।

চট্ করে সামলে নিল বাবা। লরা আর মেরিকে সাহস দেওয়ার জন্য বলল, 'যাক, সব ভাল যার শেষ ভাল। ওরা এখান থেকে বহু মাইল দূরে এখন।'

'ওরা তোমাকে আক্রমণ করল না কেন, বাবা?' জিজ্ঞেস করল লরা।

'ঠিক জানি না, লরা,' মাথা নাড়ল বাবা। 'মনে হয় এতই ঠেসে খেয়েছিল যে আরও খাওয়ার কথা ভাবতেই গা বমি-বমি করছিল ওদের, ওরা আসলে যাচ্ছিল খালের ধারে পানি খেতে। কিংবা হয়তো খেলায় মত্ত ছিল বলে খেয়ালই করতে পারেনি আমাদের। হয়তো আমার কাছে বন্দুক নেই দেখে বুঝে নিয়েছে আমি ওদের কোনও ক্ষতি করতে পারব না–কাজেই আমাকে গুরুত্ব দেয়ার কোনও দরকার নেই।'

অস্থির পায়ে আস্তাবলের ভিতর হেঁটে বেড়াচ্ছে পেট আর প্যাটি। ক্যাম্প ফায়ারের চারপাশে এক চক্কর ঘুরে এল জ্যাক, তারপর থেমে দাঁড়িয়ে নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকল, কান খাড়া করল কোনও আওয়াজ শুনবার চেষ্টায়। লরা দেখল, আবার ঘাড়ের পশম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে জ্যাকের।

'ছোট মেয়েদের শুতে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে,' বলেই উঠে পড়ল মা। থালা-বাসন না ধুয়েই ঘরের ভিতর নিয়ে গেল লরা, মেরি আর ক্যারিকে। ওদেরকে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতে বলে ধোয়া-মোছার কাজ সারতে বেরিয়ে গেল আবার।

চোখ মেলে শুয়ে আছে লরা, পরিষ্কার দেখতে পেল দরজায় টাঙানো লেপ সরিয়ে বন্দুকটা তুলে নিল বাবা। বাইরে ঠুং-ঠাং আওয়াজ বাসন-পেয়ালার। তামাকের গন্ধ এল নাকে।

এ-বাড়ির চার দেয়াল নিরাপদ, কিন্তু দরজা এখনও তৈরি হয়নি, দরজার ফাঁক বন্ধ করা হয়েছে লেপ ঝুলিয়ে। লরা ভাবছে, লেপ সরিয়ে একটা নেকড়ে কি ঢুকতে পারবে না? ওরা এখানে কতটা নিরাপদ?

অনেকক্ষণ পর লেপ সরিয়ে পা টিপে ঢুকল মা। বাবাও ফিরে এসে বিছানায় উঠল। জ্যাক শুয়ে পড়ল ঠিক দরজার সামনে–কিন্তু দু'পায়ের উপর চিবুক রাখল না আজ, মাথা উঁচু করে রেখেছে, কান খাড়া। এতক্ষণে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো লরা, কাছে পিঠে নেকড়ে এলেই ঘেউ-ঘেউ করবে জ্যাক।

হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসল লরা বিছানার উপর। ঘুমিয়ে পড়েছিল ও, কেন জেগে গেল বলতে পারবে না। জানালা আর দেয়ালের ফাঁক-ফোকর দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকেছে ঘরে, অন্ধকার নেই আর। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে বাবা।

হাতে বন্দুক।

লরার ঠিক কানের পাশে ডেকে উঠল একটা নেকড়ে।

এক ঝটকায় সরে গেল লরা দেয়ালের পাশ থেকে। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। চট্ করে মাথা ঢাকল মেরি লেপ দিয়ে। গর্-গর্ আওয়াজ করছে জ্যাক, দাঁত দেখাচ্ছে দরজায় টাঙানো লেপটাকে।

'চুপ থাকো, জ্যাক,' বলল বাবা।

বাড়ির চারপাশ থেকে আসছে নেকড়ের ডাক। ভয়ঙ্কর। মনে হচ্ছে, পথ খুঁজছে ওরা ভিতরে ঢোকবার। নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে পড়ল লরা, ছুটে বাবার কাছে যাওয়ার ইচ্ছেটা জোর করে দমন করল, কারণ ও জানে, এখন তাকে বিরক্ত করা ঠিক নয়। ওকে দেখতে পেল বাবা, স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে।

'দেখবে, লরা?' নরম গলায় জানতে চাইল বাবা। ওকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বলল, 'এদিকে এসো।'

জানালার জন্য কাটা গর্ত দিয়ে দেখল লরা চাঁদের আলোয় গোল হয়ে বসে আছে ওরা। কাছেই। ওরাও দেখতে পাচ্ছে লরাকে পরিষ্কার। এতবড় নেকড়ে এর আগে দেখেনি লরা। সবচেয়ে বড়টা ওর চেয়েও লম্বা, এমন কী মেরির চেয়েও। ধক্-ধক্ করে জ্বলছে সবুজ চোখ।

'বিরাট!' ফিস্ফিস্ করে বলল লরা।

'হ্যাঁ। আর দেখো পশমগুলো কেমন চক্চক্ করছে! বাড়ির ওপাশেও আছে আরও এতগুলো।'

আকাশের দিকে নাক তুলে ধাড়ি নেকড়েটা লম্বা ডাক ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে এক সঙ্গে ডেকে উঠল বাকি সব কটা। আস্তাবলে ভয়ে চেঁচাচ্ছে আর দৌড়াদৌড়ি করছে পেট আর প্যাটি।

'এবার যাও, ছোট্ট আধ-বোতল, শুয়ে পড়োগে। জ্যাক আর আমি জেগে আছি, কোনও ভয় নেই।'

বিছানায় গেল বটে, কিন্তু বহুক্ষণ ঘুম এল না লরার। দেয়ালের ঠিক ওপাশে ফোঁস-ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলছে ওরা, মাটি আঁচড়াচ্ছে পিছনের দু'পায়ে, দেয়ালের ফাঁক-ফোকরে নাক ঠেকিয়ে গন্ধ শুঁকছে। আবার একবার ডেকে উঠল ধাড়ি নেকড়েটা, জবাব দিল সবাই সমবেত কণ্ঠে।

একবার এপাশের জানালা, একবার ওপাশের জানালায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে বাবা নিঃশব্দে। জ্যাক পায়চারি করছে দরজায় টাঙানো লেপের সামনে। যতই হাঁকডাক করুক, ভিতরে ঢোকবার সাধ্য নেই নেকড়েগুলোর। ভাবতে ভাবতে ঘুমে ঢলে পড়ল লরা।

সাত

সকালে উঠে দেখা গেল চলে গেছে নেকড়ের পাল।

সেইদিনই খাঁড়ি থেকে কাঠ কেটে এনে যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে গেল বাবা শক্ত-পোক্ত একটা দরজা বানাতে–লেপ দিয়ে আর চলছে না। সহকারী হিসেবে লরাও পরিশ্রম করল অনেক। বিকেল নাগাদ তৈরি হয়ে গেল চমৎকার একখানা ওক কাঠের দরজা।

পরদিন শিকারে গেল বাবা মাংস শেষ হয়ে গেছে বলে।

তার পরদিন তৈরি হয়ে গেল আস্তাবলের দরজা। ব্যস, সবাই এখন নিরাপদ। আস্তাবলের দরজায় তালা দিয়ে রাখলে ঘোড়া চুরি যাওয়ারও আর ভয় থাকবে না।

বাবা বলল, 'দাঁড়াও, এডওয়ার্ডসের বাড়িটা তোলা হয়ে গেলেই সুন্দর একটা ফায়ারপ্লেস বানিয়ে দেব তোমাকে, ক্যারোলিন। তখন ঘরেই রান্না করতে পারবে।'

খালের পার থেকে ওয়্যাগন ভরে পাথর কুড়িয়ে আনতে শুরু করল বাবা। একদিন মেরি আর লরাকেও নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু খাঁড়ির নীচে গুমোট গরম আর মশার প্রকোপ দেখে পরে আর ওদের যাওয়া হয়নি। যথেষ্ট পাথর জমা হতে একদিন কাদা মাটি গুলে চিমনি আর ফায়ারপ্লেস গাঁথার জন্য তৈরি হলো বাবা। ঘরের যেদিকে দরজা তার ঠিক উল্টো দিকের দেয়াল ঘেঁষে ঘরের বাইরে কাদা দিয়ে পাথর গেঁথে ফায়ারপ্লেস আর চিমনি বানিয়ে ফেলল বাবা। তারপর ভিতর থেকে নীচের দিকের কয়েকটা গাছের গুঁড়ি কয়েক ফুট কেটে দিতেই দেখা গেল চারকোনা ফায়ারপ্লেস, মাঝখানে দাঁড়ালে চিমনির ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যায়। গাছের কাটা অংশের দুদিকে দুটো তক্তা পেরেক ঠুকে বসিয়ে তার উপর আরেকটা তক্তা সমান্তরাল করে বসিয়ে দিল বাবা, ব্যস সুন্দর একটা তাক হয়ে গেল। সেই তাকের উপর মা তার চিনা পুতুলটা বসিয়ে দিতেই মনে হলো যেন হেসে উঠল ঘরটা।

এখন থেকে ঘরেই রান্না করতে পারবে মা, বাইরের রোদ আর হাওয়ায় গলদঘর্ম হতে হবে না। নতুন ফায়ারপ্লেসে মুরগি রোস্ট করল মা, সেদিন থেকে সবাই ঘরের ভিতর খেতে শুরু করল। বাবাও ঝটপট মোটা গাছের গুঁড়ি বসিয়ে কয়েকটা চেয়ার বানিয়ে ফেলল, দুটো ওক কাঠের তক্তা জুড়ে তৈরি করে ফেলল টেবিল। কুঠার দিয়ে যতটা সম্ভব মসৃণ করেছে বাবা তক্তাগুলো, তবু যেটুকু এবড়োখেবড়ো থাকল সেটা ঢাকা পড়ে গেল মা ওটার উপর একটা পরিষ্কার টেবিলক্লথ বিছিয়ে দিতেই।

এবার বাকি থাকল ঘরের ছাদ থেকে ক্যানভাস সরিয়ে তক্তা বসানোর কাজ।

তারপর মেঝেটা হয়ে গেলেই সত্যিকার একটা সুন্দর বাড়ি বলা যাবে এটাকে। আবার খাঁড়ি থেকে কাঠ কেটে আনতে শুরু করল বাবা। একদিন শিকার করে তো দুদিন কাটে কাঠ। সেই কাঠ চিরে তৈরি করল তক্তা। তারপর একদিন মিস্টার এডওয়ার্ডসের কাছ থেকে কিছু পেরেক ধার নিয়ে শুরু করল ছাতের কাজ। মাপ-জোখ আগেই সেরে রেখেছিল বাবা, তাই পেরেক মেরে তক্তা বসাতে বেশি সময় লাগল না। একটা তক্তার উপর পরের তক্তাটা সামান্য চড়িয়ে দিয়েছে বাবা, যাতে প্রবল বৃষ্টিতেও এক ফোঁটা পানি ভিতরে না ঢোকে।

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল মা ছাদের। বাবা হেসে বলল, 'দাঁড়াও, মেঝেটা তৈরি হয়ে গেলেই তোমার জন্যে চমৎকার একটা খাট বানিয়ে দেব।'

সত্যিই একদিন তৈরি হয়ে গেল মেঝেও, বন্ধ হয়ে গেল দেয়ালের ফাঁক-ফোকর, জানালায় লেগে গেল পাল্লা—বৃষ্টি বা ঠাণ্ডা ঢোকার সব রাস্তা বন্ধ।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত মনের আনন্দে বেহালা বাজাল বাবা, গান গেয়ে শোনাল মাকে, লরাকে, মেরিকে। বাইরে জ্বল-জ্বল করছে আকাশ ভরা তারা, প্রেয়ারির লম্বা ঘাসে ঢেউ তুলে বয়ে যাচ্ছে জোর হাওয়া। খাঁড়ির ওদিক থেকে ভেসে আসছে নাইটিঙ্গেলের মিষ্টি ডাক।

একদিন সত্যিই দুজন ইন্ডিয়ানকে দেখতে পেল লরা।

সকালে বন্দুক নিয়ে শিকারে গেছে বাবা। অনেক কাকুতি-মিনতি করে আর লাফ-ঝাঁপ দিয়েও জ্যাক বাবাকে রাজি করাতে পারেনি। বাবা বলেছে, 'না, জ্যাক। বাড়ি পাহারা দিতে হবে তোমার।' একটা চেইন দিয়ে ওকে আস্তাবলের সঙ্গে বেঁধে রেখে মেয়েদের বলেছে, 'ওকে ছেড়ে দিয়ো না।'

অভিমানে শুয়ে পড়ল জ্যাক। চোখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে—বাবার চলে যাওয়া দেখবে না। থেকে থেকেই কুঁই-কুঁই আওয়াজ করছে সে গলা দিয়ে। লরা ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল অনেক, কিন্তু কাজ হলো না। শুধু অভিমান হলে একটা কথা ছিল, আসলে চেইন দিয়ে বেঁধে রাখায় অপমানও বোধ করছে ও।

সারাটা সকাল ওর মান ভাঙাবার চেষ্টা করল মেরি আর লরা, পিঠে হাত বুলিয়ে দিল, কানের পিছনে চুলকে দিল, কিন্তু জ্যাকের মন ভাল হলো না। ওদের হাত একটু চেটে দেয় বটে, কিন্তু পর মুহূর্তে বিমর্ষচিত্তে কুঁই-কুঁই করে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে রাগী গর্জন ছাড়ল জ্যাক, ঘাড়ের পশম উঠে দাঁড়িয়েছে। চমকে ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে মেরি আর লরা দেখতে পেল অর্ধ নগ্ন দুজন ইন্ডিয়ানকে। ট্রেইল ধরে হেঁটে আসছে এদিকে। মাথার পিছনে টিকির মত লম্বা চুল, তাতে গোঁজা রয়েছে পাখির পালক। চোখ জোড়া কালো, চকচকে।

অনেক কাছে চলে এল ওরা, তারপর বাড়ির ওপাশে আড়াল হয়ে গেল। যেখানে আবার দেখা যাবে ওদের, সেদিকটায় চোখ রেখে বসে থাকল লরা আর মেরি, কিন্তু বেশ অনেকক্ষণ চেয়ে থেকেও আর দেখা গেল না কাউকে।

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল লরার যখন বুঝল কেন ওদের আর দেখা যাচ্ছে না—ওরা ঢুকে পড়েছে বাড়িতে। মা আর ক্যারি আছে ওখানে। তাকিয়ে দেখল, থরথর করে কাঁপছে মেরি।

চেইন ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে এদিকে জ্যাক, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে রাগে। বাড়ির দিক থেকে কোনও শব্দ নেই।

'মা আর ক্যারির কী হলো!' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল লরা।

'জানি না!' জবাব দিল মেরি কাঁপা গলায়।

'জ্যাককে ছেড়ে দিই,' বলল লরা, 'ওদের ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে জ্যাক।'

'বাবা বারণ করে গেছে,' বলল মেরি।

'বাবা তো আর জানত না যে ইন্ডিয়ানরা আসবে,' যুক্তি দেখাল লরা।

'কিন্তু মানা করেছে ওকে ছাড়তে,' বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলল মেরি।

'আমি চললাম মা'র কাছে। মা'র হয়তো সাহায্য দরকার!' কথাটা বলেই দৌড়ের ভঙ্গিতে দুই পা এগোল লরা, হাঁটার ভঙ্গিতে এক পা; তারপর এক ছুটে ফিরে এল জ্যাকের কাছে। কিন্তু যখন মনে পড়ল ওখানে একা রয়েছে মা ক্যারিকে নিয়ে, তখন দুই হাত মুঠি পাকিয়ে সাহস সঞ্চয় করে ছুটল বাড়ির দিকে। ওর পিছন পিছন আসছে মেরি।

দরজার কাছে এসে দেখতে পেল লরা চুলোর ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোক দুজন। পশুর চামড়া দিয়ে ঢাকা রয়েছে কোমরের কিছুটা অংশ, আর পায়ে রয়েছে মোকাসিনের জুতো—বস্ত্র বলতে কিচ্ছু নেই গায়ে। চুলোর দিকে ঝুঁকে কী যেন রান্না করছে মা, পাশেই ক্যারি।

ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ নাকে আসতেই যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে দাঁড়াল লরা। ওদের গা থেকে আসছে এই বিশ্রী গন্ধ। দুজনেরই কোমরের দুপাশে গোঁজা রয়েছে একটা ছোরা আর ছোট একটা কুঠার। গর্বের ভঙ্গিতে বুকের উপর ভাঁজ করে রেখেছে ওরা দুই হাত।

চট্ করে খাড়া করে রাখা একটা তক্তার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল লরা। শুনতে পেল, চুলোর উপর চড়ানো হাঁড়ির ঢাকনা খুলল মা, ইন্ডিয়ানরা বসে পড়ল মেঝেতে, খাচ্ছে। তক্তার আড়াল থেকে একটা চোখ বের করে দেখল লরা কর্নব্রেড খাচ্ছে ওরা হাপুস-হুপুস করে। সব শেষ করে মেঝে থেকেও খুঁটে তুলে মুখে দিল। জ্যাকের শিকলের অস্পষ্ট ঝন্-ঝন্ শব্দ শুনতে পাচ্ছে লরা—এখনও চেষ্টা করে চলেছে ও বাঁধনমুক্ত হওয়ার জন্য।

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল ওরা দুজন। একজন কর্কশ স্বরে কী যেন বলল, বড় বড় চোখ করে চেয়ে রইল মা, কিছু বলল না। এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল ওরা।

লম্বা করে শ্বাস ছাড়ল মা। দুই হাতে জড়িয়ে ধরে আছে লরা আর মেরিকে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ট্রেইল ধরে পশ্চিম দিকে চলে যাচ্ছে ইন্ডিয়ানরা। লরা টের পেল সর্বাঙ্গ কাঁপছে মায়ের। ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়।

'শরীর খারাপ লাগছে, মা?' জিজ্ঞেস করল মেরি।

'না,' মাথা নাড়ল মা। 'ওরা চলে গেছে বলে বাঁচলাম!'

'বড় বিশ্রী গন্ধ ওদের গায়ে, ওয়্যাক-থু!' বলল লরা।

'স্কাঙ্কের চামড়া পরেছিল বলে ওরকম গন্ধ,' মা বলল। 'ছিঃ, ভাল করে শুকায়নি চামড়াগুলো এখনও।'

উঠে পড়ল মা। ডিনার তৈরি করতে হবে। একটু পরেই এসে পড়বে বাবা। 'মেরি, তুমি লাকড়ি নিয়ে এসো। লরা, তুমি টেবিল পাতো।'

থালা, বাসন, ছুরি, কাঁটা সাজিয়ে ফেলল লরা টেবিলে। এমন সময় ফিরে এল বাবা।

দুই বোন ছুটে গিয়ে ধরল বাবার দুই হাত। একই সঙ্গে কথা বলছে দুজন।

'আরে, আরে! ব্যাপার কী?' ওদের চুল এলোমেলো করে দিল বাবা। 'অ্যাঁ? ইন্ডিয়ান? তা হলে ইন্ডিয়ান দেখতে পেলে, লরা? আমিও দেখেছি, এই তো কিছুটা পশ্চিমেই ওদের ক্যাম্প আছে একটা। এখানে এসেছিল নাকি, ক্যারোলিন?'

'হ্যাঁ, চার্লস। দু'জন,' বলল মা। 'তোমার তামাক সব নিয়ে গেছে। এক গাদা কর্নব্রেড খেয়ে গেছে। আঙুল দিয়ে কর্নমীল দেখিয়ে আমাকে ইশারা করল রান্না করার জন্যে। ওদের না খাইয়ে উপায় ছিল না। যা ভয় পেয়েছিলাম!'

'ঠিকই করেছ তুমি, ক্যারোলিন,' বাবা বলল। 'ইন্ডিয়ানদের শত্রু না বানানোই ভাল। উফ্! কী গন্ধ রে, বাবা!'

'স্কাঙ্কের কাঁচা চামড়া পরে এসেছিল,' বলল মা। 'পোশাক বলতে ওই কোমরে জড়ানো চামড়াটুকুই।'

'ভয়ানক বোটকা! আরও ঘন ছিল নিশ্চয়ই তখন?'

'ওরেব্বাপ! আমাদের অর্ধেক কর্নমীল ধসিয়ে দিয়ে গেছে ব্যাটারা।'

'তুমি কিচ্ছু ভেবো না, ক্যারোলিন। আমাদের এখনও যা আছে, যথেষ্ট। তা ছাড়া এই দেশময় দৌড়ে বেড়াচ্ছে অঢেল তাজা মাংস, আমাদের ভয় কী?'

'আর তোমার তামাক?'

'আরে দূর! কদিন তামাক না ফুঁকলে কী হয়? ইন্ডিপেন্ডেন্স শহরে তো যাচ্ছিই কিছুদিনের মধ্যে, ওখান থেকে কিনে আনা যাবে এক বস্তা।' হাসল বাবা, 'এদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। নইলে এক রাতে হয়তো ঘুম থেকে জেগে দেখব একদঙ্গল পিশা...'

থেমে গেল বাবা। কী বলতে যাচ্ছিল বারবার জিজ্ঞেস করেও জানতে পারল না লরা। কারণ, ওদিক থেকে মাথাটা সামান্য নেড়ে বারণ করেছে মা।

'চলো তো, মেরি-লরা,' ডাকল বাবা। 'দরজার কাছে একটা খরগোশ আর দুটো মুরগি রেখে এসেছি—চলো, ওগুলোর চামড়া ছাড়িয়ে ফেলি রুটি সেঁকা হতে হতে। জলদি, পেটে জ্বলছে আমার নেকড়ের খিদে।'

খরগোশের ছাল ছাড়িয়ে বাইরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখল বাবা, চমৎকার একটা শীতের টুপি হবে ওটা দিয়ে।

লরা ভুলতে পারছে না ইন্ডিয়ানদের কথা। বাবাকে জিজ্ঞেস করল, জ্যাককে যদি তখন ছেড়ে দিত, তা হলে ওই ইন্ডিয়ানদের ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত না?

হাতের ছুরিটা নামিয়ে রেখে গম্ভীর হয়ে গেল বাবা। বলল, 'জ্যাককে লেলিয়ে দেয়ার কথা সত্যিই মনে এসেছিল তোমাদের?'

মাথা নিচু করে লরা বলল, 'হ্যাঁ, বাবা।'

'আমি বারণ করে যাবার পরেও?' ভয়ানক কঠোর হয়ে গেল বাবার কণ্ঠস্বর।

ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছে লরার, কথা বলতে পারল না। মেরি বলল, 'হ্যাঁ,

বাবা।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল বাবা। তারপর লম্বা শ্বাস ফেলল, ইন্ডিয়ানরা চলে যাওয়ার পর ঠিক মা যেমন ফেলেছিল।

'এখন থেকে,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল বাবা, 'মনে রাখবে, এখন থেকে যা বলব তাই করবে তোমরা, ভুলেও কোনদিন আমার কথার অবাধ্য হবে না। বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ, বাবা,' অস্ফুট স্বরে বলল দুজন।

'জানো তোমরা, জ্যাককে লেলিয়ে দিলে কী ঘটত?'

'না, বাবা।'

'ও গিয়ে ঠিকই ওদের কামড় দিত। ভয়ানক বিপদে পড়ে যেতাম সবাই আমরা। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, বাবা।' বলল বটে, কিন্তু না বুঝেই। লরা জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কি জ্যাককে মেরে ফেলত?'

'হ্যাঁ, আরও অনেক কিছু করত। তোমরা দুজন মনে রাখবে, যাই ঘটুক না কেন, তোমাদের যা বলা হবে ঠিক তাই করবে। কথা শুনে চললে তোমাদের কোনও ক্ষতি হবে না।'

আট

এবার একটা চমৎকার খাট বানিয়ে ফেলল বাবা। একটা কাবার্ড বানিয়ে দেয়ালের গায়ে ঝুলাল, তালাও লাগাল তাতে, যেন আবার এসে সব কর্নমীল নিয়ে যেতে না পারে ইন্ডিয়ানরা। লরা আর মেরির খাট কদিন পরে হবে, তার আগে একটা কুয়ো খুঁড়বে বলে স্থির করল বাবা। ফলে যখন খুশি পানি তুলতে পারবে মা, খাল থেকে বয়ে আনতে হবে না রোজ-রোজ।

বাড়ির এক কোণে বেশ বড় করে গোল একটা দাগ টানল বাবা। তারপর খুঁড়তে শুরু করল। যতই মাটি তুলছে ততই ডুবে যাচ্ছে বাবা। এক সময় আর দেখা গেল না তাকে, শুধু খানিক পর পর এক গাদা মাটি উড়ে এসে পড়ছে উপরে। তারপর এক সময় কোদালটা উড়ে এসে পড়ল, পরমুহূর্তে লাফিয়ে কিনারা ধরে উঠে এল বাবা।

'একা এর বেশি আর খোঁড়া যাবে না,' বলল বাবা। 'আরেকজন লোক লাগবে।'

বন্দুকটা নিয়ে প্যাটির পিঠে চড়ে রওনা হয়ে গেল বাবা লোকের খোঁজে। ফিরে এল মোটাতাজা এক খরগোশ নিয়ে। মিস্টার স্কটের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে, তিনি সাহায্য করবেন। বিনিময়ে তাঁর কুয়ো খোঁড়ার সময় সাহায্য করবে বাবা।

লরা, মেরি বা মা কখনও মিস্টার বা মিসেস স্কটকে দেখেনি। দূরে একটা

উপত্যকার ঢালে চোখের আড়ালে তাঁদের বাড়ি। লরা মাঝে মাঝে ধোঁয়া উঠতে দেখেছে ওদিকে।

সকালে এসে হাজির হলেন মিস্টার স্কট। মোটাসোটা বেঁটে মানুষ তিনি, রোদে পুড়ে চামড়া খসে লাল হয়ে গেছে শরীর। হাসিখুশি।

দুজনে মিলে প্রথমে কাঠ দিয়ে তৈরি করল শক্তপোক্ত একটা চরকি-কল। নীচ থেকে মাটি ভরা বালতি মোটা দড়ির সাহায্যে উঠে আসবে উপরে হাতল ঘুরালেই, খালি বালতিটা নেমে যাবে নীচে। সকালে মিস্টার স্কট নীচে নেমে মাটি কাটে, বাবা চরকি ঘুরিয়ে উপরে তুলে এনে খালি করে বালতি। আর বিকেলে বাবা নামে নীচে, মিস্টার স্কট ঘোরায় চরকি।

প্রতিদিন সকালে মিস্টার স্কট নীচে নামবার আগে একটা বালতিতে মোমবাতি বসিয়ে আগুন জ্বেলে দেয় বাবা, বালতিটা নামানো হয় প্রথমে। যদি আলোটা ঠিক মত জ্বলে তা হলে মিস্টার স্কট নীচে নেমে যায় রশি বেয়ে, মোমবাতি তুলে এনে নেভায় বাবা।

কিন্তু প্রতিদিনই আপত্তি জানায় মিস্টার স্কট। 'এসবের কোনও অর্থ হয় না, ইঙ্গল্‌স্। গতকাল ঠিক ছিল, আর আজ সকালে বিষাক্ত গ্যাস এসে যাবে ওখানে? কী করে?'

'বলা যায় না,' উত্তর দেয় বাবা, 'সাবধানের মার নেই।'

এক সকালে বাবার নাস্তা খাওয়া শেষ হয়নি, এমন সময় মিস্টার স্কট এসে হাজির। বাইরে থেকে ভেসে এল তাঁর হাসিখুশি গলা, 'এই যে, ইঙ্গল্‌স্, এত দেরি কীসের? জল্‌দি এসো। রোদ উঠে গেছে।' কফি শেষ করে বেরিয়ে গেল বাবা শিস দিতে দিতে।

চরকি-কলের ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ শোনা গেল। মা বিছানা ঠিক করছে, লরা আর মেরি বাসন ধুচ্ছে; এমন সময় বাবার গলা শোনা গেল, 'স্কট!' আরও জোরে ডাকল বাবা, 'স্কট্! স্কট্!' তারপর হাঁক ছাড়ল, 'ক্যারোলিন! জল্‌দি! এদিকে এসো!'

দৌড়ে বেরিয়ে গেল মা। লরাও ছুটল পিছন পিছন।

'জ্ঞান হারাল, না কী হলো, নীচে নড়ছে না স্কট,' বলল বাবা। 'আমার যেতে হবে এখন।'

'মোমবাতি পাঠাওনি?' জিজ্ঞেস করল মা।

'না। আমি মনে করেছিলাম ও নিশ্চয়ই দেখে নিয়েছে।' একটা বালতি রশি কেটে সরিয়ে রাখল বাবা, রশির প্রান্তটা চরকি-কলের সঙ্গে বাঁধল শক্ত করে।

'না, চার্লস্। তোমার যাওয়া ঠিক হবে না।' বাবার মতলব বুঝে আপত্তি জানাল মা।

'যেতেই হবে আমার, ক্যারোলিন।'

'না! তুমি যেতে পারবে না। যেয়ো না, চার্লস!'

'একটুও ভয় পেয়ো না, লক্ষ্মী,' বলল বাবা। 'দম আটকে রাখব আমি। ওকে তো ওখানে মরতে দেয়া যায় না।'

'প্যাটিকে নিয়ে সাহায্যের জন্যে যাও না কেন? তোমাকে ওর ভিতর নামতে

দেব না আমি।'

'সময় নেই।'

'যদি তোমাকে টেনে তুলতে না পারি? তুমিও যদি অজ্ঞান হয়ে যাও...'

'পারবে, পারবে,' বলতে বলতে সড়সড় করে রশি বেয়ে নেমে গেল বাবা নীচে। কপালে হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে নীচের দিকে চেয়ে রয়েছে মা।

বুক কাঁপছে লরার। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে মা'র দিকে।

হঠাৎ লাফিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল মা, দুই হাতে ধরল চরকি-কলের হাতল। গায়ের সব শক্তি দিয়ে ঘোরাবার চেষ্টা করছে মা ওটাকে। একটু ঘুরল চরকি-কল, তারপর আর একটু। লরার মনে হলো বাবাও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে কুয়োর নীচে, মা তুলতে পারছে না টেনে।

একটু পরেই বাবার হাত দেখতে পেল লরা, উঠে আসছে রশি বেয়ে, তারপর মাথা দেখা গেল, হাপরের মত উঠছে-নামছে বুক। কোনমতে রশি ছেড়ে পা রাখল মাটিতে, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, বসে পড়ল মাটির উপর।

চরকি-কল ঘুরছে এবার জোরে। উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে বাবা, মা বলল, 'বসে থাকো, চার্লস্! লরা, পানি নিয়ে এসো। জলদি!'

এক বালতি পানি নিয়ে ফিরে এসে লরা দেখল বাবা-মা দুজন মিলে ঘোরাচ্ছে চরকি-কলের হাতল। ধীরে ধীরে উপরে উঠে এল দ্বিতীয় বালতিটা, তার সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় উঠে এসেছেন মিস্টার স্কট, অজ্ঞান। ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে তাঁর হাত-পা।

টেনে ওঁকে ঘাসের উপর নিয়ে এল বাবা। নাড়ি দেখল হাতের, বুকে কান ঠেকিয়ে শুনল, তারপর বলল, 'শ্বাস নিচ্ছে। ঠিক হয়ে যাবে, ক্যারোলিন। আমিও ঠিক আছি। শুধু মাথাটা একটু ঘুরছে।'

এতক্ষণে কান্নায় ভেঙে পড়ল মা। 'কুয়ো লাগবে না আমার! আর আমি তোমাকে নামতে দেব না ওর ভিতর!'

জ্ঞান ফিরে পেয়ে কিছুটা ধাতস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন মিস্টার স্কট। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, 'মোমবাতির ব্যাপারটা ঠিকই বলেছিলে তুমি, ইঙ্গলস্। আমি ভেবেছিলাম এসব নেহায়েতই ফালতু সময় নষ্ট। এবার নিজের ভুলটা বুঝতে পারলাম।'

'হ্যাঁ। যেখানে বাতি নিভে যায়, আমি জানি আমিও নিভে যাব। সাবধানের মার নেই। যাক, সব ভাল যার শেষ ভাল।'

সেদিনটা কাজ বন্ধ থাকল। বিকেলের দিকে ছোট্ট এক পোঁটলা বারুদ নীচে নামিয়ে দিয়ে ডিনামাইট ফাটানোর মত করে ফাটাল বাবা। 'নীচের গ্যাস বেরিয়ে যাবে,' বলল বাবা। এবার মোমবাতি জ্বেলে নীচে নামিয়ে দেখা গেল, কোনও অসুবিধে নেই আর, জ্বলছে মোমবাতি।

এরপর থেকে নীচে নামবার আগে আগুন জ্বেলে পরীক্ষা করে নেওয়ার কথা আর বলতে হয়নি মিস্টার স্কটকে। দ্রুত এগিয়ে চলল কাজ। শেষ দুদিন শুধু কাদা উঠল। তারপর একদিন কুয়োর গভীর থেকে ভেসে এল বাবার গলা। 'জল্‌দি! জল্‌দি টেনে তোলো, স্কট্‌স্! চোরাবালি!'

দৌড়ে কুয়োর ধারে এসে দাঁড়াল লরা। পাগলের মত চরকি-কলের হাতল ঘোরাচ্ছেন মিস্টার স্কট। নীচ থেকে কেমন যেন কল্-কল্ শব্দ ভেসে আসছে।

বাবা উপরে উঠে খানিকক্ষণ হাঁপিয়ে নিল, তারপর বলল, 'যেই না শেষ কোপ দিয়েছি হাতল পর্যন্ত ঢুকে গেল কোদালটা মাটির ভিতর। ব্যস্, গলগল করে উঠে আসতে শুরু করল পানি।'

প্রায় বাবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে এল পানি। টলটল করছে এখন পানি ভরা কুয়ো।

কয়েক দিনের মধ্যেই পুরু কাঠের তক্তা দিয়ে ঢেকে দিল বাবা গর্তটা। মাঝে শুধু চারকোনা একটা ঢাকনি, সেটা সরিয়ে পানি তুলবে বড়রা। ছোটদের কুয়োর ধারে যাওয়া বারণ।

নয়

টেক্সাস থেকে একপাল গরু এসে হাজির, উত্তরের ফোর্ট ডজে চলেছে।

এক সকালে কোমরে পিস্তল ঝুলানো দুই কাউবয় এল ঘোড়ায় চেপে, মাথায় চওড়া কার্নিসের হ্যাট, গলায় রুমাল বাঁধা। বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে বিদায় নিয়ে চলে গেল ওরা।

'এক চাকা গরুর গোস্ত হলে কেমন হয়, ক্যারোলিন?' জিজ্ঞেস করল বাবা।

'গরুর গোস্ত! কোথায়?' চকচক করে উঠল মায়ের চোখ। 'দারুণ হয়!'

'ওরা জানতে এসেছিল গরুগুলোকে গিরিসঙ্কট আর খাঁড়ির ধারের খাড়া ঢাল থেকে খেদিয়ে দূরে রাখার ব্যাপারে সাহায্য করব কি না। বললাম, করতে পারি; কিন্তু বিনিময়ে পয়সা নেব না, ইচ্ছে করলে কিছুটা মাংস দিতে পারো।'

গলায় বড়সড় একটা রুমাল বেঁধে প্যাটির পিঠে চেপে ইন্ডিয়ান ট্রেইল ধরে চলে গেল বাবা। সারাদিন দেখা নেই আর। লরা বুঝতে পারল গরুর পাল বেশ কাছে এসে গেছে। আবছাভাবে কানে আসছে হাম্বাধ্বনি। দুপুরের দিকে ধুলো উড়তে দেখেছে ও দিগন্তে।

সন্ধ্যায় ফিরল বাবা, ধুলোয় ধূসরিত। দাড়ি, চুল, চোখের পাপড়ি কোথাও বাদ নেই। মাংস আনেনি, গরুর পাল খাঁড়ি পার হয়ে গেলে তখন পাবে। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে পালটা, ঘাস খেতে খেতে। মোটাসোটা হওয়ার জন্য প্রচুর ঘাস খেতে হয় ওদেরকে, যাতে শহরের মানুষ মজা করে খেতে পারে ওদের।

রাতে গরুগুলোর হাম্বাধ্বনি বন্ধ হলো। গান গাইছে কাউবয়রা। নিঃসঙ্গ মানুষের বিলাপের মত শোনাচ্ছে দূর থেকে, অনেকটা নেকড়ের ডাকের মত, শুনলে গলাটা কেমন যেন ধরে আসে।

সন্ধ্যার দিকে দেখা গেল একটা গরুকে তাড়িয়ে এদিকে নিয়ে আসছে তিনজন ঘোড়সওয়ার। প্যাটির পিঠে বসা বাবাকে চেনা গেল। কাছে আসতে

দেখতে পেল লরা, গরুটার সঙ্গে ছোট্ট একটা বাছুরও আছে।

গরুটার মস্ত দুই শিঙে রশি বেঁধে দুদিক থেকে টেনে আনছে দুজন কাউবয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আসছে গরুটা, মাঝেমাঝে টুঁশ দেওয়ার জন্য তাড়া করছে রাইডারদের। একজনকে তাড়া করলে অপরজনের ঘোড়া ওকে টেনে রাখছে।

আস্তাবলের সঙ্গে গরুটাকে বেঁধে ফেলল বাবা, শিং থেকে রশি খুলে নিল কাউবয় দুজন, বিদায় নিয়ে চলে গেল।

মা বিশ্বাস করতে পারছে না, মাংস আনতে গিয়ে আস্ত গরু নিয়ে ফিরেছে বাবা। কিন্তু বাবা বলল, 'গরুটা বাচ্চা দিয়ে বেঁচে গেল। বাছুরটা এত দূরের পথ হাঁটতে পারবে না, আর গরুটা বেচেও ভাল দাম পাওয়া যাবে না; তাই কাউবয়রা ওটা দিয়ে দিয়েছে আমাকে। এ ছাড়া মস্ত এক চাকা মাংসও দিয়েছে।'

সবাই খুশি গরু পেয়ে। বাবা বলল, 'একটা বালতি দাও, ক্যারোলিন। দেখি কেমন দুধ।'

বালতি নিয়ে টুপিটা পিছনে ঠেলে দিয়ে দুধ দোয়াতে বসল বাবা। গরুটা ঘাড় কাত করে দেখল, তারপর এক লাথিতে চিৎ করে ফেলে দিল বাবাকে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বাবা, রাগে জ্বলছে চোখ। 'দাঁড়া! দেখ্, তোকে শায়েস্তা করি কী ভাবে!'

মোটা দেখে দুটো ওকের খুঁটির এক মাথা চোখা করল বাবা কুঠার দিয়ে। তারপর গরুটাকে ঠেলে আস্তাবলের গায়ে সাঁটিয়ে খুঁটি দুটো পুঁতল মাটিতে। এবার দুটো লম্বা কাঠের একমাথা বাঁধল খুঁটি দুটোর সঙ্গে, অপর মাথা ঢুকিয়ে দিল আস্তাবলের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে। এবার আর নড়বার উপায় থাকল না ওর। সামনে, পেছনে বা পাশে কোনদিকে নড়তে পারছে না দেখে লম্বা করে ডাক ছেড়ে আপত্তি জানাল ওটা।

এবার খানিকটা দুধ দুইয়ে ফেলল বাবা। বলল, 'একেবারে বুনো তো, একটু সময় নেবে, কিন্তু পোষ ঠিকই মানবে।'

সত্যিই, অল্প কয়েকদিনেই পোষ মেনে নিল গরুটা।

একদিন বাবার সঙ্গে ইন্ডিয়ানদের শূন্য ক্যাম্পে গিয়ে অনেকগুলো রঙিন মোতি কুড়িয়ে আনল লরা আর মেরি।

কালো জাম যখন পাকল, মা'র সঙ্গে গিয়ে খাঁড়িতে নেমে থোকা থোকা জাম পেড়ে আনল লরা গাছ থেকে। হাত বাড়ালেই ঝাঁকে ঝাঁকে মশা ওড়ে জামের থোকা থেকে। এতক্ষণ জামের রস খাচ্ছিল; মা আর লরাকে পেয়ে খুশি মনে সুঁই ফুটাল ওদের গায়ে।

লরার আঙুল আর জিভ বেগুনী হয়ে গেছে জামের রস লেগে। মুখ, হাত আর পায়ে অসংখ্য মশার কামড়ের দাগ। পর পর কয়েকদিন বালতি ভরে ভরে কালো জাম নিয়ে ফিরল ওরা ঘরে, মা সেগুলো শুকাতে দিল রোদে, আগামী শীতে সেদ্ধ কালোজাম খাবে ওরা।

মেরি ক্যারিকে রাখে, কালোজাম পাড়তে যায় না। কিন্তু মশার কামড় থেকে

সে-ও রেহাই পেল না। দিনে বাড়িতে তেমন মশা নেই, কিন্তু রাত হলেই, আর বিশেষ করে যেদিন বাতাসের তেমন জোর থাকে না সেদিন ঝাঁকে ঝাঁকে মশা উঠে আসে খাঁড়ি থেকে। ভেজা ঘাস পুড়িয়ে ধোঁয়া দিয়েও ওদের তাড়ানো যায় না বাড়ি বা আস্তাবল থেকে।

মশার জ্বালাতনে রাতে বেহালা বাজানো ছেড়ে দিয়েছে বাবা। সাপারের পর প্রায়ই আসত মিস্টার এডওয়ার্ডস, সে-ও ছেড়ে দিয়েছে আসা; মশাগুলো নাকি খাঁড়ি পেরোতে দিতে চায় না, টেনে রেখে দিতে চায় ওখানেই। রাত ভর লেজ নাড়ে আর পা ঝাড়া দেয় পেট, প্যাটি, বানি, গরু আর বাছুর। সকালে দেখা যায় মশার কামড়ে ঘামাচির মত দাগ হয়ে গেছে লরার কপাল জুড়ে।

'বেশিদিন থাকবে না মশার প্রকোপ,' সান্ত্বনা দেয় বাবা। 'হেমন্তে ঠাণ্ডা বাতাস ছাড়লেই মারা পড়বে সব।'

কিছুদিনের মধ্যে জ্বরে পড়ল ওরা। প্রথমে লরা আর মেরি। রোদে দাঁড়ালেও শীতে কেঁপে কেঁপে ওঠে শরীর, দাঁতে দাঁত বাড়ি লাগে খটাখট। বাবাকে ডাকল মা ওদের কী হয়েছে দেখবার জন্য।

'আমার নিজেরও ভাল লাগছে না শরীরটা। একবার গরম লাগে, তারপরই আবার প্রচণ্ড শীত লেগে ওঠে। তোমাদেরও কি ওই একই অবস্থা? হাড় পর্যন্ত ব্যথা?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'যাও, বিছানায় শুয়ে পড়ো। কয়েকদিনেই সেরে যাবে।'

কয়েকটা দিন কাটল ঘোরের মধ্যে। প্রবল জ্বরে বিকার বকছে মেরি। পানি খেতে গিয়ে বাবার হাতের কাপটাকে থর-থর করে কাঁপতে দেখল লরা। বাবা শুয়ে পড়তে বলছে মাকে। মা বলছে, 'না। তুমি আমার চেয়ে বেশি অসুস্থ।' সবই যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে ঘটছে। একবার চোখ মেলতেই দেখছে কড়া রোদ, আবার যখন মেলছে তখন ঘোর অন্ধকার। পাশে শুয়ে কাতরাচ্ছে মেরি, পানি চাইছে।

লরা দেখল, বড় খাটের পাশে মেঝেতে শুয়ে রয়েছে বাবা। জ্যাক 'কুঁই কুঁই' শব্দ করছে, আর বাবার জামার আস্তীন কামড় দিয়ে ধরে টানছে। উঠে বসবার চেষ্টা করল বাবা, কিন্তু পারল না, শুয়ে পড়ল আবার।

লরাও ওঠবার চেষ্টা করে দেখল, পারল না। ক্লান্তিতে অবসন্ন শরীর। দেখল বড় খাটের কিনারে শুয়ে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে মা। পাশেই শুয়ে পানির জন্য কাতরাচ্ছে মেরি, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে ওর। অস্ফুট কণ্ঠে মা বলল, 'পারবে তুমি, লরা?'

'হ্যাঁ, মা, পারব,' বলল লরা। এবার জোর খাটাতেই উঠে বসতে পারল। কিন্তু দাঁড়াতে গিয়ে দেখল দুলে উঠল মেঝেটা, পড়ে গেল ও। ছুটে এল জ্যাক, ওর গাল চেটে ওকে সুস্থ করে তুলতে চাইছে, কাঁদছে গলার ভিতর বিচিত্র শব্দ করে।

হামাগুড়ি দিয়ে এগোল লরা, কোনমতে খানিকটা পানি নিয়ে ফিরে আসতে পারল বিছানার পাশে। দুই হাতে পাত্রটা ধরে ঢক্-ঢক্ করে খেয়ে নিল মেরি পানিটুকু। লেপের নীচে ঢুকে পড়ল লরা জলদি করে, কারণ আবার শীত করতে

শুরু করেছে।

হঠাৎ একসময় চোখ মেলে দেখল লরা, কালো একটা মুখ ঝুঁকে পড়ে দেখছে ওকে। হাসি ফুটল মুখটায়, ঝক্‌ঝকে দাঁত দেখা যাচ্ছে এখন। বলল, 'টুক্ করে খেয়ে নাও দেখি এটুকু। এই তো, ছোট্ট, লক্ষ্মী মেয়ে!'

ওর কাঁধের নীচে একটা হাত দিয়ে ওকে উঁচু করল কালো লোকটা, মুখের কাছে ধরল একটা কাপ। একটু মুখে যেতেই এমন তেতো লাগল যে মাথাটা সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল লরা, কিন্তু কাপটাও সরে আসছে। শান্ত, ভারী একটা কণ্ঠস্বর বলল, 'গিলে ফেলো, খুকি, ওষুধ।' উপায়ান্তর না দেখে গিলে নিল লরা ওষুধটুকু।

আবার যখন চোখ মেলল, দেখল মোটাসোটা এক মহিলা আগুন ধরাচ্ছে চুলোয়। কালো না, মায়ের মত গায়ের রঙ।

'একটু পানি, প্লীজ!' বলল লরা।

মোটা মহিলা পানি নিয়ে এলেন। ঠাণ্ডা পানি খেয়ে লরার মনে হলো অনেকটা সুস্থ হয়ে গেছে। মেরি, মা, বাবা সবাই ঘুমিয়ে। লরা জিজ্ঞেস করল মহিলাকে, 'আপনি কে?'

'আমি মিসেস স্কট,' মৃদু হেসে বললেন মহিলা। 'কিছুটা ভাল লাগছে না এখন?'

'হ্যাঁ। আপনাকে ধন্যবাদ,' বলল লরা সবিনয়ে।

এক কাপ চিকেন সুপ ধরলেন মহিলা লরার মুখের সামনে। 'ভাল মেয়ের মত এটুকু খেয়ে নাও, গায়ে জোর পাবে। গুড! এবার ঘুমিয়ে পড়ো। কোনও চিন্তা নেই, তোমরা সবাই সেরে না ওঠা পর্যন্ত আমি থাকছি এখানেই।'

সকালে উঠে শরীরটা অনেক ঝরঝরে লাগল লরার, কিন্তু মিসেস স্কট ওকে উঠতে দিলেন না। বললেন, আগে ডাক্তার এসে দেখুন, তারপর ওঠা যাবে। শুয়ে শুয়ে লরা দেখল ঘরবাড়ি গোছগাছ করছেন মিসেস স্কট, তারপর ওষুধ খাওয়ালেন বাবা, মা আর মেরিকে। এবার লরার পালা। ছোট্ট একটা কাগজের পুরিয়া খুলে ভিতরের ভয়ঙ্কর তেতো পাউডার ঢাললেন তিনি লরার হাঁ করা মুখে, তারপর হাতে ধরিয়ে দিলেন এক গ্লাস পানি।

একটু পরেই এলেন ডাক্তার। অসম্ভব কালো ডাক্তার ট্যান, কিন্তু ঝকঝকে হাসিটা চমৎকার। বাবা-মার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলেই বেরিয়ে গেলেন ব্যস্ত পায়ে।

মিসেস স্কট বললেন ক্রীকের দুই ধারে যত সেটলার বাড়ি করেছে, সব কজন জ্বরে পড়েছে। যত্ন নেওয়ার লোক নেই, তাই তিনিই একের পর এক বাড়িতে গিয়ে সাধ্য মত যা করবার করছেন।

'তবে আপনাদের ব্যাপারটা অসাধারণ; সব কজন একই সঙ্গে শয্যাশায়ী। ডা. ট্যান যদি হঠাৎ এদিকে না আসতেন তা হলে আপনারা কেউ বাঁচতেন কি না সন্দেহ।'

ইন্ডিয়ানদের চিকিৎসা করেন ডা. ট্যান। এই বাড়ির পাশ দিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্স শহরে যাচ্ছিলেন, অবাক ব্যাপার, যে জ্যাক অপরিচিত মানুষকে সহ্য করতে পারে

না, বাবা-মা না বললে বাড়ির কাছে আসতে দেয় না–সেই জ্যাকই এগিয়ে গিয়ে সাধাসাধি করে ডেকে এনেছে ডা. ট্যানকে। তিনি এসে আধ-মরা অবস্থায় পান বাড়ির সবাইকে। একদিন একরাত ছিলেন তিনি এখানে; তারপর মিসেস স্কট এসে ছুটি দিয়েছেন তাঁকে। এখন চরকির মত ঘুরছেন তিনি এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি, ওষুধ দিচ্ছেন।

পরদিন বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল বাবা। তার পরদিন লরা। তারপর মা আর মেরি। শুকিয়ে হাড়সর্বস্ব হয়ে গেছে সবাই, দুর্বল, কিন্তু সামলে উঠছে দ্রুত। কাজেই বিদায় নিলেন মিসেস স্কট।

মা ধন্যবাদ দেওয়ার চেষ্টা করতে মিসেস স্কট বললেন, 'ওমা, ধন্যবাদ আবার কীসের? দরকারে কাজে লাগতে না পারলে আর প্রতিবেশী কীসের?'

আরও বেশ কিছুদিন তেতো ওষুধ খেতে হলো ওদের। গায়ে তেমন জোর নেই, তাই ঘরে বসে মার জন্য চমৎকার একটা রকিং-চেয়ার বানিয়ে ফেলল বাবা। খুশিতে চোখ দিয়ে পানি এসে গেল মা'র।

দশ

শীত এসে পড়ছে। ঠাণ্ডা বাতাস হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়।

এদিকটা গোছগাছ করে রেখে বাবা গেল ইন্ডিপেন্ডেন্স শহরে কিছু কেনা-কাটা করতে। পাঁচ-ছ'দিন লাগবে ফিরতে। সেই কদিন প্রতিবেশী মিস্টার এড্ওয়ার্ডস্ এসে বানিকে খাইয়ে আর গরুর দুধ দুইয়ে দিয়ে গেলেন।

তাঁর কাছেই জানা গেল ইন্ডিয়ানরা ফিরে এসেছে ওদের গ্রামে। এখন সাবধানে থাকা দরকার। জ্যাককে ঘরের ভিতর রাখা উচিত। আর বাবার রেখে যাওয়া পিস্তলটা লোড করে রাখা উচিত বালিশের পাশে।

মিসেস স্কটও বেড়াতে এসে বিপদের আভাস দিয়ে গেলেন। মিস্টার স্কট নাকি কোথায় শুনে এসেছেন, ঝামেলা পাকাবে ইন্ডিয়ানরা। 'ব্যাটারা চাষ-আবাদ করবে না, বুনো পশু-পাখির মত ঘুরে বেড়াবে দেশময়–তার পরেও দেশ নাকি ওদের! আরে বাবা, যে ফসল ফলাবে জমি তো তারই হওয়া উচিত। অন্তত আমার বিবেকে তো তাই বলে।'

অস্থির হয়ে আছে জ্যাক। বাবা চলে যাওয়ায় যেন গোটা পরিবারের দায়িত্ব পড়েছে ওরই কাঁধে। একবার বাইরে যায়, আস্তাবলে গিয়ে দেখে গরু-ঘোড়া সব ঠিক আছে কি না, তারপর বাড়িটার চারপাশে এক চক্কর দিয়ে ঘরে এসে দেখে এখানেও সহি-সালামতে আছে কিনা সবাই। ইন্ডিয়ানদের উপস্থিতি স্পষ্ট টের পাচ্ছে ও, তাই খুবই দুশ্চিন্তায় আছে।

বাবার জন্য অপেক্ষা করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছে লরা আর মেরি। শেষ দিনটা আর কাটতেই চায় না। সারাটা দিন একটু পর পর খাঁড়ির ধারের পথের

দিকে চেয়েছে, সন্ধ্যায় মা দরজা লাগিয়ে দেওয়ায় জানালা দিয়ে তাকিয়ে থেকেছে, কিন্তু আসেনি বাবা। মার অনুমতি নিয়ে রাত জেগে একটা বেঞ্চে বসে কাটিয়েছে অনেকক্ষণ, হাই তুলেছে, তবু আসেনি বাবা। তারপর যখন ঘুমের ঘোরে হুড়মুড় করে পড়েছে মেঝেতে, তখন মা তুলে নিয়ে শুইয়ে দিয়েছে বিছানায়।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেতেই দেখল লরা এসে পড়েছে বাবা। সে কী আনন্দ! লাফিয়ে এসে কোলে চড়েছে। বাবা বাড়িতে থাকলে বুকটা ভরা থাকে ওর। বাবা না থাকলে সব ফাঁকা।

মা'র তালিকা মত সবই এনেছে বাবা শহর থেকে—সাদা চিনি, কর্নমীল, চর্বিদার মাংস, লবণ, পেরেক, তামাক, কিছুই বাদ পড়েনি। সেই সঙ্গে জানালার জন্য আট টুকরো কাঁচ। এখন থেকে শীতকালেও ঘরের ভিতর আলো পাবে ওরা—দরজা-জানালা বন্ধ করবার পরেও।

কয়েকদিন প্রবল ঝড়-বৃষ্টির পর আবার সূর্যের মুখ দেখা গেল। বাড়ির পাশের সরু ট্রেইল ধরে ঘোড়ায় চড়ে আসছে-যাচ্ছে ইন্ডিয়ানরা, কিন্তু একবারও তাকাচ্ছে না এদিকে, যেন এ-বাড়িটার কোনও অস্তিত্বই নেই।

'ভেবেছিলাম এটা ওদের প্রাচীন কোনও ট্রেইল, ব্যবহার হয় না এখন আর,' বলল বাবা। 'আগে জানলে ওদের হাই-রোডের পাশে এ-বাড়ি বানাতাম না আমি।'

ইন্ডিয়ানদের পছন্দ করে না জ্যাক, দেখলেই ঘেউ-ঘেউ করে। 'ওকে আর কী দোষ দেব,' বলল মা, 'ইদানীং এত বেড়েছে যে চোখ তুললেই দেখা যায় একটা না একটা।' কথাটা বলে চোখ তুলেই দেখতে পেল মা, ঠিক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন দীর্ঘদেহী ইন্ডিয়ান।

'সর্বনাশ!' আঁৎকে উঠল মা।

কোনও আওয়াজ না করে লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল জ্যাক। ঠিক সময় মত খপ্ করে ওর কলার ধরে টেনে সরিয়ে আনল বাবা। নড়ল তো না-ই চোখের পাপড়ি পর্যন্ত ফেলল না ইন্ডিয়ানটা। যেন কুকুরটার অস্তিত্বই নেই।

'হাউ!' বলল লোকটা বাবাকে।

জ্যাককে খাটের পায়ার সঙ্গে বাঁধতে বাঁধতে বাবাও বলল, 'হাউ!'

ঘরের ভিতর এসে চুলোর ধারে মেঝের উপর বসে পড়ল ইন্ডিয়ান লোকটা। বাবাও এসে তার পাশে বসল মেঝেতে, মাকে ডিনার তৈরি করতে বলল।

যতক্ষণ মা'র রান্না শেষ না হলো, চুপচাপ বসে রইল দুজন।

দুটো টিনের প্লেটে খাবার বেড়ে এগিয়ে দিল মা। চুপচাপ খেয়ে নিল দুজন। খাওয়ার পর তামাক এগিয়ে দিল বাবা, দুজনেই পাইপে তামাক ঠেসে ধোঁয়া টানল চুপচাপ।

তামাক খাওয়ার পর কী যেন বলল লোকটা বাবাকে। বাবা মাথা নেড়ে বলল, 'নো স্পীক।'

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল ইন্ডিয়ানটা, তারপর উঠে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

'বাপরে-বাপ!' বলল মা।

একছুটে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল মেরি আর লরা। দেখা গেল ঘোড়ায় চেপে চলে যাচ্ছে লম্বা লোকটা, রাইফেলটা দুই উরুর উপর আড়াআড়ি ভাবে রাখা।

বাবা বলল লোকটা সাধারণ কেউ নয়, ওসেজদের নেতা গোছের কেউ হবে। মাথায় বাঁধা রঙিন ফিতে দেখলে আন্দাজ করা যায়।

'মনে হলো, ফ্রেঞ্চ বলছিল লোকটা,' মাথা নাড়ল বাবা, 'ইশ্‌শ্‌! যদি কিছুটা শিখে রাখতাম সময় থাকতে!'

'ওরা আমাদের না ঘাঁটিয়ে নিজেদের মত থাকতে পারে না?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল মা।

'এই লোকটা তো দেখলাম বেশ ভদ্র ব্যবহার করল,' বলল বাবা। 'তুমি ভেবো না। আমরা ওদের বিরক্ত না করলে, আর জ্যাককে সামলে রাখতে পারলে ওরাও আমাদের বিরক্ত করবে না। কোনও গোলমাল বাধবে না।'

কিন্তু ঠিক পরদিন সকালেই ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল বাবা সেই লম্বা ইন্ডিয়ান ঘোড়সওয়ারের পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক। দ্রুতপায়ে এগোল বাবা। বাবাকে দেখে রাইফেল তাক করল লোকটা জ্যাকের দিকে। একছুটে এগিয়ে গিয়ে জ্যাকের কলার ধরে টান দিয়ে ওকে সরিয়ে আনল বাবা ট্রেইলের উপর থেকে। নিজের পথে চলে গেল ইন্ডিয়ান।

'আর একটু দেরি হলেই গেছিল!' বলে জ্যাককে সব সময় চেইন দিয়ে বেঁধে রাখবার ব্যবস্থা করল বাবা।

শিকল দিয়ে বেঁধে রাখায় খুবই ক্ষিপ্ত হলো, অনেক আপত্তি জানাল জ্যাক, কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। জ্যাকের ধারণা রাস্তাটা ওর মনিবের, আর কারও চলবার অধিকার নেই ওই ট্রেইলে।

ঘাসগুলো হলদেটে হয়ে আসছে। বাতাসের জোর বাড়ছে–কান পাতলে মনে হয় করুণ বিলাপ। যেন জেনে গেছে, যা চায় কোনওদিন তা পাবে না খুঁজে। বাড়ছে ঠাণ্ডা। এই সময়েই গোটা শীতের জন্য মাংস সংগ্রহ করতে হবে। রোজ শিকারে বেরোচ্ছে বাবা, মেরে আনছে হরিণ, খরগোশ আর জংলী মোরগ। ফাঁদ পেতে রাখছে খাঁড়ির নীচে, ভোঁদড়, মাস্করাট আর মিঙ্ক, এমন কী নেকড়ে আর শেয়ালও মারছে–চামড়া ছড়িয়ে ঝুলিয়ে রাখছে বাড়ির বাইরে। চামড়াগুলো শুকিয়ে গেলে গোল করে মুড়িয়ে রেখে দিচ্ছে আরগুলোর সঙ্গে, শহরে বিক্রি হবে এই চামড়া।

বাবা শিকারে বেরিয়ে যেতেই একদিন দুজন ইন্ডিয়ান এসে ঢুকল বাড়িতে, যেন বাড়িটা ওদেরই। একজন মা'র কাবার্ড থেকে কর্নব্রেড যা পেল তুলে নিল; অন্যজন নিল বাবার টোবাকোর ব্যাগ। তারপর চট্ করে তুলে নিল বাবার এতদিনকার জমানো চামড়ার বান্ডিল।

সবার চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জিনিসগুলো, কিন্তু কিচ্ছু বলবার উপায় নেই।

দরজার কাছে গিয়ে একজন কর্কশ গলায় কী যেন বলল অপরজনকে। সে-ও

জবাব দিল একই সুরে। তারপর ধুপ করে চামড়ার বান্ডিলটা ফেলে দিয়ে শুধু কর্নব্রেড আর তামাক নিয়ে চলে গেল ওরা।

'যাক,' হাঁপ ছেড়ে বলল মা, 'লাঙল আর বীজগুলো ফেলে গেছে!'

'কোথায় লাঙল?' জিজ্ঞেস করল লরা।

'ওগুলো বেচেই কেনা হবে আগামী বসন্তে,' উত্তর দিল মা।

বাবা ফিরে এসে সব শুনে চুপ করে থাকল অনেকক্ষণ, তারপর বলল, 'তেমন কোনও অঘটন ঘটেনি, তাই রক্ষা।'

'এদের হাত থেকে বাঁচা যাবে কবে? এভাবে তো আর পারা যায় না, চার্লস!'

'শীঘ্রিই, ক্যারোলিন, শীঘ্রিই,' সান্ত্বনা দিল বাবা। 'এদেরকে সরকার সরে যেতে বলবে আরও পশ্চিমে। দেখছ না, সাদা মানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে শুরু করেছে, বসতি করছে চারদিকে। আর খুব বেশি দেরি নেই।'

এগারো

দেখতে দেখতে এসে পড়ল বড়দিন।

কিন্তু তুষারের দেখা নেই। তুষার ছাড়া সান্তা ক্লজের হরিণ আসবে কী করে এই নিয়ে মহা দুশ্চিন্তা মেরি আর লরার। ঝর-ঝর, ঝর-ঝর বৃষ্টিই পড়ে চলেছে শুধু, তুষারের কোন দেখা নেই। ক্রিসমাসের বাকি আর মাত্র একদিন।

দুপুরের দিকে থামল বৃষ্টি, নীল আকাশ দেখা গেল মেঘের ফাঁকে ফাঁকে, রোদও উঠল। মা দরজা খুলে দেওয়ায় তাজা, ঠাণ্ডা বাতাস এল বাড়ির ভিতর। লরা আর মেরি শুনতে পেল খাঁড়ির ভিতর গর্জন তুলে ছুটছে পানি। তা হলে সান্তা ক্লজ আসবে কী করে? হাল ছেড়ে দিল ওরা, এই তীব্র স্রোতের মধ্যে খাল পেরিয়ে আসতে পারবে না সান্তা ক্লজ।

মস্ত এক টার্কি নিয়ে ফিরল বাবা–কম করেও বিশ পাউন্ড হবে ওজন। ক্রিসমাস ডিনার হবে ওটা দিয়ে, লরাকে জিজ্ঞেস করল বাবা ওর বিশাল রানের মাংস একা খেতে পারবে কি না। লরা মনে মনে ভাবছে সান্তা ক্লজই আসতে পারছে না–টার্কির মাংস খেয়ে কী হবে! মেরি জিজ্ঞেস করল বাবাকে খাঁড়ির পানি কমছে কি না, বাবা বলল আরও বাড়ছে।

বড়দিনে মিস্টার এডওয়ার্ডস্‌কে খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। মা দুঃখ করল, বেচারা একা মানুষ–কী রাঁধবে কী খাবে কে জানে! অথচ এই প্রচণ্ড স্রোতের মধ্যে খাঁড়ি পেরোবার ঝুঁকি নেওয়া ঠিকও নয়।

'নাহ্, সম্ভব নয়,' বলল বাবা। 'ধরে নাও, এডওয়ার্ডস্ কাল আসছে না।'

লরা আর মেরি বুঝে নিল–সান্তা ক্লজও আসতে পারছে না।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর মা বলল, 'তবুও দুটো মোজা ঝুলিয়ে রাখি, কী বলো তোমরা? বলা তো যায় না! সারা বছর এত ভাল হয়ে চললে তোমরা, সে

খবর কি পৌঁছায়নি সান্তা ক্লজের কাছে?' চুলোর উপরের শেল্‌ফ্‌ থেকে দুজনের দুটো মোজা ঝুলিয়ে দিল মা। 'এবার ঘুমিয়ে পড়ো।'

ঘুম ভেঙেই শুনতে পেল লরা, তর্জন-গর্জন করছে জ্যাক। পরমুহূর্তে জোরাল কণ্ঠের ডাক শোনা গেল, 'ইঙ্গল্‌স্‌! ইঙ্গল্‌স্‌!'

দরজা খুলে দিতেই লরা দেখল ভোর হয়ে গেছে।

'আরে! ভেতরে এসো, ভেতরে এসো,' ডাকল বাবা। 'ব্যাপার কী, এত সকালে! খাল পেরোলে কী করে?'

লরা চেয়ে দেখল মোজা দুটো তেমনি ঝুলছে, কিছুই ভরে দেয়নি ওগুলোতে সান্তা ক্লজ। চট্‌ করে চোখ বন্ধ করল, পাছে কেউ দেখে ফেলে ওকে মোজার দিকে তাকাতে। চোখ বুজে শুনল বাবার প্রশ্নের উত্তরে মিস্টার এডওয়ার্ডস্‌ বলছেন: জামা-কাপড় সব খুলে পোঁটলা বানিয়ে মাথায় তুলেছেন, তারপর সাঁতার কেটে পেরিয়ে এসেছেন খাল। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাওয়ার শব্দ শুনতে পেল লরা। চোখ সামান্য খুলে দেখতে পেল ঠক্‌-ঠক্‌ করে কাঁপছেন মিস্টার এডওয়ার্ডস্‌, কাঁপা গলায় বলছেন: এখুনি, একটু গরম পেলেই ঠিক হয়ে যাবে।

'মস্ত ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছ, এডওয়ার্ডস্‌,' বলল বাবা। 'তুমি আসায় আমরা সবাই খুশি, কিন্তু ক্রিসমাস-ডিনারের জন্যে এত বড় ঝুঁকি নেয়া...'

'ডিনারের জন্যে না, ইঙ্গল্‌স্‌। তোমার পিচ্চিদের জন্যে। ইন্ডিপেন্ডেন্স থেকে উপহার নিয়ে আসতে পারলাম, আর সামান্য এই খাল আমাকে আটকে রাখতে পারবে?'

একলাফে বিছানায় উঠে বসল লরা, 'সান্তা ক্লজের সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার?'

'নিশ্চয়ই!' জবাব দিলেন মিস্টার এডওয়ার্ডস্‌, 'তবে আর বলছি কী!'

'কোথায়? কখন? কেমন দেখতে উনি? কী বললেন? সত্যিই উনি আমাদের জন্যে কিছু পাঠিয়েছেন?' মেরি ও লরার সম্মিলিত প্রশ্ন।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও—এক মিনিট!' উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন মিস্টার এডওয়ার্ডস।

মা বলল, সান্তা ক্লজের পাঠানো উপহার এখন যার যার মোজায় ভরা হবে, কাজেই ওরা কেউ যেন ওদিকে না তাকায়।

ওদের বিছানার পাশে মেঝেতে বসে একে একে ওদের সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন মিস্টার এডওয়ার্ডস্‌। ওদিকে মা কী করছে দেখবার ইচ্ছে সত্ত্বেও চোখ তুলল না ওরা কেউ।

মিস্টার এডওয়ার্ড বললেন, খাঁড়ির পানি বাড়তে দেখে উনি বুঝে ফেললেন, এই স্রোত ঠেলে সান্তা ক্লজের পক্ষে ওপারে যাওয়া সম্ভব নয়।

'কিন্তু আপনি তো আসতে পেরেছেন,' লরার জিজ্ঞাসা।

'হ্যাঁ। কিন্তু উনি তো মোটাসোটা বুড়ো ভদ্রলোক। টেনেসির বুনো বেড়াল যা পারে, একজন বিশিষ্ট বয়স্ক ভদ্রলোকের পক্ষে কি তা সম্ভব?' মাথা নাড়লেন। 'আমি ভেবে চিন্তে দেখলাম, এই খাঁড়ি পার হওয়া যাবে না বুঝতে পেরে নিশ্চয়ই ইন্ডিপেন্ডেন্সের দক্ষিণে আর উনি আসবেনই না। কেন উনি প্রেয়ারির মধ্যে দিয়ে চল্লিশ মাইল খামোকা এসে ফেরত যাবেন?'

কাজেই উনি হাঁটতে শুরু করলেন ইন্ডিপেন্ডেন্সের দিকে।

'বৃষ্টির মধ্যে?'

'রেইন কোট পরে নিয়েছিলাম। শহরে পৌঁছে দেখি রাস্তা ধরে এদিকে আসছেন সান্তা ক্লজ।'

'দিনের বেলায়?' লরার ধারণা দিনের বেলা সান্তা ক্লজকে দেখা যায় না।

'কে বলল দিন, তখন তো রাত–দোকানের আলো এসে পড়েছিল রাস্তায়। আমাকে দেখেই বললেন, "এই যে, এডওয়ার্ডস্, কেমন আছ?" '

'উনি চেনেন আপনাকে?' মেরির প্রশ্ন। লরা বলল, 'কী করে বুঝলেন যে উনিই সান্তা ক্লজ?'

'কেন, দাড়ি দেখে। মিসিসিপির পশ্চিমে তাঁর মত এত লম্বা, ঘন আর সাদা দাড়ি আর কারও আছে নাকি? আর উনি আমাকে চিনবেন না···সেই ছোটবেলা থেকেই তো দেখে আসছেন! সবাইকে চেনেন উনি।

'যা বলছিলাম, "এই যে, এডওয়ার্ডস্, কেমন আছ" বলেই বললেন, "টেনেসির একটা ছোট্ট বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলে তুমি যখন শেষবার তোমাকে দেখি।" আমি বললাম, হ্যাঁ লাল একজোড়া সুন্দর দস্তানা দিয়েছিলেন সেবার আপনি আমাকে।'

'আমার যতদূর বিশ্বাস, ভার্ডিগ্রিস নদীর ধারে কাছে কোথাও আছ তুমি এখন। আচ্ছা, ওখানে কাছেপিঠে মেরি আর লরা নামে ছোট্ট দুটো মেয়ে আছে; তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে কখনও?'

'আমি বললাম, বহুবার দেখা হয়েছে, ভাল মত চিনি আমি ওদের। কেন, হঠাৎ ওদের কথা?'

সান্তা ক্লজ বললেন, 'ওদের জন্যে মনটা আমার বড় ভার হয়ে আছে। দুজনেই ওরা যেমন ফুটফুটে সুন্দর, তেমনি মিষ্টি স্বভাবের ভাল মেয়ে। আমি জানি আমার অপেক্ষায় রয়েছে ওরা। কাউকে নিরাশ করতে আমার ভাল লাগে না, কিন্তু কী করব বলো, এমন বেড়ে গেছে ওখানে খাঁড়ির পানি, আমার পক্ষে ওই স্রোত ঠেলে পার হওয়া সম্ভব নয়। এ বছর আর ওদের কেবিনে যাওয়ার উপায় দেখছি না। এডওয়ার্ডস্, এই একটিবারের জন্যে তুমি যদি আমার হয়ে ওদের উপহারগুলো একটু পৌঁছে দিতে···'

'আমি বললাম, আরে, এটা কোনও অনুরোধ করার মত ব্যাপার হলো! খুশি মনে পৌঁছে দেব আমি আপনার উপহার।'

'তখন আমাকে নিয়ে রাস্তার অপর পাশে দাঁড়ানো মস্ত দুটো বস্তা চাপানো ঘোড়াটার কাছে···'

'ওঁর বল্গা-হরিণ কী হলো?' জানতে চাইল লরা।

মেরি বলল, 'তুষার কোথায় যে বল্গা-হরিণ নিয়ে চলাফেরা করবেন?'

'ঠিক বলেছ,' বললেন মিস্টার এডওয়ার্ডস, 'দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘোড়াই ওঁর বাহন। পোঁটলার মুখে বাঁধা দড়ি খুলে ভিতর থেকে খুঁজে-পেতে বের করে দিলেন তোমাদের জন্যে উপহার।'

'কী উপহার?' জানতে চাইল লরা। মেরির প্রশ্ন, 'তারপর কী করলেন উনি?'

'তারপর আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে লাফিয়ে উঠে বসলেন নিজের ঘোড়ায়। লম্বা সাদা দাড়িগুলো গলায় বাঁধা রুমালের নীচে গুঁজে নিয়ে হাত নাড়লেন, "চললাম, এডওয়ার্ডস্!" এই বলে ফোর্ট ডজের দিকে ছুটিয়ে দিলেন ঘোড়া।'

চুপ করে থেকে দৃশ্যটা কল্পনায় দেখছে মেরি আর লরা, এমনি সময় মা বলল, 'এবার তোমরা দেখতে পারো।'

লরার মোজার উপর দিকে কী যেন চকচক করছে। খুশিতে চেঁচিয়ে উঠে ছুটল দুজন চুলোর ধারে। ঝকঝকে নতুন একটা টিনের কাপ!

মেরির মোজা থেকেও বেরোল একই জিনিস আর একটা।

খুশিতে তিড়িং-তিড়িং লাফ দিল লরা উপর-নীচে। মেরি জ্বলজ্বলে চোখে দেখছে ওর কাপ। এখন থেকে নিজেদের আলাদা টিনের কাপে পানি খাবে ওরা।

এরপর আবার হাত ঢুকিয়ে দুজন বের করল দুটো লম্বা চিনির মেঠাই, পেপারমিন্ট দেওয়া; ওগুলোর এক মাথা লাঠির মত করে বাঁকানো।

আরও কী যেন আছে। মোজার ভিতর হাত ঢুকিয়ে হৃদয়-আকৃতির, দুটো কাগজে-মোড়া কেক পেল এবার ওরা। কেকের উপর সাদা চিনির দানা ঝিকমিক করছে, ভিতরে ধবধবে সাদা ময়দা। ছোট্ট করে এক কামড় না দিয়ে পারল না লরা। উফ্, দারুণ!

উপহার পেয়ে এতই খুশি হলো ওরা যে ধরেই নিল খালি হয়ে গেছে মোজা। কিন্তু মা যখন বলল, 'কী, তোমাদের মোজা খালি?' তখন আবার হাত পুরল ওরা মোজার ভিতর। একেবারে তলায় দুজন পেল একটা করে ঝক্‌ঝকে নতুন পেনি।

এত আনন্দ রাখবে কোথায় ওরা? ওদের মনে হলো, এত চমৎকার ক্রিসমাস আর আসেনি কোনদিন। এতই খুশি, যে ইন্ডিপেন্ডেন্স থেকে এত সুন্দর উপহার নিয়ে আসবার জন্য মিস্টার এডওয়ার্ডসকে যে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, সে-কথা মনেই থাকল না ওদের। এমন কী সান্তা ক্লজকেও ভুলে গেছে বেমালুম। একটু পরেই অবশ্য মনে পড়ত, কিন্তু তার আগেই মা বলল, 'তোমরা মিস্টার এডওয়ার্ডস্‌কে ধন্যবাদ জানাবে না?'

'নিশ্চয়ই! অনেক, অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার এডওয়ার্ডস্!' কথাটা অন্তর থেকেই বলল ওরা।

বাবাও হাত মেলাল মিস্টার এডওয়ার্ডসের সঙ্গে।

'আরে! এ কী!' পকেট থেকে মিস্টার এডওয়ার্ডসকে মিষ্টি আলু বের করতে দেখে বলল মা। উনি জবাব দিলেন সাঁতার কাটবার সুবিধে হবে মনে করে মাথার উপর রাখা বোঁচকার ভারসাম্য ঠিক রাখবার জন্য এনেছেন ওগুলো। ভেবেছিলেন মা-বাবা হয়তো পছন্দ করবে এগুলো ক্রিসমাস টার্কির সঙ্গে খেতে।

একে একে নয়টা মিষ্টি আলু বেরোল ওঁর নানান পকেট থেকে। সেই শহর থেকে বয়ে এনেছেন তিনি এগুলো। ধন্যবাদ জানাবার ভাষা হারিয়ে ফেলল বাবা-মা।

বারো

এক রাতে ভয়ঙ্কর এক তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে বিছানায় উঠে বসল লরা। জেগে গেছে বাবা-মাও। মেরি লেপ দিয়ে ঢেকে ফেলেছে মাথা।

'কীসের শব্দ, চার্লস?'

'মেয়ে মানুষের চিৎকার মনে হলো!' লাফিয়ে উঠে জামাকাপড় পরতে লেগে গেল বাবা। 'মনে হলো স্কটদের ওদিক থেকে এল আওয়াজটা।'

'কী হতে পারে?' অস্ফুটে বলল মা।

'হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছে স্কট,' বুট পরতে পরতে বলল বাবা।

'তোমার কী মনে হয়…' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল মা, কিন্তু বাধা দিলেন বাবা।

'না। তোমাকে বহুবার বলেছি, ওরা কোন গোলমাল করবে না। নিজেদের ক্যাম্পে ওরা শান্তিতেই আছে।'

বেরিয়ে গেল বাবা একহাতে বন্দুক, আর একহাতে বাতি নিয়ে। অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল। জোর বাতাস বাইরে। হঠাৎ আবার শোনা গেল সেই মরণ-চিৎকার। মনে হলো কাছেই। আর কিছুক্ষণ পরেই দরজায় শোনা গেল খট্-খট্ আওয়াজ, ডাকছে বাবা। 'ক্যারোলিন! দরজা খোলো, জলদি!'

খুলল মা। ভিতরে ঢুকেই চট্ করে দরজা লাগিয়ে দিল বাবা।

'কী ব্যাপার, চার্লস?'

'প্যানথার!' বলল বাবা।

জানা গেল, মিস্টার স্কটের বাড়ি গিয়ে বাবা দেখে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে সবাই, কোথাও কোনও অসুবিধে নেই। ওদেরকে আর না জাগিয়ে ফিরে আসছিল, এমন সময় আবার সেই চিৎকার। ভয় পেয়ে দৌড়ে ফিরে এসেছে বাবা—রাতের অন্ধকারে প্যানথারের সঙ্গে লাগতে যাওয়া বিপজ্জনক।

'তোমার পিছু পিছু আসেনি ওটা?' জিজ্ঞেস করল লরা।

'আরে! আধ-বোতল সাইডার জেগে রয়েছে দেখছি! কী জানি, আমি ঠিক জানি না। তবে তোমরা দুজন আগামী কয়েকটা দিন ঘরেই থাকবার চেষ্টা কোরো। অন্তত আমি ওটাকে না মারা পর্যন্ত।'

'ওরা কি বাচ্চা মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়?'

'হ্যাঁ। খুব খুশি হয়ে। বাচ্চা মেয়েদের খেতে খুব পছন্দ করে প্যানথার।'

পর পর কয়েকদিন প্যানথারটাকে মারবার চেষ্টা করল বাবা, কিন্তু পারল না। ওটার পায়ের ছাপ দেখা যায় এখানে ওখানে, একটা অ্যান্টিলোপকে মেরে যে খেয়েছে তার চিহ্ন দেখা গেল, কিন্তু বাগে পেল না বাবা ওকে। শেষে একদিন একজন ইন্ডিয়ান আকারে ইঙ্গিতে বাবাকে জানাল যে ওটাকে খুঁজে লাভ

নেই, ও নাকি গুলি করে মেরেছে ওটাকে একদিন আগে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল বাবা।

শীতের শেষে দেখা গেল বুনো রাজহাঁসগুলো ফিরতে শুরু করেছে উত্তরে। পশুদের ছালগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্সে নিয়ে বিক্রির এখনই সময়। এক সকালে পেট আর প্যাটিকে ওয়্যাগনে জুতে নিয়ে চলে গেল বাবা শহরের পথে।

সবার জন্য উপহার আনল বাবা ইন্ডিপেন্ডেন্স থেকে, নিজের জন্য এনেছে একটা লাঙল আর গম, জই, ভুট্টা, বাঁধাকপি, শালগম, গাজর, মটরশুঁটি, আলু আর তরমুজের বীজ। খুশি হয়ে মাকে বলল, 'তুমি দেখে নিয়ো, ক্যারোলিন, এসব জমিতে দারুণ ফলন হবে–ফসল উঠলে রাজার হালে থাকব আমরা এখানে!'

গত কয়েকদিন ধরে খুব চিৎকার-চেঁচামেচি হচ্ছে ইন্ডিয়ানদের ক্যাম্পে। একথা শুনে বাবা বলল সম্ভবত এটা ওদের বার্ষিক সম্মেলনের মত কিছু একটা হবে, ভয়ের তেমন কোন কারণ নেই। কিন্তু বাবার গলায় কেন যেন জোর নেই আগের মত, লক্ষ করল লরা। খানিক চুপ করে থেকে বাবা বলল, 'শহরে গুজব শুনে এলাম, শীঘ্রিই সরকার নাকি সাদা লোকদের তাড়িয়ে দেবে ইন্ডিয়ান এলাকা থেকে। এখানকার ইন্ডিয়ানরা নালিশ জানিয়েছে ওয়াশিংটনে, তাদেরকে নাকি এই আশ্বাসই দেয়া হয়েছে সেখান থেকে।'

'বলো কী, চার্লস!' আঁৎকে উঠল মা। 'না, না। এত কষ্ট করে বাড়িঘর করার পর স্রেফ হাঁকিয়ে দেবে আমাদের?'

'আমারও তাই ধারণা, সেটা সম্ভব নয়। আমি ওদের কথা বিশ্বাস করিনি। আজ পর্যন্ত সবখানে সরকার সব সময় সেটলারদের পক্ষ নিয়েছে, সরিয়ে দিয়েছে ইন্ডিয়ানদেরকেই। এখানে বসতি করতে দেবে, ওয়াশিংটন থেকে এরকম একটা খবর শুনেই তো এসেছি আমরা, তাই না? তা ছাড়া এই দেখো, কানসাসের এই পত্রিকায় কী লিখেছে,' পকেট থেকে একটা খবরের কাগজ বের করে কিছুটা অংশ পড়ে শোনাল বাবা মাকে। ওতে লিখেছে সাদা সেটলারদের বিরুদ্ধে কিছুই করবে না সরকার।

হঠাৎ করেই আগুন দেখা দিল প্রেয়ারিতে। বিস্তীর্ণ তৃণভূমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এগিয়ে আসছে আগুন লরাদের বাড়ির দিকে।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল বাবা। বাড়িটাকে ঘিরে তিন দিক থেকে লাঙল টেনে গর্ত তৈরি করল জমিতে, তারপর গামলা ভরা পানি আর ভেজা কাপড় নিয়ে তৈরি থাকল আগুনের জন্য। মা-ও দাঁড়াল গিয়ে বাবার পাশে। হুড়মুড় করে এসে পড়ছে আগুন, বন মোরগ আর খরগোশগুলো দৌড়াচ্ছে আগুনের আগে আগে। চষা জায়গাটার বাইরের দিকের শুকনো ঘাসে নিজেই আগুন ধরিয়ে দিল এবার বাবা। আগুন দিতে দিতে লাঙলের দাগ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে বাবা, আর মা অনুসরণ করছে তাকে ভেজা বস্তা নিয়ে, আগুনটা দাগের এপারে আসতে নিলেই বস্তা দিয়ে পিটিয়ে নিভিয়ে দিচ্ছে।

বাবার তৈরি আগুনটা ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে, ক্রমে সরে যাচ্ছে বাড়ি থেকে দূরে। দেখতে দেখতে দূরের আগুন এসে মিশল কাছের আগুনের সঙ্গে, কিন্তু শুকনো ঘাস না পেয়ে বাড়ির দিকে আর এগোতে পারল না, সরে চলে গেল অন্য দিকে।

চারদিকে শুধু পোড়া ঘাসের কালো ছাই দেখা যাচ্ছে এখন, সবুজের চিহ্নমাত্র নেই।

মিস্টার স্কট আর মিস্টার এডওয়ার্ডস্ এলেন খবর নিতে। তাঁদের ধারণা, ইচ্ছে করেই প্রেয়ারিতে আগুন দিয়েছে ইন্ডিয়ানরা, যাতে নবাগত সাদা সেটলাররা পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু বাবা বলল চলা-ফেরার সুবিধা হয় বলে ইন্ডিয়ানরা মাঝে-মধ্যে আগুন লাগিয়ে এভাবে ঘাস পোড়ায়। এতে লাঙল দেওয়ার অনেক সুবিধে হবে সেটলারদেরও।

ওঁদের কাছেই জানা গেল, অসংখ্য ইন্ডিয়ান এসে জড় হয়েছে ক্যাম্পে; আরও আসছে রোজ। কী মতলবে তা কে জানে! 'একমাত্র ভাল ইন্ডিয়ান হচ্ছে মরা ইন্ডিয়ান,' বললেন স্কট।

'ওদেরকে ওদের মত থাকতে দিলে আজ আমাদেরকে ঘৃণার পাত্র হতে হোত না,' বলল বাবা। 'এতবার ওদের ভিটে-ছাড়া করা হয়েছে যে সাদা মানুষকে সহ্যই করতে পারে না ওরা আর। যাই হোক, আমার মনে হয় ফোর্ট গিবসন আর ফোর্ট ডজ-এ সোলজাররা প্রস্তুত, এই অবস্থায় এরা কোনরকম হঠকারিতা করতে সাহস পাবে না।'

'তা হলে জড় হচ্ছে কেন?' প্রশ্ন স্কটের।

'বাহ্, ওদের "বিগ বাফেলো হান্ট" উৎসব এসে গেল না?'

মাথা ঝাঁকালেন স্কট। 'হ্যাঁ, তা হতে পারে।'

তেরো

পরদিন থেকে পুরোদমে চাষাবাদ শুরু করে দিল বাবা।

এদিকে ইন্ডিয়ানদের সমবেত হওয়া নিয়ে অস্বস্তি বেড়েই চলেছে। রাতে ওদের চিৎকার-চেঁচামেচি আর ড্রামের শব্দে থর-থর করে কাঁপে বাড়িঘর। দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে ওদের ড্রামের শব্দ।

বাবা ব্যাপারটাকে যতই হালকা ভাবে দেখাবার চেষ্টা করুক, লরা বোঝে বাবা নিজেও তেমন ভরসা পাচ্ছে না। বিকেল বেলাই ফিরে আসে মাঠ থেকে, দুধ দুইয়ে গরু-ঘোড়াদের দানা পানি দিয়ে সন্ধ্যার আগেই ঘরে এসে ঢোকে। জ্যাককে ভিতরে এনে বন্ধ করে দেয় দরজা।

একরাতে বুলেট মোল্ড বের করে অসংখ্য বুলেট তৈরি করল বাবা। একসঙ্গে এত বুলেট আর কখনও বানাতে দেখেনি লরা। মেরি জিজ্ঞেস করল, 'এত বেশি

বেশি বানালে কেন, বাবা?'

'আর কোন কাজ নেই যে হাতে,' বলে খুশি-খুশি ভঙ্গি করে শিস দিতে শুরু করল বাবা। কিন্তু লরা জানে, সারাদিন যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে বাবা মাঠে, এত খাটুনি যে বেহালা বাজাবার শক্তিও নেই—এই অবস্থায় রাত জেগে বুলেটের পেছনে এত খাটনি না খেটে শুয়ে পড়াই স্বাভাবিক ছিল।

ক্রমশ কেমন গম্ভীর হয়ে উঠছে পরিবেশ। আর একজন ইন্ডিয়ানও আসেনি ওদের বাড়িতে। এদিক-ওদিকে দেখতেও পাওয়া যায় না এক-আধজনকে। মেরি বাইরে বেরোনো ছেড়ে দিয়েছে, লরা একাই খেলে বেড়ায় মাঠে। ওর মনে হয় চারপাশ থেকে ঘনিয়ে আসছে বিপদ। মনে হয়, পিছন থেকে কে যেন লক্ষ করছে ওকে, চট করে পিছন ফিরে চাইলে দেখা যায় না কাউকে।

মিস্টার স্কট আর মিস্টার এডওয়ার্ডস্ এসে একদিন খেতের উপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কী সব গুজুর-গুজুর করে গেলেন বাবার সঙ্গে। অস্ত্র ছিল দুজনের কাছে। কথা শেষ করে চলে গেলেন একই সঙ্গে।

খেতে এসে বাবা বলল, 'কেউ কেউ উঁচু স্টকেড (প্রাচীর বা কাঠের বেড়া) দেয়ার কথা ভাবছে। আমি স্কট আর এডওয়ার্ডস্‌কে বললাম: এসবের কোনও অর্থ হয় না। যদি কিছু ঘটে, আগেই ঘটবে, স্টকেড তৈরির সময় পাওয়া যাবে না। আমাদের এমন কিছুই করা উচিত নয়, যাতে ওরা ভাবতে পারে আমরা ভয় পেয়েছি।'

প্রশ্ন করতে গিয়েও চুপ করে থাকল লরা আর মে। ওরা জানে, কিছু জিজ্ঞেস করলেই এখন বলা হবে ছোটরা খেতে বসে শুনবে, বাবা কথা বলবে না। কিন্তু বিকেলে মাকে না জিজ্ঞেস করে পারল না, 'মা, স্টকেড দিচ্ছি?'

মা জবাব দিল, ওটা হচ্ছে ছোট মেয়েদের একটা প্রশ্নের বিষয়। অর্থাৎ, বলব না। মেরি এমন ভাবে তাকাল ওর দিকে, যার মানে; কী, বলেছিলাম না? বাবা কেন বলল: এমন কিছুই করতে চায় না যা দেখে মনে হবে বাবা ভয় পেয়েছে? তা হলে কি বাবা সত্যিই ভয় পেয়েছে, কিন্তু ভাবটা প্রকাশ করতে চাইছে না?

এটুকু পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে লরা, নিজেও ও ভীষণ ভয় পেয়েছে। ভয় লাগছে ওর ইন্ডিয়ানদেরকে।

হঠাৎ একরাতে প্রচণ্ড আওয়াজে ঘুম ভেঙে যেতে চিৎকার দিয়ে উঠে বসল লরা বিছানায়। মা ছুটে এসে হাত চাপা দিল ওর মুখে। বলল, 'ক্যারি ভয় পাবে, চেঁচিয়ো না!'

মাকে জড়িয়ে ধরে থাকল লরা। দেখল, পোশাক পাল্টায়নি মা, ঘরটাকে অন্ধকার করে রাখা হয়েছে। চাঁদের আলো আসছে জানালা দিয়ে। জানালার পাল্লা খোলা। ওখানে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছে বাবা বাইরে, হাতে বন্দুক।

জোর আওয়াজ আসছে ঢাকের। পাগলের মত ঢাক পিটাচ্ছে ওরা। এমনি সময় আবার এল সেই প্রচণ্ড আওয়াজ। কলজে হিম হয়ে যায় সে-আওয়াজ শুনলে, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সংবিৎ ফিরে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল লরা, 'কীসের? বাবা, কীসের আওয়াজ ওটা?'

থর থর করে কাঁপছে লরা, মনে হচ্ছে এখুনি বমি করে ফেলবে বুঝি। মা

চেপে ধরে আছে ওকে, বোঝাতে চাইছে, কোনও ভয় নেই—কিন্তু কাঁপছে নিজেও। 'এটা ইন্ডিয়ানদের রণ-হুঙ্কার, লরা,' শান্ত গলায় বলল বাবা। 'এভাবেই যুদ্ধ ঘোষণা করে ওরা। তবে এটা শুধু ঘোষণাই, যুদ্ধ নয়। একটুও ভয় পেয়ো না তোমরা, মেরি-লরা। বাবা আছে, জ্যাক আছে, ফোর্ট গিবসন আর ফোর্ট ডজ-এ সৈন্যরা আছে। নিশ্চিন্তে থাকো তোমরা।'

ড্রামের আওয়াজ মনে হয় মাথার ভিতর গিয়ে আঘাত করছে। সেই সঙ্গে চিৎকার, 'হাই! হাই! হাই-য়ি! হাহ্! হাই! হাহ্!' তারপর সেই রক্ত হিম করা ভীষণ রণ-হুঙ্কার। শেষ রাতের দিকে ধীরে ধীরে কমে গেল হৈ-হল্লা, ড্রাম, কিন্তু লরার মনে হলো ওর মাথার মধ্যে অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে ওই হট্টগোল।

'বাপ্‌স্‌!' হালকা গলায় বলল বাবা। 'ব্যাটারা শিখল কোথায় এমন হাঁক?' কেউ কোন জবাব দিল না।

'বন্দুক-রাইফেলের আর কী দরকার? ইচ্ছে করলে চেঁচিয়েই মেরে ফেলতে পারে মানুষ,' আবারও বলল বাবা। 'লরা, একটু পানি দেবে, মা? গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে একেবারে।'

চট্ করে উঠে গিয়ে পানি নিয়ে এল লরা। খেয়ে এমন ভাব দেখাল বাবা, যেন জানে পানি এল। হাসল লরার দিকে চেয়ে। ভয় অনেকখানি কেটে গেল লরার।

হঠাৎ শো[illegible]ন একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ, এই দিকেই আসছে। জানালার সামহেচ্ছে চাল গিয়ে লরা বাবার পাশে। কালো একটা ঘোড়া এদিকে আসছে, চাঁদের [illegible]লোয় আবছা দেখা যাচ্ছে আরোহীকে, কিন্তু বসবার ভঙ্গিতে বোঝা গেল, লোকটা ইন্ডিয়ান। বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চিনতে পারল লরা ওকে।

'এ-থেকে কী বুঝতে হবে?' নাক-মুখ-ভুরু কুঁচকে ভাবছে বাবা সোচ্চারে, 'এ-লোক তো সেই ওসেন, যে আমার সঙ্গে ফ্রেঞ্চ বলছিল। এত রাতে কোথা থেকে ফিরছে লোকটা?'

সকাল হলো। সব চুপচাপ। কোথাও কোন শব্দ নেই—না হৈ-হল্লা, না ড্রাম। ঘাস নেই বলে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে হাওয়া। শুধু বাড়ির চিমনিতে সামান্য একটু শিসের মত শব্দ হচ্ছে মাঝেমাঝে।

কিন্তু রাত হলেই আবার যে-কার-সেই। হৈ-চৈ, ঢাকের বাদ্যি আর ভীষণ রণ-হুঙ্কার।

এই রকম চলল পরপর ছয় রাত। বাবার কাজ-কর্ম বন্ধ, মাঠে পড়ে রয়েছে লাঙল; ঘোড়া-গরু-বাছুর সব আস্তাবলে। সারাদিন খানিক পর পর বাইরে বেরিয়ে চারদিকে চোখ বুলিয়ে আসে বাবা, ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে জানালার সামনে। ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, স্বস্তি নেই।

সপ্তম রাতে চরমে উঠল ওদের কোলাহল। কারও চোখে ঘুম নেই। ক্যারি পর্যন্ত উঠে বসে আছে বিছানায়। মাঝরাতের দিকে বাবা বলল, 'ক্যারোলিন, ঝগড়া করছে ওরা নিজেদের মধ্যে। মনে হচ্ছে মারপিট লেগে যাবে যে-কোন মুহূর্তে।'

'তা হলেও তো বাঁচা যেত, চার্লস!' উত্তর দিল মা।

সারা রাত চলল তুমুল হট্টগোল, ভোর হয়-হয় এমন সময় থামল শেষ রণ-হুঙ্কার। ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে ঘুমিয়ে পড়ল লরা। জেগে উঠে দেখল মেরি শুয়ে আছে পাশে। দরজা খোলা, বাইরে উজ্জ্বল রোদ। রান্না করছে মা, বাবা বসে আছে দোর গোড়ায়।

'আরও এক দল চলল দক্ষিণে,' বলল বাবা।

দৌড়ে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল লরা। বহুদূরে পিঁপড়ের মত দেখা যাচ্ছে—এক দল ইন্ডিয়ান ঘোড়ায় চেপে কালো প্রেয়ারির উপর দিয়ে সার বেঁধে চলে যাচ্ছে দক্ষিণে। বাবা বলল, 'সকালে বড় দুটো দল চলে গেছে পশ্চিমে। এখন একটা চলেছে দক্ষিণে। এর মানে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেছে মত পার্থক্যের কারণে—এবার আর মহিষ শিকারে যাচ্ছে না ওরা এক সঙ্গে।'

'আজ ঘুমাব আমরা,' রাতে বলল বাবা। 'ইশ্! কতদিন যে এক ঘন্টার বেশি ঘুমাতে পারিনি একটানা!'

নিশ্চিন্তে ঘুমাল ওরা সারারাত। সকালে উঠে দেখল তখনও পড়ে পড়ে ঘুম দিচ্ছে জ্যাক দরজার কাছে শুয়ে। তার পরের রাতেও ঘুমাল ওরা নিশ্চিন্তে। বাতাসের ফিসফিস ছাড়া কোথাও কোনও শব্দ নেই। বাবা স্থির করল খেতের কাজ শুরু করবার আগে ঘুরে ফিরে দেখে নেবে চারপাশটা।

জ্যাককে শিকলে বেঁধে রেখে বন্দুকটা নিয়ে বেরিয়ে গেল বাবা, অদৃশ্য হয়ে গেল ক্রীকের ঢালে।

সারাদিনে একটা কাজও করতে পারল না বাড়ির কেউ। বাড়ি থেকে বেরোল না কেউ। সবাই অপেক্ষা করছে বাবার জন্য। পুব জানালা দিয়ে আসা রোদের টুকরোটা মেঝের উপর দিয়ে খুব ধীরে বুকে হেঁটে ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল দেয়ালের কাছে, তারপর বেশ অনেকক্ষণ পর আবার উঁকি দিল রোদ পশ্চিম জানালা দিয়ে। প্রথমে এক চিলতে এসে পড়ল মেঝেতে, বড় হচ্ছে ধীরে ধীরে। বাবা আসে না।

শেষ বিকেলে সুসংবাদ নিয়ে ফিরল বাবা। সব ঠিক আছে এখন। ওসেজ উপজাতি ছাড়া আর সব উপজাতি চলে গেছে ক্যাম্প খালি করে। জঙ্গলে একজন ওসেজের সঙ্গে কথা হয়েছে বাবার। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে সে বলেছে ওসেজ ছাড়া আর সব কটা উপজাতি চেয়েছিল সাদা-চামড়ার সেটলারদের খুন করে তাদের সম্পত্তি লুট করতে। খবর পেয়ে ওসেজদের নেতা দূর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে এসেছে ক্যাম্পে। সে চায় না এখানে খুন-খারাবি হোক।

এই লোকটাকে ওরা ডাকে 'সোলদাত্ দু চেনি' বলে। যোদ্ধা হিসেবে খুবই নাকি সুখ্যাতি আছে।

'কদিন তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে ওসেজদের সবাইকে রাজি করিয়েছে সে,' বলল বাবা। 'তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিয়েছে: ওরা যদি আমাদের খুন করার চেষ্টা করে তা হলে বাধা দেবে ওসেজরা।'

তুমুল ঝগড়া হয়েছিল সেই রাতে ওদের মধ্যে। অন্যান্য উপজাতির যোদ্ধারা যত হৈ-হল্লা করে, ধিক্কার দেয়, ওসেজরা জবাবে তার চেয়ে বেশি গলাবাজি আর 'দুয়ো-দুয়ো' করে। সোলদাত্ দু চেনি আর তার লোকজনের বিরুদ্ধে লড়াই

করতে রাজি হলো না কেউ শেষ পর্যন্ত। ফলে সকালে উঠে চলে গেছে ওরা যে-যার পথে।

'এই একজন ভাল ইন্ডিয়ান!' বলল বাবা। একমাত্র ভাল ইন্ডিয়ান হচ্ছে মরা ইন্ডিয়ান–মিস্টার স্কটের একথা মানে না বাবা। ওদের মধ্যেও আছে অনেক ভাল লোক।

চোদ্দ

সারারাত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে সকালে স্থির করল বাবা, নাহ্, আজ থেকেই আবার লাঙল দেবে জমিতে। আস্তাবলের দিকে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল, শিস দিচ্ছিল, থেমে গেল শিস। পুব দিকে চেয়ে আছে।

'দেখে যাও, ক্যারোলিন!' ডাকল বাবা। 'মেরি, লরা, জলদি এসো!'

দৌড়ে বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে গেল লরা। ট্রেইল ধরে আসছে ইন্ডিয়ানরা। খাঁড়ির নীচ থেকে উঠে আসছে একের পর এক ঘোড়া। সবার আগে সেই লম্বা ওসেজ-চীফ। সিধে হয়ে বসে আছে ঘোড়ার পিঠে গর্বিত ভঙ্গিতে।

ক্রুদ্ধ গর্জন ছাড়ল জ্যাক, শিকল টানাটানি করছে ছেঁড়ার চেষ্টায়। ও ভোলেনি, এই লোক রাইফেল তুলেছিল ওর দিকে। বাবা ধমক দিল, 'চুপ, জ্যাক! শুয়ে থাকো! একদম নড়বে না!' শুয়ে পড়ে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে রাখল জ্যাক।

ভয়-ভয় করছে লরার। কাছে এসে পড়েছে লম্বা ইন্ডিয়ান। গায়ে জড়ানো একটা রঙচঙে কম্বল। এক হাতে হালকা ভাবে ধরে রেখেছে রাইফেল, নলটা রেখেছে ঘোড়ার ঘাড়ের উপর। মনে হচ্ছে খোদাই করা একটা নিষ্ঠুর ইন্ডিয়ান মূর্তি। দুচোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পশ্চিমে, অনেক দূরে নিবদ্ধ। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একদম স্থির, নড়ছে শুধু মাথায় গোঁজা ঈগলের পালকগুলো।

'এই যে দু চেনি যায়,' বিড় বিড় করে বলল বাবা, হাত তুলল স্যালিউটের ভঙ্গিতে।

স্থির দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে চলে গেল লোকটা। যেন এই বাড়ি, আস্তাবল, বাবা-মা-লরা-মেরি কারও কোনও অস্তিত্ব নেই। লোকটার পিছন পিছন চলেছে যোদ্ধার দল। তারপর বৃদ্ধ, মহিলা আর কচি-বাচ্চারা। কোনও কোনও বাচ্চা ঘোড়ার গায়ে বাঁধা বাস্কেটের ভিতর বসে বা দাঁড়িয়ে আছে। লরা আর মেরির সমান ছেলেমেয়েরা বড়দের ভঙ্গিতে বসে আছে ঘোড়ার পিঠে, তবে কৌতূহল দমন করতে না পেরে তাকাচ্ছে ওদের দিকে, ঝিকমিক করছে ওদের কালো চোখ।

দুপুর পেরিয়ে যাচ্ছে তবু শেষ হয় না ওদের কাফেলা। সব শেষে এল ওদের মালবাহী ঘোড়াগুলো নানান আকার-আকৃতির বোঁচকা-বান্ডিল, তাঁবুর খুঁটি, ঘটি-

বাটি-থালা-বাসন-হাঁড়ি-পাতিল-গামলা-বালতির বোঝা বয়ে নিয়ে।
শেষ ঘোড়াটা চলে যেতে মস্ত এক শ্বাস ছেড়ে পেট আর প্যাটিকে নিয়ে চলে গেল বাবা খেতে লাঙল দিতে।

ইন্ডিয়ানরা চলে যাওয়ার পর শান্তি নেমে এল গোটা এলাকায়। সবুজ, কচি-ঘাসে ছেয়ে গেল গোটা প্রেয়ারি। মাটি দেখা যাচ্ছে শুধু বাবার চষা খেতে।

বাবা খেত নিয়ে মহা ব্যস্ত, এদিকে লরা আর মেরিকে নিয়ে মা ব্যস্ত তার সবজি-বাগানে। বাড়ির সামনে কিছুটা জমিতে লাঙল চষে ঘাসের গোড়া আলগা করে দিয়েছে বাবা, এখন নিড়ানি দিয়ে খুঁচিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে মা লাগাচ্ছে পেঁয়াজ, শালগম, গাজর, শিম, আর মটর। অল্প কিছুদিনের মধ্যে নানান রকম তরি-তরকারি খাওয়া যাবে ভেবে সবাই খুশি। রুটি-মাংস খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওরা সবাই।

বাঁধাকপি আর মিষ্টি আলুর বীজ লাগিয়েছিল মা একটা কাঠের বাক্সে মাটি ভরে। চারাগুলো বেরোতেই বাবা ওগুলো পুঁতে দিল জমিতে। দুজনে মিলে পানি দিল, আশপাশের মাটি চেপে গর্তের মধ্যে শক্ত করে বসিয়ে দিল চারাগুলোকে। এ-বছর বাঁধাকপি আর মিষ্টি আলু বিলি করতে পারবে বাবা-মা প্রতিবেশীদের মধ্যে, ফলন যা হবে একা খেয়ে নিজেরা শেষ করতে পারবে না।

রোজ নিয়মিত পানি পেয়ে কলকল করে বেড়ে উঠছে চারাগুলো, দেখলে মন ভরে যায়।

সত্যিই, রাজার হালে থাকবে ওরা এখানে।

সকালে উঠে মনের আনন্দে শিস দিতে দিতে মাঠে যায় বাবা। জমি তৈরি হয়ে যেতেই শস্য বুনে ফেলল; ভাগ ভাগ করে বুনল ভুট্টা, গম, জই, যব, রাই আলাদা আলাদা জমিতে। আজ আলু বুনবে প্রায় এক একর জায়গায়। ফসলের বাড়-বাড়ন্ত ভাব দেখে বাবা মহাখুশি। রত্নগর্ভা জমি একেই বলে।

নাস্তার পর থালা-বাসন ধুচ্ছে লরা আর মেরি, মা বিছানা সাট করছে আর গুনগুন গান গাইছে, হঠাৎ বাবার গলা শুনতে পেল ওরা, রাগী, কর্কশ, উচ্চকণ্ঠ। চমকে দরজায় এসে দাঁড়াল মা, লরা আর মেরিও অবাক হয়ে ঘাড় ফিরিয়েছে।

মাঠ থেকে লাঙল সহ পেট আর প্যাটিকে নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরছে বাবা। মিস্টার স্কট আর মিস্টার এডওয়ার্ডস্ আসছেন সঙ্গে, কী যেন বোঝাবার চেষ্টা করছেন মিস্টার স্কট বাবাকে।

'না, স্কট!' বাবার ঝনঝনে জোরাল গলা ভেসে এল। 'আমি থাকছি না কিছুতেই। সোলজার এসে ধরে নিয়ে যাবে, চোর-ডাকাতের মত···অসম্ভব! ওয়াশিংটনে বসে কোনও নির্বোধ রাজনীতিক দাবার চাল দেবে, ব্যস, আমরা হয়ে যাব অবৈধ অনুপ্রবেশকারী, হাওয়ায় ভেসে যাবে আমাদের এতদিনের এত পরিশ্রম–সৈন্যরা আসবে আমাদের উৎখাত করতে, ধরে নিয়ে যাবে ফোর্ট ডজে খুনে আসামীর মত–নাহ্, আমি থাকছি না। আমরা চলে যাব, এখনই!'

'কী হয়েছে, চার্লস? কোথায় চলে যাচ্ছি আমরা?' চোখ বড় করে জানতে চাইল মা।

'জানি না, ক্যারোলিন! কিন্তু যাচ্ছি। এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমরা!' ক্ষোভে, দুঃখে গলাটা ধরে এল বাবার। 'স্কট আর এডওয়ার্ডস্ বলছে, সমস্ত সেট্‌লারকে ইন্ডিয়ান টেরিটোরি থেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সৈন্য পাঠাচ্ছে সরকার।'

রাগে লাল হয়ে গেছে বাবার মুখটা, নীল চোখ দুটো থেকে আগুন বেরোচ্ছে যেন। ভয় পেল লরা। কখনও বাবাকে এত রেগে যেতে দেখেনি ও। মা'র পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল বাবার দিকে।

কিছু বলবার জন্য মুখ খুলতে গেলেন মিস্টার স্কট, বাবা থামিয়ে দিল। 'অযথা মুখ খরচ কোরো না, স্কট। আর কিছু বলে লাভ নেই। ইচ্ছে করলে সোলজার না আসা পর্যন্ত থাকতে পারো তুমি। আমি চলে যাচ্ছি এখনই।'

মিস্টার এডওয়ার্ডস্ বললেন তিনিও চলে যাবেন। হলদে কুত্তার মত ছেঁচড়ে, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবে, তার অপেক্ষায় এখানে বসে থাকতে রাজি নন তিনিও।

'ইন্ডিপেন্ডেন্স পর্যন্ত চলো তা হলে আমাদের সঙ্গেই,' বলল বাবা, কিন্তু রাজি হলেন না মিস্টার এডওয়ার্ডস্। উত্তরে যাবেন না তিনি। একটা নৌকা বানিয়ে ভেসে পড়বেন, আরও দক্ষিণে গিয়ে বসতি করবেন কোনও বৈধ জায়গায়।

মিস্টার স্কটের দিকে ফিরল বাবা, 'স্কট, তুমি আমাদের গরু আর বাছুরটা নিয়ে যাও। ওদের সঙ্গে নিতে পারব না আমরা। তোমাদের মত এত চমৎকার প্রতিবেশীকে ছেড়ে চলে যেতে আমার খুব খারাপই লাগছে, স্কট। মিসেস স্কটকে আমাদের প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানিয়ো। কাল ভোরেই রওনা দিচ্ছি আমরা, কাজেই আর দেখা হলো না।'

কথাগুলো সবই শুনেছে লরা, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি। যখন দেখল সত্যি সত্যিই ওদের মস্ত শিংওয়ালা গরু আর তার বাছুরটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন মিস্টার স্কট, তখন দু-ফোঁটা পানি নেমে গেল ওর গাল বেয়ে। সবাইকে আড়াল করে চট্ করে মুছে ফেলল সে চোখের জল।

মিস্টার এডওয়ার্ডস বললেন, নৌকা বানানোয় ব্যস্ত থাকবেন বলে কাল আর আসতে পারবেন না। বাবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললেন, 'গুড বাই, ইঙ্গল্‌স্! গুড লাক!' মাকে বললেন, 'গুড বাই, ম্যাম। আর কোনদিন দেখা হবে না, কিন্তু আপনার কাছে যে আদর পেয়েছি, সেটা মনে রাখব চিরকাল।' লরা আর মেরির কাছ থেকেও বিদায় নিলেন মিস্টার এডওয়ার্ডস্, 'গুড বাই, মেরি! গুড বাই, লরা!'

সবিনয়ে মেরি বলল, 'গুড বাই, মিস্টার এডওয়ার্ডস।' কিন্তু লরা তেমন ভদ্রতা দেখাতে পারল না, ও বলল, 'আপনি চলে যাচ্ছেন বলে আমার খুব খারাপ লাগছে, মিস্টার এডওয়ার্ডস! আর, আপনাকে ধন্যবাদ, অনেক-অনেক ধন্যবাদ–সেই ইন্ডিপেন্ডেন্সে গিয়ে আমাদের জন্যে সান্তা ক্লজকে খুঁজে বের করেছিলেন আপনি, সেজন্যে!'

মিস্টার এডওয়ার্ডসের চোখ দুটো কেমন যেন চক্‌চক্ করে উঠল। চোখের পাশে একটা পেশি কাঁপল দু'বার। আর একটি কথাও না বলে হঠাৎ ঘুরে চলে গেলেন তিনি।

পেট আর প্যাটিকে জোয়ালমুক্ত করে দিল বাবা দিনের শুরুতেই। লরা আর

মেরি বুঝল সত্যিই ওদেরকে চলে যেতে হচ্ছে এখান থেকে। কিছুই বলল না মা, ঘরে ঢুকে চারদিকে তাকাল; আধ-গোছানো বিছানা, এঁটো থালা বাসন দেখল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসে পড়ল।

চুপচাপ হাতের কাজ শেষ করল লরা আর মেরি। বাবার পায়ের শব্দ পেয়ে চট্ করে ঘুরে তাকাল।

আবার আগের মত দেখাচ্ছে বাবাকে। পিঠে রয়েছে আলুর বস্তা।

'এই যে, ক্যারোলিন!' স্বাভাবিক গলায় বলল বাবা, 'ভাগ্যিস গতকাল এগুলো বুনে দিইনি খেতে! রাঁধো যত খুশি আলু, পেট পুরে আলু খাব আমরা আজ দুপুরে।'

সত্যিই মজা করে সেদিন বীজ আলু খেল ওরা ডিনারে। বাবার একটা কথার সত্যতা বুঝতে পারল সেদিন লরা, ঠিকই বলে বাবা, 'কেবল ক্ষতি হয় না কখনও, পাশাপাশি কিছু লাভও হয়।'

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বুকের পাঁজরের মত দেখতে বাঁকা ওয়্যাগন-বোগুলো আস্তাবল থেকে বের করে পরাল বাবা ওয়্যাগনের দু'পাশের লোহার আংটায়। তারপর মাকে নিয়ে সাদা ক্যানভাসের ওয়্যাগন-কাভার বো-র উপর বিছিয়ে বাঁধল শক্ত করে টেনে। পিছন দিকের শেষ প্রান্তে পরানো ফিতে ধরে টান দিতেই ভাঁজ হতে হতে ছোট হয়ে গেল গর্তটা, শুধু ছোট্ট একটা ফাঁক থাকল বাইরে তাকাবার জন্য।

যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে গেল ওয়্যাগন, কাল সকালে মালপত্র ভরে নিলেই রওনা হতে পারবে।

সবারই মন ভার, কেউ কোনও কথা বলল না সন্ধ্যার পর। জ্যাকও টের পেয়েছে, কিছু একটা ঘটে গেছে; রাতে লরার পাশে মেঝেতে এসে শুলো।

শূন্য দৃষ্টিতে নেভা চুলোর ছাইয়ের দিকে চেয়ে বসে আছে মা। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'একটা বছর খসে গেল জীবন থেকে, চার্লস।'

'আরও অনেক বছর রয়েছে আমাদের হাতে, ক্যারোলিন,' খুশি-খুশি গলায় বলল বাবা। 'একটা বছর কী আর এমন?'

পনেরো

নাস্তা খেয়েই ওয়্যাগনে মালপত্র ভরতে শুরু করল বাবা আর মা। পিছন দিকে দুটো বিছানা রাখা হলো একটার উপর আর একটা। দিনে এখানে বসবে ক্যারি, লরা আর মেরি; রাতে উপরের বিছানাটা ওয়্যাগনের সামনের দিকে সরিয়ে নিয়ে ঘুমাবে বাবা-মা। নীচেরটায় ঘুমাবে লরা আর মেরি।

ছোট কাবার্ডটা দেয়াল থেকে পেড়ে খাবার আর থালাবাসন ভরা হলো, তারপর সেটা ঢুকিয়ে দেওয়া হলো ওয়্যাগন সীটের নীচে। তার সামনে একবস্তা ঘোড়ার খাবার রেখে বাবা বলল, 'পা রাখার সুন্দর জায়গা হয়ে গেল,

ক্যারোলিন।'

কাপড়-চোপড় সব ভরা হলো দুটো ব্যাগে, তারপর ওয়্যাগনের ভিতরে দুটো বো-র সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। ওগুলোর উল্টোদিকে ঝুলানো হলো বাবার বন্দুকটা, তার নীচে ঝুলছে বুলেট পাউচ আর বারুদ ভরা শিঙ। বিছানার এক পাশে রাখা হলো বেহালার বাক্সটা, ঝাঁকি লাগলেও যেন ক্ষতি না হয়।

হাঁড়ি-পাতিল-কড়াই, কফি পট, চুলো—এসব বস্তায় ভরে ওয়্যাগনে তুলল মা। রকিং চেয়ার আর বড় গামলা বেঁধে নিল বাবা ওয়্যাগনের বাইরের দিকে, পানির বালতি আর ঘোড়াকে খাবার দেওয়ার বালতি বেঁধে দিল গাড়ির নীচে। টিনের লণ্ঠনটা ঝুলিয়ে রাখল ওয়্যাগন-বক্সের সামনের এক কোণে।

লাঙলটা নেওয়া গেল না। জায়গা নেই। যেখানে গিয়ে পৌঁছবে, সেখানে আবার পশুর চামড়া সংগ্রহ করে হয়তো আরেকটা লাঙল কিনতে পারবে বাবা।

লরা আর মেরি ওয়্যাগনে উঠে পিছন দিকে বিছানার উপর গিয়ে বসল, ওদের মাঝখানে ক্যারিকে বসিয়ে দিল মা। ওরা সবাই হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় পরেছে, মা চুল আঁচড়ে দিয়েছে সুন্দর করে। বাবা বলল, হাউন্ডের দাঁতের মত পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে লাগছে ওদের; মা বলল, নতুন পিনের মত চকচকে লাগছে।

এবার পেট আর প্যাটিকে ওয়্যাগনে জুতে দিল বাবা, বাবার পাশের সীটে উঠে বসে রাশ ধরল মা। হঠাৎ বাড়িটা দেখবার খুব ইচ্ছে হলো লরার। বাবাকে বলতেই পিছনের ফিতে ঢিল করে ফাঁকটা বড় করে দিল।

যেমন ছিল ঠিক তেমনি নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে বাবার নিজ হাতে গড়া ছোট্ট, সুন্দর বাড়িটাকে। মনে হলো, বাড়িটা জানে না যে ওরা চলে যাচ্ছে, আর কোনদিন আসবে না। খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল বাবা, চারদিকে তাকিয়ে দেখল কিছু ফেলে যাচ্ছে কি না। খাটটা দেখল, ফায়ারপ্লেসটা দেখল, কাঁচের জানালাগুলো দেখল; তারপর আস্তে করে ভিড়িয়ে দিল দরজাটা।

'কারও না কারও কাজে লাগবে এটা,' বলল বাবা।

মা'র পাশে উঠে বসে রাশ হাতে নিল বাবা, এগোবার নির্দেশ দিল পেট আর প্যাটিকে। চলতে শুরু করল ওয়্যাগন, জ্যাক ঢুকে পড়ল গাড়ির নীচে। পেট চিঁহি-স্বরে ডাকল বানিকে, সে-ও চলল পাশে পাশে। শুরু হলো যাত্রা।

রাস্তা যেখানে নীচে চলে গেছে সেখানে এসে গাড়িটা থামাল বাবা। পিছন ফিরে তাকাল সবাই। যতদূর দেখা যায় সবুজ হয়ে আছে ধু-ধু প্রেয়ারি, বাতাসে দুলছে ঘাসগুলো, সাদা মেঘ ভাসছে পরিষ্কার নীল আকাশে।

"দারুণ একটা দেশ, ক্যারোলিন,' বলল বাবা। 'কিন্তু আরও বহু-বহুদিন এখানে রাজত্ব করবে বুনো ইন্ডিয়ান আর হিংস্র নেকড়ে।'

বহুদূরে ছোট্ট বাড়িটা আর তার পাশে ছোট্ট আস্তাবলটা দাঁড়িয়ে আছে, নিঝুম, নিঃসঙ্গ।

এবার বেশ জোরে ছুটল পেট আর প্যাটি।

চলে যাচ্ছে ওরা একটা বছরকে পেছনে ফেলে।

***

কিশোর ক্লাসিক **Banglapdf.net Presents-**

কাজী আনোয়ার হোসেন রূপান্তরিত
লরা ইঙ্গল্‌স্ ওয়াইল্ডার-এর

ফার্মার বয়

ছোট্ট ছেলে আলমানযো। সবে নয় বছর বয়স।
বাবার খামার-বাড়িতে বড় হয়ে উঠছে।
ভাইবোনদের সঙ্গে ওকেও প্রচুর কাজ করতে হয়।
গোলাঘর পরিষ্কার করা, দুধ দোয়ানো, মুরগির ডিম
তোলা, মাখন তৈরি করায় মাকে সাহায্য করা–
এরকম আরও কত কি।
কিন্তু ভুলেও ওকে শহুরে জীবনের আরাম-আয়েশের
লোভ দেখিয়ো না–ও মাথা নাড়বে।

লিট্‌ল্ হাউজ অন দ্য প্রেয়ারি

ওই একই সময়ে ছোট্ট মেয়ে লরা বাবা-মার সাথে গোটা
মধ্য-আমেরিকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে স্থায়ী বসতির সন্ধানে।
বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠছে ও।
জানে না, একদিন দেখা হবে আলমানযোর সঙ্গে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Aohor Arsalan HQ Release

Please Buy The Hard Copy if You
Like this Book!!

www.Banglapdf.net